জীবনানন্দ

জীবন ও কবিতার আলোচনা

দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
কলকাতা : এলাহাবাদ : বোম্বাই
১৩৬৭

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

প্রচ্ছদশিল্পী :
গণেশ বসু

মুদ্রক :
মনোতোষ পোদ্দার
শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন
কলকাতা-৯

শ্রীমতী মীনাক্ষী রায়

গৃহিণী সচিবঃ সখী মিথঃ
প্রিয়শিষ্যা ললিতে কলাবিধৌ।

সূচি

জন্ম ও বংশ পরিচয়

১৩০৫ সালের ৬ই ফাল্গুন (১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি) তারিখে পূর্ববঙ্গের বরিশাল শহরে জীবনানন্দের জন্ম হয়। বরিশাল বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর

জীবনানন্দের পিতার নাম সত্যানন্দ দাস ও মাতার নাম কুসুমকুমারী দাস। সত্যানন্দ ও কুসুমকুমারীর দুই পুত্র— জীবনানন্দ ও অশোকানন্দ এবং এক কন্যা— সুচরিতা।

সত্যানন্দের আসল উপাধি 'দাসগুপ্ত' এবং আদি নিবাস ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত গাউপাড়া গ্রামে। গাউপাড়া ছিল পদ্মার তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম।

জীবনানন্দের পিতামহ সর্বানন্দ দাসগুপ্ত বরিশালের কালেক্টরী অফিসে চাকরি নিয়ে গাউপাড়া থেকে প্রথম বরিশালে আসেন। সর্বানন্দ বরিশালে কালেক্টরী অফিসে কাজ করার সময় কোনো এক সময়ে স্থানীয় ব্রাহ্মনেতাদের প্রভাবে পড়ে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা নেন। ব্রাহ্মরা জাতিভেদ মানেন না। তাই সর্বানন্দ ব্রাহ্ম হওয়ার পর 'দাসগুপ্ত' পদবীতে কেবল বৈদ্যজাতিকেই বোঝায় বলে, নিজের পদবীর শেষের 'গুপ্ত' বাদ দিয়ে শুধু 'দাস' হন। সেই থেকে তাঁর বংশধরেরাও নিজেদের পদবী আর দাসগুপ্ত না লিখে দাস (পরে দাশ) লিখে আসছেন।

সর্বানন্দ ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করায় গাউপাড়ার জ্ঞাতিদের সঙ্গে এবং আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়। পরে অবশ্য এই জ্ঞাতি ও আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক অনেকটা স্বাভাবিক হয়েছিল। সর্বানন্দ গাউপাড়ায় না গিয়ে কর্মস্থল বরিশালেই সপরিবারে বসবাস করতেন। ঐ সময় গাউপাড়া গ্রামও পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ায় গাউপাড়ার সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কের চিন্তাও চিরতরে মুছে যায়।

সর্বানন্দের ছিল সাত পুত্র ও চার কন্যা। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ ছিলেন, সর্বানন্দের দ্বিতীয় পুত্র। সত্যানন্দ ও তাঁর দাদা হরিচরণ, এঁরাই কেবল বরিশালের বাড়িতে থাকতেন। সর্বানন্দের অন্য পুত্ররা নিজ নিজ কার্য উপলক্ষে প্রায় সকল সময়েই বরিশালের বাইরে থাকতেন। হরিচরণ ও সত্যানন্দ, এঁরা স্থানীয় ব্রজমোহন স্কুলের বা বি. এম. স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। হরিচরণ ছিলেন অঙ্কের শিক্ষক, আর সত্যানন্দ ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক।

সর্বানন্দ নিজে চাকরি জীবনে বরিশালে এক ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। তাঁর ছেলেরা বড় হয়ে পরে বরিশালের বগুড়া রোডের উপর প্রায় ৬ বিঘা জমি কিনে সেখানে বাড়ি ও আম-কাঁঠাল প্রভৃতি নানা ফলের এক বড় বাগান করেছিলেন। সর্বানন্দের পুত্ররা বাড়ি করে তাঁদের পিতার নামানুসারে বাড়ির নামকরণ করেছিলেন— 'সর্বানন্দ ভবন'।

সত্যানন্দ বি.এ. পাস করেছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে সেকালে একটা ভাল চাকরি পেতে পারতেন। বিশেষত তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং পরিচিতরা তখন সরকারী উচ্চপদে অধিষ্ঠিতও ছিলেন। কিন্তু তিনি আন্তরিক প্রেরণায় এবং অনেক চিন্তা করেই শিক্ষকতার কাজ গ্রহণ করেছিলেন। তখনকার দিনে শিক্ষকদের বেতন ছিল অতি অল্প। তা সত্ত্বেও তিনি ঐ অল্প বেতনেই বরিশালের ব্রজমোহন স্কুলে শিক্ষকতার কাজ নিয়েছিলেন এবং ঐ স্কুলে শিক্ষকতা ছাড়া তিনি আর অন্য কোথাও কখনো চাকরি করেননি। কেবল ১৯২১ সালে ভারতের তৎকালীন ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় ব্রজমোহন স্কুল বন্ধ ক'রে দেওয়া হ'লে, তখন ঐ স্কুলেরই কয়েকজন শিক্ষক মিলে বরিশালে যে মডেল স্কুল করেছিলেন, তাতে তিনি প্রধান শিক্ষক হয়েছিলেন। কিছুদিন পরে অসহযোগ আন্দোলন থেমে গেলে এবং ব্রজমোহন স্কুল পুনরায় চালু হ'লে, সত্যানন্দ আবার ব্রজমোহন স্কুলে নিজ পদে ফিরে এসেছিলেন।

সত্যানন্দ অত্যন্ত আদর্শবাদী শিক্ষক ছিলেন। ছাত্ররা তাঁকে খুবই শ্রদ্ধাভক্তি করতো। জীবনানন্দ তাঁর পিতার শিক্ষক-জীবনের কথা বলতে গিয়ে পরে লিখেছিলেন— 'সকালে, বিকালে, সন্ধ্যায় আমাদের বাড়িতে অসংখ্য ছাত্রের আসা-যাওয়া ছিল। বাবাকে কেন্দ্র করে বি. এম. স্কুলের উচ্চশ্রেণির ছেলেদের এক উন্মেষধর্মী সংঘ গড়ে উঠেছিল— যেখানে সাহিত্যিক, নৈতিক, রাষ্ট্রিক আলোচনায় বিকেল বেলা ও রাত্রিগুলো যেন কেমন একটা স্বাধিকার ফিরে পেত।'

সত্যানন্দ যেমন একজন আদর্শ শিক্ষক ছিলেন, তেমনি খাঁটি ধার্মিক মানুষও ছিলেন। বরিশাল ব্রাহ্ম-সমাজের তিনি উপাসক আচার্য এবং বক্তাও ছিলেন। সত্যানন্দ নিজে খাঁটি ব্রাহ্ম হয়েও, সকল ধর্মের প্রতি কিন্তু উদার ও সমদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলেন।

বরিশালের ব্রাহ্মদের দ্বারা পরিচালিত *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকার প্রথম দিকে সম্পাদক ছিলেন সত্যানন্দ। সত্যানন্দের পর তাঁর ভগ্নীপতি মনোমোহন চক্রবর্তী দীর্ঘদিন এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সত্যানন্দ *ব্রহ্মবাদী*-র সম্পাদক পদ ছাড়লেও তিনি বরাবরই এই পত্রিকার একজন নিয়মিত লেখক ছিলেন। তিনি প্রধানত নানা বিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধই লিখতেন।

সত্যানন্দ পড়াশুনা করতেন প্রচুর। তাঁর নিজের একটা ভাল লাইব্রেরি ছিল। তিনি শিক্ষকতা, ধর্মচর্চা ও পড়াশুনা নিয়েই শুধু থাকতেন না, নিজের দেশের রাষ্ট্রিক দুরবস্থার কথাও চিন্তা করতেন।

জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী দেবী বরিশালেরই মেয়ে ছিলেন। তাঁর পিতা চন্দ্রনাথ দাসও বরিশালের কালেক্টরীতে কাজ করতেন। তাঁর বাড়ি ছিল বরিশালের বৈদ্যপ্রধান গৈলা গ্রামে। তিনি কবিতা ও হাসির গান লিখতেন।

কুসুমকুমারী দেবী কলকাতায় বেথুন স্কুলে পড়তেন। ফার্স্ট ক্লাসে (বর্তমানের দশম শ্রেণিতে) পড়বার সময় সত্যানন্দের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হওয়ায় তিনি আর প্রবেশিকা পরীক্ষা দিতে পারেননি। তিনি তাঁর শ্বশুর বাড়ির একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারে একদিকে যেমন ছিলেন কর্মনিপুণা, অন্যদিকে তেমনি দরিদ্র ও দুঃখী প্রতিবেশীদের ছিলেন পরম হিতৈষিণী।

কুসুমকুমারী দেবী তাঁর স্বামীর মতো নিজেও অত্যন্ত ধর্মশীলা মহিলা ছিলেন। এক সময় তিনি কিছুদিন বরিশালের ব্রাহ্ম সমাজে আচার্যের কাজও করেছিলেন। কুসুমকুমারী দেবী তাঁর সুমিষ্ট গলায় সুন্দর ভাবে ধর্মসংগীত বা ব্রাহ্মসংগীতও গাইতে পারতেন।

কুসুমকুমারী দেবীর আর একটা বড় গুণ ছিল, তিনি ভাল কবিতা লিখতে পারতেন। তাঁর লেখা কোনো কোনো কবিতা আজও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের পাঠ্যপুস্তকে দেখা যায়। যেমন— তাঁর লেখা 'আদর্শ ছেলে' কবিতাটি :

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে?
কথায় না বড় হ'য়ে কাজে বড় হবে।
মুখে হাসি, বুকে বল, তেজে ভরা মন,
'মানুষ' হইতে হবে,— এই তার পণ।

বিপদ আসিলে কাছে, হও আগুয়ান,
নাই কি শরীরে তব রক্ত, মাংস, প্রাণ?
হাত, পা, সবারি আছে, মিছে কেন ভয়,
চেতনা রয়েছে যার, সে কি পড়ে রয়?

সে ছেলে কে চায় বল?— কথায় কথায়
আসে যার চোখে জল, মাথা ঘুরে যায়।
সাদা প্রাণে হাসি মুখে কর এই পণ—
মানুষ' হইতে হবে, মানুষ যখন।

কৃষকের শিশু কিংবা রাজার কুমার,
সবারি রয়েছে কাজ, এ বিশ্ব মাঝার,
হাতে প্রাণে, খাট সবে, শক্তি কর দান,
তোমরা 'মানুষ' হ'লে, দেশের কল্যাণ।

শিশুদের জন্য রচিত তাঁর আর একটি কবিতার দুছত্র :

ছোট নদী দিনরাত বহে কুল্ কুল্।
পর পারে আমগাছে থাকে বুলবুল্।

কুসুমকুমারী দেবী ভাল কবিতা তো লিখতেনই, এমন কি বৃহৎ সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে বা কাজের মধ্যে থেকেই খুব তাড়াতাড়ি কবিতা লিখতে পারতেন। জীবনানন্দ তাঁর মা'র কবিতা রচনা সম্বন্ধে লিখেছেন :

কি রকম তাড়াতাড়ি লিখতে পারতেন তিনি! রান্না করছেন, রান্না করছেন, পিসেমশায় আচার্য মনোমোহন চক্রবর্তী এসে বল্লেন— এখুনি 'ব্রহ্মবাদী'র ফর্মা প্রেসে যাচ্ছে, অবিলম্বেই একটি কবিতা লিখে দাও কুসুম।...অমনি মা খাতা-কলম নিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে একহাতে খুন্তি আর একহাতে কলম নাড়ছেন দেখা যেত— যেন চিঠি লিখছেন, বড় একটা ঠেকছে না কোথাও! আচার্য চক্রবর্তীকে প্রায় তখুনি কবিতা দিয়ে দিতেন, পরে 'ব্রহ্মবাদী'র পৃষ্ঠায় তা প'ড়ে স্বভাব-কবিদের কথা মনে পড়তো আমার। আমাদের দেশের লোক-কবিদের স্বভাবী সহজতাকে,...মা'র কবিতায় আশ্চর্য প্রসাদগুণ...মা যদি নিজের তখনকার জীবনের কবিতা লেখার বিশিষ্ট ঐতিহ্য অত তাড়াতাড়ি নিরস্ত না ক'রে ফেলতেন, তা হ'লে অনেক কিছুই হতে পারতো। যে সাহিত্যিক ও কবির গরিমা তাঁর প্রাপ্য ছিল, সেটাকে অন্তর্দমিত করে রাখলেন। তিনি প্রকাশ্যে কোনো পুরস্কার নিতে গেলেন না।

সাঁতার কাটার কৌশল এইআলি মামুদই জীবনানন্দ ও আশোকানন্দকে শিখিয়েছিল।

বাল্য ও কৈশোর

[১] খুব ছেলেবেলায় একবার দীর্ঘদিন ধরে কঠিন অসুখে ভুগেছিলেন। রোগে ভুগে ভুগে তখন তাঁর অবস্থা এমন হয়েছিল যে, তাঁর বাঁচার কোনো লক্ষণই ছিল না। শুধু তাঁর মায়ের অসাধারণ পরিচর্যা, পরিশ্রম ও সাহসের জন্যই সেবার তিনি মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছিলেন। এ সম্বন্ধে জীবনানন্দের বোন সুচরিতা দাশ[১] লিখেছেন :

> শৈশবে কঠিন পীড়ায় দাদাকে আক্রান্ত হতে হয়েছিল একবার, বাঁচবার আশা ছিল না। মা আর দাদামশায় তাঁকে নিয়ে ঘুরলেন কত স্বাস্থ্য-নিবাসে, কত বিভিন্ন জলবায়ুর জনপদে— লখ্‌নউ, আগ্রা, দিল্লী। সেদিন আমাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল না। পুরোনো চিঠিপত্র থেকে জানতে পারি, মা'র এই প্রচেষ্টাকে পরিবার-পরিজন সকলেই আত্মঘাতী বলে মনে করেছিলেন। তবু বিচলিত হননি মা। পশ্চিমে দীর্ঘদিন কাটিয়ে সেই শিশুকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে ফিরে এসেছিলেন।

সুচরিতা দেবীর এই লেখায় উল্লেখিত তাঁর দাদামশায় হলেন, তাঁর মাতামহ চন্দ্রনাথ দাস। আগেই বলেছি, এই চন্দ্রনাথবাবুও বরিশালে কালেক্টরী অফিসে কাজ করতেন। ঐ সময় তিনি কাজ থেকে অবসর নিয়ে বরিশালেই নিজের বাড়িতে বাস করছিলেন।

চন্দ্রনাথবাবু দৌহিত্র জীবনানন্দকে খুবই স্নেহ করতেন। জীবনান্দও তাঁর এই দাদামশায়ের কাছে ছড়া ও নানা রকমের গল্প শুনতে ভালবাসতেন।

এই দাদামশায় ছাড়া বাড়িতে ঠাকুরমার কাছেও জীবনানন্দ ছেলেবেলায় রূপকথার গল্প, নিজেদের বংশের পূর্বপুরুষদের ইতিহাস প্রভৃতি শুনতেন। জীবনানন্দের এক কাকা সরকারের বন বিভাগে চাকরি করতেন। তিনি ভাল শিকারী ছিলেন। জীবনানন্দ এই কাকার শিকারের অনেক গল্পও ঠাকুরমার কাছে শুনতেন।

জীবনানন্দের ছেলেবেলায় তাঁদের বাড়িতে মতির মা নামে একটি মেয়ে কাজ করত। মতির মা বাড়ির দাসী হলেও কেউই তাকে সাধারণ দাসীর মতো দেখতেন না। সকলেই তাকে নিজেদেরই একজন মনে করতেন। তাই বালক জীবনানন্দও মতির মাকে নিজেদের এক আত্মীয়া মনে করে তার কাছে বসে রূপকথার গল্প, ডাইনীর গল্প, প্লাবনের গল্প, মাছধরার গল্প প্রভৃতি নানা ধরনের গল্প ও কাহিনী

শুনতেন। শুধু মতির মা-ই নয়, মতির মা'র দুই শিশুপুত্র মতিলাল এবং শুকলালকেও কোনো অবজ্ঞা না করে জীবনানন্দ এদের সঙ্গেও মিশতেন। এদের সঙ্গে মিশে তিনি কখন কখন বাড়ির বাঁশঝাড় থেকে তল্‌তা বাঁশ কেটে ছিপ তৈরি করতেন এবং এদের সঙ্গে বসেই পুকুরে বা ডোবায় মাছও ধরতেন।

জীবনানন্দ মতিলাল ও শুকলাল এবং তাঁদের মা'র সঙ্গে যেরূপ ব্যবহার করতেন, তেমনি আপনজনের মতোই ব্যবহার করতেন বাড়ির রাজমিস্ত্রী মুনিরুদ্দিন, বাগানের শ্রমিক আলি মামুদ ও ফকির, বাড়ির গোয়ালা প্রহ্লাদ প্রভৃতির সঙ্গেও। তিনি ছেলেবেলায় এদের কাছে বসে নিজ নিজ জীবনের মজার মজার অভিজ্ঞতার কথা ও কাহিনী শুনতেন। মুনিরুদ্দিন রাজমিস্ত্রী হলেও একজন ভাল শিকারী ছিল। জীবনানন্দ এর কাছে এর শিকারের গল্প শুনতে ভালবাসতেন। আর প্রহ্লাদ যেদিন জীবনানন্দ ও অশোকানন্দ'কে সঙ্গে করে তাদের গ্রামে নিয়ে গিয়ে তার ধানের ক্ষেত দেখাত, সেদিন এই ক্ষেত দেখে জীবনানন্দের খুব ভাল লাগত। আলি মামুদ জীবনানন্দদের বাগানে সুপারি গাছের সুপারিও পাড়ত। জীবনানন্দ ও অশোকানন্দ বেতের দড়ি দিয়ে বেড়া বাঁধার কৌশল এবং দড়ির ফাঁস পায়ে গলিয়ে সুপারি গাছে উঠবার কৌশল এর কাছেই শিখেছিলেন। দুটো নারকেল একসঙ্গে বেঁধে জলে সাঁতার কাটার কৌশল এই আলি মামুদই জীবনানন্দ ও অশোকানন্দকে শিখিয়েছিল।

বাল্যে ও কৈশোরে জীবনানন্দ খুব সকালেই ঘুম থেকে উঠতেন। তাঁর তখনকার এই অভ্যাস তাঁর শেষ বয়স পর্যন্তও ছিল। ছেলেবেলায় জীবনানন্দ ঘুম থেকে উঠেই শুনতেন— মা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা-সূচক একটা গান করছেন। আর বাবা *উপনিষদ*-এর শ্লোক আবৃত্তি করছেন। এ সম্বন্ধে জীবনানন্দের ছোটভাই অশোকানন্দ লিখেছেন—
অতি প্রত্যূষে আমাদের ঘুম ভেঙে যেত। মা গান করতেন :

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে
তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে
উদয় গিরি হতে উচ্চে কত মোরে,
তিমির লয় হ'ল দীপ্তি সাগরে
স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো
সব জড়তা হতে জাগরে সতেজ উন্নত শোভাতে।

বাবা উপনিষদের শ্লোক আওড়াতেন। এঁরা আমাদের 'অপরূপ সূর্যচেতনার প্রভাতে নিয়ে আসতেন।'

'অপরূপ সূর্যচেতনার প্রভাতে নিয়ে আসতেন'— এ কথাটা জীবনানন্দের। জীবনানন্দ তাঁর পিতার প্রভাতে এই উপনিষদ পাঠের প্রসঙ্গেই লিখেছিলেন :

প্রায় রোজ শেষ রাত্রে বিশেষত হেমন্ত ও শীতকালে উপনিষদের শ্লোক আওড়াতে আওড়াতে তিনি আমাদের অপরূপ সূর্যচেতনার প্রভাতে নিয়ে আসতেন।

জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ নিজে শিক্ষক ছিলেন বলেই হয়ত বুঝেছিলেন যে, অতি শিশুবয়সে ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করা ঠিক নয়। তাঁর মত ছিল— স্কুলে ভর্তি হওযার আগে তাদের বাড়িতে কিছুদিন বাবা-মা অথবা অন্য কোনো নিকটজনের কাছে পড়া উচিত। এই ভেবে তিনি নিজের ছেলেমেয়েদেরও খুব কম বয়সে স্কুলে ভর্তি করেননি। সত্যানন্দ নিজে একজন ভাল শিক্ষক হলেও নিজের লেখাপড়া এবং নানা সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকতেন, তাই তিনি ছেলেমেয়েদের পড়াবার সময় পেতেন না। তাঁর স্ত্রী কুসুমকুমারী দেবীই তাদের পড়াতেন। কুসুমকুমারী দেবী তাঁর ছেলেমেয়েদের বাড়িতে ও বাড়ির সংলগ্ন বাগানে খেলাধুলায় প্রচুর অবসর দিয়ে, নিজের সংসারের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাদের পড়াতেন। একান্নবর্তী বৃহৎ পরিবারের কাজকর্ম করতে করতেই কাজের অবসরে এইভাবে তিনি ছেলেমেয়েদের সমস্ত স্কুল জীবনটাই তাদের স্কুলের পড়ার সহায়তা করেছিলেন। এ সম্বন্ধে জীবনানন্দ নিজেই পরে তাঁর মা'র কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন :

> সমস্ত স্কুলের জীবন তিনি আমাদের স্কুলের পড়া দেখিয়েছেন, সংসারের কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে।

ছেলেবেলায় জীবনানন্দ বাড়িতে মা'র কাছে কিছুদিন পড়ে স্থানীয় ব্রজমোহন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। জীবনানন্দ বরাবরই পড়াশুনায় ভাল ছাত্র ছিলেন। ক্লাসের পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করে তিনি স্কুল থেকে পারিতোষিক লাভ করতেন। স্কুলের একটু উপরের ক্লাসে উঠলে, স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগদীশ মুখোপাধ্যায় মশায়, ভাল ছাত্র ব'লে জীবনানন্দের উপর বিশেষ নজর রাখতেন। তিনি যত্ন ও স্নেহে জীবনানন্দকে শুধু ক্লাসের পড়া শেখানোই নয়, ভবিষ্যৎ জীবনেও প্রকৃত মানুষ হবার মতো শিক্ষাও দিয়েছিলেন। জীবনানন্দ তাঁর স্কুলের এই শিক্ষা-গুরুর কথা কোনোদিনই ভুলতে পারেননি।

জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় জীবনানন্দকে পড়াবার সুযোগ পেতেন না বটে, তবে জীবনানন্দ একটু বড় হলে পুত্রের সঙ্গে তিনি মাঝে মাঝে নানা শিক্ষণীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন এবং সে সব বিষয়ে পুত্রকে ভাবতে শেখাতেন।

জীবনানন্দ ছেলেবেলায় একটু জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই স্কুলের পাঠ্য বই ছাড়া বাইরের ভাল ভাল বইও প্রচুর পড়তেন। বাড়িতে তাঁর বাবার ভাল লাইব্রেরি ছিল। তা থেকে তিনি নিজের পড়ার মতো বই বেছে নিয়ে পড়তেন। স্কুলে ভাল ছাত্র ছিলেন ব'লে স্কুলের প্রাইজে প্রতি বছর ভাল ভাল বই পেতেন। এছাড়া তাঁর বাবা প্রতি মাসে তাঁকে কিছু কিছু করে বই কিনে দিতেন। জীবনানন্দ নিজেও কখন কখন মা'র কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে বা নিজের টিফিনের পয়সা জমিয়েও বই কিনতেন। বাল্যের এই বই কেনা ও বই পড়ার অভ্যাস তাঁর বরাবরই ছিল।

বরিশাল শহর কীর্তনখোলা নদীর তীরে অবস্থিত। জীবনানন্দের ছেলেবেলায়

বরিশাল শহরে এই নদীর তীরটি বড় সুন্দর ছিল। নদীর তীরে যেখানে জেটিতে স্টীমার দাঁড়ায়, সেই জায়গাটা পার হ'লেই তখন দেখা যেত নদীর ধার দিয়ে চলে গেছে লাল কাঁকরের রাস্তা। রাস্তার দুধারে ঝাউ গাছের সারি। আবার অন্য এক পথে বরিশালের শ্মশানভূমি ও লাশকাটা ঘর ছাড়িয়ে কিছুটা গেলে দেখা যেত এক জায়গায় কতকগুলো রবার গাছ। এদের ফেলে আরও এগিয়ে চলে গেলে চোখে পড়ত ভাঙা মন্দির ও ভাঙা অট্টালিকা। নির্জন দুপুরে বা জোছ্না রাতে এই জায়গাটিকে একটি স্বপ্নপুরী বলে মনে হ'ত।

জীবনানন্দের ছেলেবেলায় তাঁদের বাড়ির পাশ দিয়ে একটা কাঁচা রাস্তা গ্রামের দিকে চলে গিয়েছিল। সেই রাস্তা দিয়ে একটু গেলেই তখন দেখা যেত, রাস্তার দুধারে শস্যক্ষেত। বরিশালের সরস ও উর্বর মাটিতে এই শস্য ক্ষেত, এক এক ঋতুতে এক এক অপরূপ শোভা ধারণ করত।

জীবনানন্দ কখনো একা একাই, কখনো বা ছোটভাই অশোকানন্দকে সঙ্গে নিয়ে শহরের ও গ্রামের ঐ সব পথে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন।

জীবনানন্দের মামার বাড়ি ছিল বরিশালে তাঁদের বাড়ির অদূরেই। বড়মামা প্রিয়নাথ দাস ছিলেন সাব ডেপুটি কালেক্টর। প্রিয়নাথবাবু ভাগ্নে জীবনানন্দকে বড় স্নেহ করতেন। তিনি নিজের কর্মস্থল থেকে যখন বাড়ি আসতেন, তখন মাঝে মাঝে ফেরার সময় জীবনানন্দকেও নিজের কর্মস্থলে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন এবং সেখানে কাজের উপলক্ষে জলপথে কোথাও যেতে হলে, তখনও তিনি জীবনানন্দকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ফলে জীবনানন্দ ছোটবেলায় মামার সঙ্গে নদী, নালা, খাল, বিলে প্রচুর ঘুরেছেন এবং সেই বয়সেই নানা রকমের মানুষ, পশু, পাখি, গাছপালা, শস্য ফসল প্রভৃতিও চোখে দেখার একটা মস্ত বড় সুযোগ পেয়েছিলেন।

কৈশোরে বাড়ির বাগানে ফুল বাগান করার শখ জীবনানন্দের খুব প্রবল ছিল। তিনি বরিশালের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়ি থেকে ফুলের বীজ বা চারা এনে, এমন কি কলকাতা থেকেও ফুলের বীজ বা চারা আনিয়ে তাঁর বাগানে লাগাতেন। এই ফুলের বাগানে সকল সময়ে নানা রকমের ফুল ফুটে থাকত। তিনি নিজেই তাঁর ফুলের বাগানের পরিচর্যা করতেন।

জীবনানন্দের বাবা ও মা উভয়েই লিখতেন ব'লে এবং বাড়িতে সাহিত্যচর্চার একটা আবহাওয়া ছিল বলে জীবনানন্দও অতি অল্প বয়স থেকেই কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। তাঁর সেই সময়কার কোনো কবিতাই এখন আর পাওয়া যায় না। কেবল একটি কবিতার দুটি লাইন অশোকানন্দবাবুর মনে থাকায় সে সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন :

> দাদার কৈশোর বয়সের একটা কবিতার কথা স্মরণ হচ্ছে। নীচে উদ্ধৃত করছি :
>
> এল বৃষ্টি বুঝি এল
> পায়রাগুলো উড়ে যায় কার্নিশের দিকে এলোমেলো।

কলেজ জীবন

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালের ব্রজমোহন স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাস করে জীবনানন্দ বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে বা বি. এম. কলেজে ভর্তি হন। ব্রজমোহন স্কুল এবং কলেজ দুই-ই বরিশালের মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তর পিতা ব্রজমোহন দত্তর নামে প্রতিষ্ঠিত। জীবনানন্দ এই কলেজে দু'বছর পড়ে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এখান থেকে প্রথম বিভাগে আই. এ. পাস করেন। এরপর বি. এ. পড়বার সময় তিনি আর বি. এম. কলেজে না প'ড়ে কলকাতায় চলে আসেন। কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়ার সময় তিনি এখানে অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলে থাকতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে দু-বছর পড়ে তিনি ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজিতে অনার্সসহ বি. এ. পাস করেন।

এরপর তিনি ইংরাজিতে এম. এ. পড়বার জন্য এবং ঐ একই সঙ্গে আইনও পড়বার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এম. এ. ও ল. পড়ার সময় তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হার্ডিঞ্জ হস্টেলে থাকতেন। এম. এ. পড়ার আগে কিছুদিন তিনি অসুখে ভোগেন। তাই পরীক্ষায় ভাল ফল হবে না ভেবে, প্রথমে পরীক্ষা দেবেন না বলে তিনি ঠিক করেছিলেন। কিন্তু আত্মীয়স্বজনদের কথায় পরে পরীক্ষা দেন। ফলে এম. এ. পরীক্ষায় তিনি সেকেন্ড ক্লাস পেয়েছিলেন অর্থাৎ দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এম. এ. পাস করেছিলেন।

জীবনানন্দ ওকালতি করবেন বলেই 'আইন' পড়ছিলেন কিনা জানি না। তবে আইন পড়তে পড়তে কিছুদিন পরেই তিনি সিটি কলেজে অধ্যাপকের চাকরি পেয়ে গেলে, আইন পড়া ছেড়ে দেন এবং উকিল হবার বাসনা থাকলেও সে বাসনাতে ইস্তফা দেন।

জীবনানন্দ বাড়িতে তাঁর বাবা মা'র কাছে শিক্ষা এবং স্কুলে প্রধান শিক্ষক মশায়ের নিকট শিক্ষার সঙ্গে তাঁর কলেজ জীবনের শিক্ষার তুলনা করতে গিয়ে পরে এক প্রবন্ধে প্রসঙ্গত লিখেছিলেন :

> ইউনিভারসিটি থেকে পাস করে বেরিয়েছি অনেক দিন হতে চলল। কিন্তু কার কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম আমরা? আমি অন্তত? তিনজন মানুষের কাছে। একজন বাবা, একজন মা, আর একজন ব্রজমোহন স্কুলের হেডমাস্টার আচার্য জগদীশ মুখোপাধ্যায়।

> বরিশাল স্কুল থেকে পাস করে বেরিয়ে অনেক বড় বড় কলেজে পড়েছি, কিন্তু আজ জীবনের মাঝ পথে এসে প্রতিনিয়তই টের পাচ্ছি যে, আমার জীবনের শিক্ষার ভিত্তি এঁদের হাতেই গড়া। ...নানা নামী কলেজের বড় বড় অধ্যাপকের কাছে পড়েছি বটে, সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি সম্পর্কে অনেক খবর জুগিয়েছেন তাঁরা, কিন্তু বোধির অভাবে সে খবর পরীক্ষার খাতায় পর্যবসিত হয়ে ডিগ্রী দান করে অন্ধকারে বিলীন হয়ে গেছে— সে সবের কোনো পাত্তা পাওয়া যায়নি আর।

জীবনানন্দের এই কথা থেকে দেখা যাচ্ছে, তিনি বিভিন্ন কলেজে অনেক বড় বড় অধ্যাপকের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে অধ্যয়ন করলেও, তাঁর এই কলেজের শিক্ষা তাঁকে ডিগ্রী দেওয়া ছাড়া তাঁর পরবর্তী জীবনে সুদূর প্রসারী তেমন কোনো ছাপ রাখতে পারেনি। জীবনের সর্বতোমুখী সত্যকার বা প্রকৃত শিক্ষা তিনি তাঁর বাবা, মা ও ব্রজমোহন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জগদীশবাবুর কাছেই পেয়েছিলেন।

জীবনানন্দ স্কুলে পড়ার সময় যে কবিতা রচনা শুরু করেছিলেন, তাঁর কলেজ জীবনেও তা অব্যাহত ছিল। কিন্তু সে সব কবিতা আজ আর পাওয়া যায় না। এই সময় তিনি ইংরাজিতেও কবিতা লিখতেন। জীবনানন্দ কলেজে পড়ার সময় কিছু গানও রচনা করেছিলেন। এই সময় তিনি ছবিও আঁকতেন। খুব সম্ভব স্কুলের উপর ক্লাসে পড়ার সময় থেকেই তিনি ছবি আঁকা শুরু করেছিলেন। তবে ছবি বলতে পেনসিল স্কেচ। রং তুলি দিয়ে নয়, পেনসিল দিয়েই ছবি আঁকতেন। এই ছবি আঁকা সম্বন্ধে তাঁর ছোট বোন সুচরিতা দাশ লিখেছেন :

> তাঁর ছবি আঁকার নেশা ছিল, আল্‌তো পেনসিলের মৃদু চঞ্চলতার অস্ফুট আলোছায়াময় কতই না ছবি ফুটে উঠত।

জীবনানন্দের সেই সব গান ও আঁকা ছবির একটিও আজ আর নেই। জীবনানন্দের কলেজ জীবনে রচিত একটি বাংলা কবিতা যা তখনকার একটি কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল, তারই কেবল সন্ধান পাওয়া যায়।

১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে বরিশাল শহরের ব্রাহ্মরা বরিশাল থেকে *ব্রহ্মবাদী* নামে একটি মাসিক পত্রিকা বার করেন। পত্রিকাটি ছিল ধর্ম, নীতি, শিক্ষা ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক। এই সময় জীবনানন্দের বয়স দু'বছর দু'মাস।

আগে বলেছি *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকার প্রথম দিকে সম্পাদক ছিলেন জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ।

ব্রহ্মবাদী পত্রিকায় সত্যানন্দ নিজে যেমন লিখতেন, তেমনি তাঁর স্ত্রী কুসুমকুমারী দেবীও নিয়মিতই কবিতা লিখতেন। *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকায় জীবনানন্দের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন— এই পত্রিকার ২০শ বর্ষের ১ম সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩২৬ সালের বৈশাখ সংখ্যায় প্রথমেই 'বর্ষ আবাহন' নামে একটি কবিতা ছাপা হয়েছে। কবিতাটির শেষে লেখকের নাম নেই, শুধু আছে, 'শ্রী...'।

২০শ বর্ষের চৈত্র সংখ্যায় সারা বছরের লেখা ও লেখক-লেখিকাদের নাম দিয়ে যে বাৎসরিক সূচী ছাপা হয়, তাতে দেখা যায়— 'বর্ষ আবাহনের' লেখক শ্রীজীবনানন্দ দাস বি. এ.। অতএব এই কবিতাটি যে জীবনানন্দের লেখা তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদেই একমাত্র *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকা দেখতে পাই। তাও সমস্ত খণ্ড নয়, কয়েক খণ্ড মাত্র। তাই ১৩২৬ সালের আগের কোন্ *ব্রহ্মাবাদী*-তে জীবনানন্দের কবিতা প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা ঠিক জানা গেল না। এর আগে প্রকাশ হলেও হতে পারে, আবার নাও হতে পারে।

যাই হোক্, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় জীবনানন্দের যে সব প্রকাশিত কবিতা দেখা যায়, তার মধ্যে এই কবিতাটিকেই এখন তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতা বলেই মনে হয়। খুব সম্ভব জীবনানন্দ *স্বেচ্ছায় ব্রহ্মবাদী*-তে এই কবিতাটি লেখেননি, কারও অনুরোধ বা নির্দেশেই এই কবিতাটি লিখে দিয়েছিলেন। তাই নিজের নাম কবিতার সঙ্গে প্রকাশ করতে দেননি। এই নাম প্রকাশে তাঁর সংকোচ সম্বন্ধে আমার মনে হয়, যেহেতু *ব্রহ্মবাদী* ব্রাহ্মদের পত্রিকা এবং জীবনানন্দ নিজে ব্রাহ্ম হলেও ব্রাহ্মদের আচার অনুষ্ঠান, এমন কি সকল ধর্মীয় অনুষ্ঠানই এড়িয়ে চলতে ভালবাসতেন; সেই জন্যই [illegible]তত ঐ পত্রিকায় নাম প্রকাশ করতে চাননি। যাই হোক্, জীবনানন্দের প্রথম দিককার রচনার নমুনা হিসাবে সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

বর্ষ-আবাহন

ওই যে পূর্ব তোরণ-আগে
দীপ্ত-নীলে, শুভ্র রাগে
প্রভাত রবি উঠ্‌ল জেগে
দিব্য পরশ পেয়ে।

নাই গগনে মেঘের ছায়া
যেন স্বচ্ছ স্বর্গ কায়া
ভুবনভরা মুক্ত মায়া
মুগ্ধ— হৃদয় চেয়ে।

অতীত নিশি গেছে চলে,
চির-বিদায়-বার্তা ব'লে,
কোন্ আঁধারের গভীর তলে
রেখে স্মৃতি-লেখা।

এস এস ওগো নবীন,
চলে গেছে জীর্ণ মলিন
আজকে তুমি মৃত্যু-বিহীন
মুক্ত-সীমা-রেখা।

শ্রী—

সিটি কলেজে অধ্যাপনা

কলকাতার সিটি কলেজে হিন্দু ছাত্রই বেশি পড়লেও, এই কলেজটি ব্রাহ্মদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত।

জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ, পিসেমশায় মনোমোহন চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন আত্মীয়স্বজন বাঙ্গলা দেশের তৎকালীন ব্রাহ্ম সমাজের নেতৃস্থানীয় ছিলেন। তাই মনে হয়, জীবনানন্দ এম. এ. পাস করলে, হয় তাঁর পিতা, নয় তাঁর কোনো আত্মীয় কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্র বা পরিচালক সমিতির কোনো সদস্যকে ব'লে সিটি কলেজে জীবনানন্দের চাকরিটি করে দিয়েছিলেন। জীবনানন্দ ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সিটি কলেজে কাজে যোগ দেন এবং ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে কাজ করেন। এরপর এখান থেকে তাঁর কাজটি চলে যায়।

সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দের চাকরি যাওয়া সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রভৃতি প্রবীণ সাহিত্যিকরা এক একজনে এক এক রকম লিখেছেন। নতুন লেখকদের কেউ কেউ, এমন কি কোনো কোনো প্রবীণ সমালোচকও, এঁদের কারও কারও লেখাকে অভ্রান্ত মনে ক'রে, এঁদের কথাই নিজ নিজ বইয়ে লিখে যাচ্ছেন। তাই এ সম্পর্কে একটু বিস্তৃতই আলোচনা করছি :

বুদ্ধদেব বসুর লেখা, 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে' নামে একটি প্রবন্ধ আছে। এই প্রবন্ধটি তিনি তাঁর 'কালের পুতুল' এবং 'প্রবন্ধ সংকলন' উভয় গ্রন্থেই মুদ্রিত করেছেন। এই প্রবন্ধে বুদ্ধদেববাবু সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দের চাকরি যাওয়া সম্বন্ধে লিখেছেন :

> আজ নতুন করে স্মরণ করা প্রয়োজন যে জীবনানন্দ তাঁর কবি জীবনের আরম্ভ থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন যে, তারই জন্য কোনো এক সময়ে তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিল। এ কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে, 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটি সম্বন্ধে অশ্লীলতার নির্বোধ ও দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিল যে, কলকাতার কোনো এক কলেজের শুচিবায়ু-গ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত করে দেন।

'ক্যাম্পে' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৮ সালের মাঘ সংখ্যা *পরিচয়* পত্রিকায়। ৩১.১০.১৯৫৪ তারিখে জীবনানন্দের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য়

অজিত দত্ত তাঁর 'কবি জীবনানন্দ' প্রবন্ধে লিখেছেন— ঢাকা থেকে প্রকাশিত বুদ্ধদেব বসু এবং তাঁর সম্পাদিত *প্রগতি* পত্রিকায় 'ক্যাম্পে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। অজিতবাবুর এ কথা ভুল।

বুদ্ধদেববাবু তাঁর লেখায় কলেজের নাম না করলেও এটা সহজেই বোঝা যায় যে, তিনি কলকাতার সিটি কলেজের কথাই বলেছেন, কারণ, জীবনানন্দ কলকাতায় তখন একমাত্র সিটি কলেজেই চাকরি করেছিলেন।

বুদ্ধদেববাবুর এই লেখাটিকে অভ্রান্ত মনে ক'রে অম্বুজ বসু তাঁর 'একটি নক্ষত্র আসে' নামক জীবনানন্দ সম্বন্ধীয় গ্রন্থে লিখেছেন :

> ক্যাম্পে কবিতাটি পরিচয় পত্রিকায় প্রকাশিত হ'লে অশ্লীলতার অজুহাতে সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষ তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেন।

ড. সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থেও লিখেছেন :

> ইংরেজিতে এম. এ. পাস করিয়া জীবনানন্দ কলিকাতার একটি বড় বেসরকারী কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হন (১৯২২)। কলেজ কর্তৃপক্ষের মতে, তাঁহার কোনো কোনো কবিতার ভাব সুরুচির গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করায় তাঁহার কর্মচ্যুতি হয় (১৯২৮)।

বুদ্ধদেববাবু বলেছেন, কলেজের শুচিবায়ু-গ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনার পদ থেকে অপসারিত করে দেন। বুদ্ধদেববাবু এই অধ্যক্ষের নাম না বললেও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, তিনি অধ্যক্ষ হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের কথাই বলেছেন। কারণ, জীবনানন্দ যখন সিটি কলেজে কাজ করতেন, তখন হেরম্ববাবুই ঐ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। হেরম্ববাবু ঐ কলেজে সুদীর্ঘকাল অধ্যক্ষ ছিলেন এবং কলেজের পরিচালক সমিতিতে অন্যতম প্রভাবশালী সদস্যও ছিলেন।

বুদ্ধদেববাবু হেরম্ববাবুকে শুচিবায়ু-গ্রস্ত বলেছেন। শুচিবায়ু-গ্রস্ত কিনা জানি না, তবে হেরম্ববাবু তৎকালীন অধিকাংশ প্রবীণ ব্রাহ্মর ন্যায়, বরং একটু বেশি মাত্রাতেই আদর্শবাদী, নীতিবাগীশ ও সত্যবাদী ছিলেন। এ নিয়ে তাঁর সম্বন্ধে দু-একটা কাহিনীও প্রবাদের মতোই প্রচলিত আছে। যেমন, একটা এখানে বলছি :

> একদিন হেরম্ববাবু কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট (বর্তমানে নাম বিধান সরণি) দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। সেই সময় পথে এক যুবক (খুব সম্ভব কোনো কলেজের ছাত্র হবে, আর সে হেরম্ববাবুকে চিন্‌তও না) হেরম্ববাবুকে জিজ্ঞাসা করে— মশায়, স্টার থিয়েটারটা কোথায় বলতে পারেন?

হেরম্ববাবু ভাবতেন বা তাঁর ধারণা ছিল— ছেলেরা সিনেমা-থিয়েটার দেখলে সহজেই অকাল-পক্ব ও বিপথগামী হয়। তাই তিনি যুবকটিকে বললেন— জানি না।

কিন্তু স্টার থিয়েটার কোথায় হেরম্ববাবু তা জানতেন। তাই, জানি না বলায়, মিথ্যা বলা হ'ল ভেবে, তিনি তখনই ছেলেটিকে ডেকে বললেন— ওহে শোনো, শোনো, স্টার থিয়েটার কোথায় তা আমি জানি, কিন্তু বল্‌বো না।

হেরম্ববাবু এই ধরনের নীতিবাগীশ ও সত্যবাদী মানুষ ছিলেন। হেরম্ববাবু এই নীতিবোধ ও সত্যবাদীতাকেই কি বুদ্ধদেববাবু শুচিবায়ু বলেছেন?

জীবনানন্দ তাঁর কবি জীবনের আরম্ভ থেকে মধ্য ভাগ পর্যন্ত অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা নির্যাতিত, তাঁর কবিতা সম্বন্ধে অশ্লীলতার নির্বোধ ও দুর্বোধ্য অভিযোগ— ইত্যাদি ব'লে বুদ্ধদেববাবু খুব সম্ভব *শনিবারের চিঠি*-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসকেই লক্ষ্য করেছেন। কেন না, এক *শনিবারের চিঠি*-তেই জীবনানন্দের কবিতা দুর্বোধ্য এবং ক্বচিৎ কখন অশ্লীল ব'লে বহু আলোচিত ও নিন্দিত হয়েছে। তবে জীবনানন্দের কবি জীবনের ঠিক আরম্ভ থেকে নয়, কেননা, তিনি যখন *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকায়, *বঙ্গবাণী* ও *প্রবাসী* পত্রিকায়, এমন কি *কল্লোল*-এও প্রথম প্রথম কবিতা লিখতেন, তখন তাঁর কবিতার বিরূপ সমালোচনা *শনিবারের চিঠি*-তে কেন, কোনো পত্রিকাতেই হয়নি। আর *শনিবারের চিঠি*-র সব অভিযোগই নির্বোধ ও অসূয়াপন্ন ছিল কিনা, তাও বলা কঠিন। হয়ত অনেক আলোচনাই ঠিক ছিল না কিন্তু অসূয়াপন্ন ছিল কি? আমার তো মনে হয়, অপরের লেখা নিয়ে গালাগালি ও আক্রমণ করার ব্যাপারে সজনীকান্তের ব্যবসাগত দিকই ছিল বেশি। কাগজ অধিক বিক্রির জন্য তিনি সমালোচনা ও গালাগালির ছলে অপরের লেখা থেকে বেছে বেছে, বিশেষ করে অশ্লীল অংশগুলি তুলে নিজের কাগজে পরিবেশন করতেন। ফলে বহু পাঠক-পাঠিকা সমসাময়িক সমস্ত অশ্লীল রচনা একত্রে পাঠ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব হ'ত। সজনীকান্ত সাহিত্য রচনার ভঙ্গিতেই বা সাহিত্য করেই অপরের রচনা নিয়ে গালাগালি দিতেন ও আক্রমণ করতেন। এক তো অপরের নিন্দা বা গালাগালি জিনিসটাই অনেকের কাছে মুখরোচক, তার উপর সজনীকান্তের আক্রমণ বা গালাগালির ভঙ্গিটিও ছিল সাহিত্য ঘেঁষা। এই জন্যও তখন অনেকেই *শনিবারের চিঠি* কিনতেন ও পড়তেন।

পরিচয়-এ 'ক্যাম্পে' কবিতাটি প্রকাশিত হলে তখন সজনীকান্ত জীবনানন্দকে তীব্র আক্রমণ করেছিলেন। বইয়ে 'সমালোচনার সম্মুখে' অধ্যায়ে এ নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। 'ক্যাম্পে' কবিতাটি গ্রন্থের শেষে দিয়েওছি।

বুদ্ধদেববাবু বলেছেন— 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে অশ্লীলতার নির্বোধ ও দুর্বোধ্য অভিযোগ রাষ্ট্র হ'লে জীবনানন্দের কলেজের চাকরি যায়। বুদ্ধদেববাবুর এ কথা ঠিক নয়। কেন না, 'ক্যাম্পে' কবিতাটি পরিচয়ে প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩৮ সালের মাঘ মাসে অর্থাৎ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে। আর সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দের চাকরি যায় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। অর্থাৎ 'ক্যাম্পে' প্রকাশিত হওয়ার চার বছর আগে।

সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দের চাকরি যায় অন্য কারণে। একটু পরেই সে

সম্বন্ধে আলোচনা করছি। তার আগে এ বিষয়ে আর একজনের লেখা সম্বন্ধে কিছু বলছি—

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে লিখেছেন :

> সিটি কলেজে লেকচারারের কাজ করত জীবনানন্দ। কবিতায় শস্যশীর্ষে স্তন-শ্যাম-মুখ কল্পনা করেছিল বলে শুনেছি, সে কর্তৃপক্ষের কোপে পড়ে। অশ্লীলতার অপবাদে তার চাকরিটি কেড়ে নেয়। যত দূর দেখতে পাই, অশ্লীলতার হাড়িকাঠে জীবনানন্দই প্রথম বলি।

জীবনানন্দের শস্যশীর্ষে স্তন-শ্যাম-মুখ কল্পনা করার কোনো কবিতা কই দেখছি না। তবে তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থে 'অবসরের গান' কবিতাটিতে কিছুটা এই ধরনের দুটি ছত্র দেখছি। তা এই :

চারিদিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল।

অচিন্ত্যবাবু জীবনানন্দের এই কবিতাটিকেই মনে করে কি ঐ কথা বলেছেন?

তাই যদি হয়, তাহলেও বলা যেতে পারে যে, এ লেখার জন্য জীবনানন্দের চাকরি যায়নি। কেননা, জীবনানন্দের 'অবসরের গান' কবিতাটি প্রথম *প্রগতি* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালের কার্তিক মাসে অর্থাৎ ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে। কিন্তু জীবনানন্দের চাকরি যায় ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে।

অধ্যক্ষ হেরম্ববাবু সংস্কৃত সাহিত্য ও বাঙ্গলা বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিলেন কিনা জানি না, তবে এটা বলতে পারি যে, তিনি তাঁর বন্ধুস্থানীয় রবীন্দ্রনাথের কাব্যের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় স্তন শব্দ ব্যবহার করে গেছেন। অতএব কবিতায় 'স্তন' ব্যবহার করার জন্য জীবনানন্দের চাকরি যে যায়নি, তাও বলা যেতে পারে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, তবে সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দের চাকরিটা হঠাৎ গেল কেন? এবার সে সম্বন্ধেই বলছি :

হাওড়া গার্লস কলেজে জীবনানন্দের সহকর্মী এবং কলকাতায় তার ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি থেকে হাঁটা পথে দু-মিনিট দূরের প্রতিবেশী অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ একদিন বর্তমান গ্রন্থকারকে বলেছিলেন— অচিন্ত্য সেনগুপ্তর *কল্লোল যুগ* বইটা পড়ে আমি একদিন জীবনানন্দবাবুকে বলেছিলাম, আপনার কবিতা পড়লে কোনো কবিতাকেই অশ্লীল বলে তো মনে হয় না। অথচ অচিন্ত্য সেনগুপ্ত তাঁর কল্লোল যুগ বইয়ে যে লিখলেন, আপনার কবিতায় অশ্লীলতার জন্যেই সিটি কলেজ থেকে আপনার চাকরি চলে যায়, ব্যাপারটা কি বলুন তো?

আমার এই কথার উত্তরে জীবনানন্দবাবু বললেন— অচিন্ত্য ঐ ঘটনাটাকে নিয়ে

একটু সাহিত্য করেছে! আসল ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। সম্পূর্ণ অন্য।

— তবে কি সেটা?

— সেই সময় সিটি কলেজের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ যাচ্ছিল। তাই কলেজ কর্তৃপক্ষ তখন কয়েকজন জুনিয়র অধ্যাপককে ছাঁটাই-এর ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি ছাড়া আরও কয়েকজন অধ্যাপকেরও তখন এই কারণেই চাকরি যায়। চাকরি-চলে-যাওয়া আমরা এই সকলেই তখন স্টাফের মধ্যে জুনিয়র ছিলাম।

অজিতবাবু বলেছিলেন— জীবনানন্দবাবুর এই কথা যে ঠিক তাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। কারণ, আমি শুনেছি, সিটি কলেজের বহুদিন পর্যন্তই আর্থিক সচ্ছলতা ছিল না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সিটি কলেজকে কলেজের সংলগ্ন রামমোহন হস্টেলে স্থানান্তরিত করে মূল কলেজ বিল্ডিং এ. আর. পি.[১] কে ভাড়া দিলে এবং মির্জাপুর স্ট্রীটে (বর্তমান নাম সূর্য সেন স্ট্রীট) সিটি কলেজ স্কুলে সকাল ও সন্ধ্যায় কমার্স সেক্‌শন খুললে, তবেই সিটি কলেজের আর্থিক অনটন দূর হয়।

অজিতবাবু আরও বলেছিলেন, জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে এক সময়ে, সিটি কলেজে জীবনানন্দের এক সহকর্মী অধ্যাপকের একটা চিঠি *স্টেট্‌সম্যান* কাগজে আমি দেখেছিলাম। তাতেও তিনি কলেজের আর্থিক অনটনের জন্যই জীবনানন্দের চাকরি গিয়েছিল, একথা বলেছিলেন। খুব সম্ভব অচিন্ত্যবাবুর *কল্লোল যুগ* পড়েই তিনিও ঐ চিঠিটা কাগজে লিখেছিলেন।

অজিতবাবুর কাছে এই কথা শোনার পর সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দের চাকরি যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে আমি একদিন জীবনানন্দের ছোটভাই অশোকানন্দবাবুকেও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। সেদিন অশোকানন্দবাবুকে অচিন্ত্যবাবুর *কল্লোল যুগ*-এর লেখার কথাটাও বলেছিলাম। শুনে অশোকানন্দবাবু বলেছিলেন, অচিন্ত্যবাবুর ও কথা ঠিক নয়। সেই সময়ে কলেজের আর্থিক টানাটানির জন্য কয়েকজন অধ্যাপক ছাঁটাই হওয়ায় দাদাও দলে পড়েছিলেন। দাদাকে চাকরি থেকে ছাঁটাই করা হলেও, কলেজের অধ্যক্ষ হেরম্ববাবু তখন বাবাকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। তার ভাবটা ছিল এইরূপ : আর্থিক কারণে আপাতত আপনার ছেলেকে ছাঁটাই করা হলেও, আবার যখন অধ্যাপক নেওয়া হবে, তখন তাঁকে নেব।

বাবাকে লেখা হেরম্ববাবুর সেই চিঠিটা এখন আমার হাতের কাছে নেই। থাকলে আপনাকে দেখাতাম। সে চিঠিটা কোথায় আছে খুঁজে দেখতে হবে। সে চিঠি আছে। আর চিঠিতে যে ঐরূপ কথাই ছিল, তাও আমার বেশ মনে আছে।

অজিতবাবু ও অশোকানন্দবাবু যে বলেন, সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দের চাকরি যাওয়ার সময় ঐ কলেজে আর্থিক সংকট দেখা দিয়েছিল, তা ঠিকই। কেন না, আমরা জানি, সেই সময় সিটি কলেজের হিন্দু ছাত্ররা কলেজ সংলগ্ন রামমোহন হস্টেলে সরস্বতী পূজা করতে চাইলে, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাতে বাধা দেন এবং সেই নিয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কলেজের হিন্দু ছাত্রদের যে বাক্‌বিতণ্ডা হয়েছিল,

তা ক্রমে কলেজের গণ্ডী ছাড়িয়ে দেশের হিন্দু ও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

সেই সময় রবীন্দ্রনাথও ব্রাহ্মদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত না দেবার জন্য কলেজের হিন্দু ছাত্রদের বিরত থাকতে বলে এক প্রবন্ধও লিখেছিলেন। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর *রবীন্দ্র-জীবনী*-র ৩য় খণ্ডে লিখেছেন :

> এই সময়ে কলিকাতার সামান্য একটি ঘটনা এমন বিসদৃশ সাম্প্রদায়িকতার রূপ গ্রহণ করে যে কবিকে বাধ্য হইয়া লেখনী ধারণ করিতে হইল।
> কলিকাতার সিটি কলেজ সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের দ্বারা স্থাপিত ও পরিচালিত প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। কলেজের সংলগ্ন ছাত্রাবাসের নাম রামমোহন হস্টেল। এখানকার ছাত্ররা ভাল কবিয়া জানিত যে প্রতিষ্ঠানটি ব্রাহ্মদের। এ বৎসর জেদ করিয়া ছাত্ররা হস্টেলের মধ্যে সরস্বতী পূজাব আয়োজন করে, কর্তৃপক্ষও জোর করিয়া তাহা বন্ধ করিয়া দেন। এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করিয়া হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে বিরোধ দেখা দিল। সত্যাগ্রহ, অনাহার প্রভৃতি রাজনৈতিক অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া ছাত্ররা শহরে তুমুল আন্দোলন সৃষ্টি করিল। ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী লোকের অভাব নাই, অনেক সম্ভ্রান্ত লোক ছাত্রদের পক্ষ লইয়া বিষয়টাকে কদাকার ও জটিল করিয়া তুলিলেন। কোনো কোনো রাজনৈতিক নেতাও এই আন্দোলনের পৃষ্ঠপোষকতা করেন, মাইনরিটির ধর্মাধিকারের বুলি তুলিয়া। এই বিসদৃশ ব্যাপার প্রশমিত করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথ ও এনড্রুস সাহেব দুইটি প্রবন্ধ লেখেন। (মডার্ন রিভিউ— ১৯২৮ মে)
> রবীন্দ্রনাথ এই দীর্ঘ প্রবন্ধের একস্থানে পরিষ্কার করিয়া বলিলেন যে, 'ধর্মের স্বাধীনতাই যদি কাম্য হয়, তবে সে স্বাধীনতা শুধু রামমোহন হস্টেলের হিন্দু ছাত্ররা পাইবে এমন তো নহে, মুসলমান ছাত্ররাও পাইবে। মুসলমানদের পক্ষে, গো-কোরবানি ধর্মের অঙ্গ। সুতরাং এভাবে যুক্তি চলে না। একটা প্রতিষ্ঠিত সমাজের বিধিবদ্ধ কতকগুলি নিয়ম আছে, সেগুলিকে ভাঙিতে চেষ্টা করায় সৌজন্যের অভাব প্রকাশ পায়। সিটি কলেজ ব্রাহ্মদের এবং ব্রাহ্মরা প্রতিমা পূজক নহে, একথা প্রত্যেক ছাত্রই জানেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে যুক্তি থাকলেও, তিনি গো-কোরবানির তুলনা দেওয়ায় হিন্দুরা আরও ক্ষিপ্ত হয়েছিল।

কলেজে হিন্দু ছাত্রই ছিল বেশি। হিন্দু-ব্রাহ্ম এই বিবাদের ফলে তখন কলেজের হিন্দু ছাত্ররা দলে দলে কলেজ ত্যাগ করে অন্য কলেজে চলে গেল এবং নতুন হিন্দু ছাত্রও আর ভর্তি হ'ল না। ফলে ঐ এক বছরেই কলেজের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ল। এই সময়েই কলেজ কর্তৃপক্ষ কয়েকজন জুনিয়র অধ্যাপককে ছাঁটাই করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

হিন্দু-ব্রাহ্ম এই বিবাদ অবশ্য ক্রমে মিটে গিয়েছিল এবং হিন্দু ছাত্ররাও আবার কলেজে ভর্তি হয়েছিল। তবে এই বিবাদ মিটতে ও কলেজে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসতে কয়েক বছর সময় লেগেছিল।

সিটি কলেজে অধ্যাপনা কালে অধিকাংশ সময় জীবনানন্দ হ্যারিসন রোডে (বর্তমান নাম মহাত্মা গান্ধী রোড) প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ থাকতেন। মাঝে বছর দুই ১৯২৪/২৫ খ্রীষ্টাব্দে বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে ছিলেন। বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে একটা ঘর ভাড়া করে থাকতেন। ঐ সময় তাঁর ছোটভাই অশোকানন্দ কলকাতায় এম. এসসি. পড়তেন। দু ভাই একত্রে থাকতেন এবং নিজেরাই রান্না করে খেতেন। এঁদের ঐ সময়কার কথায় জীবনানন্দের ছোটবোন সুচরিতা দাশ লিখেছেন :

> বেচু চ্যাটার্জীর একখানা ঘরে 'দু'ভাই-এর দিন কাটে। একজন অধ্যাপক, আর একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এসসি. ক্লাসের ছাত্র। দাদা অধ্যাপনা করে টাকা রোজগার করেই খালাস। বাকি সময় লেখায় কাটে। আর সব দায়দায়িত্ব মেজদার। মেজদার কাটে স্টোভে রান্না করায়, ছোট্ট সংসারে নানান্ টুকিটাকি কাজে, তার ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনোয়। দুই ভাই-এর নিবিড় অন্তরঙ্গতায় দিনগুলো মধুর হয়ে ওঠে। কখনো বরিশাল থেকে মা এসে উপস্থিত। মা'র স্নেহে...ভাঙ্গা হাটে চাঁদেব আলো ঝলমল করে।

সিটি কলেজে অধ্যাপনা কালেই জীবনানন্দ কলকাতার *বঙ্গবাণী*, *কল্লোল*, *প্রবাসী*, *ধূপছায়া*, *বিজলী* ও *কালি-কলম* পত্রিকায় নিজের কবিতা প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। এই সময়েই ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকায় অজিতকুমার দত্ত ও বুদ্ধদেব বসু তাঁদের হাতের লেখা *প্রগতি* পত্রিকাকে ছাপা মাসিক পত্রিকা হিসাবে বার করতে থাকলে জীবনানন্দ তাতেও লেখা দিতে থাকেন।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন তারিখে দেশবন্ধুর মৃত্যু হলে জীবনানন্দ তখন 'দেশবন্ধু প্রয়াণে' নামে একটি কবিতা লিখে ১৩৩২ সালের শ্রাবণ মাসের *বঙ্গবাণী* পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন।

জীবনানন্দ তখন সাহিত্যিক মহলে সম্পূর্ণ অপরিচিত হ'লেও এই কবিতার জন্য তিনি অনেকের প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। এ সম্বন্ধে অশোকানন্দ দাশ লিখেছেন:

> দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত অভিভূত হয়েছিলেন। তখন যে কবিতা তিনি লিখেছিলেন, বোধ হয় তাঁর প্রথম প্রকাশিত কবিতার মধ্যে সেটিও একটি। সেই প্রায়-প্রথম কবিতাটি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। আমার মনে আছে, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর দৈনিক কাগজে এই কবিতার প্রশংসা করেছিলেন। শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় মহাশয়ও বলেছিলেন :
>
> > এই কবিতা পড়ে মনে হয়েছে, এটা একজন প্রবীণ লব্ধ-প্রতিষ্ঠিত কবি ছদ্মনামে লিখেছেন।' ...আমি ঘটনাটির উল্লেখ করছি এই জন্য যে, গোড়া থেকে প্রস্তুত হয়েই তিনি কাব্যক্ষেত্রে নেমেছিলেন— যাকে বলে কাঁচা হাতের পরিচয়, তা তিনি কোনও দিন দেননি।

কল্লোল পত্রিকায় জীবনানন্দের প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালের

ফাল্গুন মাসে। সে কবিতাটির নাম ছিল— 'নীলিমা'। *কল্লোল*-এ এই কবিতাটি প্রকাশের কথা প্রসঙ্গে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে লিখেছেন :

> হঠাৎ কল্লোলে একটা কবিতা এসে পড়ল— নীলিমা, ঠিক এক টুকরো নীল আকাশের সারল্যের মতো। মন অপরিমিত খুশি হয়ে উঠল। লেখক অচেনা, কিন্তু ঠিকানাটা কাছেই, বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট। বলা-কওয়া নেই, সটান একদিন গিয়ে দরজায় হানা দিলাম।
>
> এই শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত!
>
> শুধু মনে মনে সম্ভাষণ করে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। একেবারে সশরীরে এসে আবির্ভূত হলাম। আপনার নিবিড়, গভীর কবি-মন প্রসন্ন নীলিমার মতো প্রসারিত করে দিয়েছেন। ভাবলাম, আপনার হৃদয়ের সেই প্রসন্নতার স্বাদ নিই।
>
> ভীরু হাসি হেসে জীবনানন্দ আমার হাত ধরল টেনে নিয়ে গেল তার ঘরের মধ্যে। তার হৃদয়ের মাঝখানে।
>
> লোকটি যতই গুপ্ত হোক পদবীর গুপ্ত তখনো বর্জন করেনি।...
>
> জোর করে তাকে দু-একদিন কল্লোল অফিসে টেনে নিয়ে গেছি, কিন্তু একটুও আরাম পায়নি, সুর মেলাতে পারেনি সেই সপ্তস্বরে।

অচিন্ত্যবাবু তাঁর *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে একথা লিখলেও পরে জীবনানন্দের মৃত্যুর পর জীবনানন্দ সংখ্যা *ময়ূখ* পত্রিকায় 'অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ' নামে এক প্রবন্ধে লিখেছিলেন :

> এক টুকরো নীলিমার মতো একটি কবিতা উড়ে এসে পড়ল কল্লোলে। লেখক শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ঠিকানা? এক ডাকেরও পথ নয়। ...বিনা সই-সুপারিশে সটান হাজির হলাম তার মেসে।....

কল্লোলে জীবনানন্দের 'নীলিমা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৩২ সালের ফাল্গুনে অর্থাৎ ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি-মার্চে। আমি আগেই বলেছি— জীবনানন্দ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে তাঁর নিজের বাসা বাড়িতে ছিলেন। তাই বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটে থাকা কালে তাঁর ঐ কবিতা *কল্লোল*-এ প্রকাশিত হয়নি। তিনি তখন ছিলেন প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ— অচিন্ত্যবাবুর কথায় 'মেসে'।

১০/২ পটুয়াটোলা লেনের কল্লোল অফিস থেকে বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট প্রায় এক মাইল। কিন্তু *কল্লোল* অফিস থেকে ৬৬নং হ্যারিসন রোডে অবস্থিত প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং হাঁটা পথে মাত্র মিনিট দুয়ের পথ। অচিন্ত্যবাবুর কথামতো 'এক ডাকেরও পথ নয়'।

তাই এ সম্পর্কে অচিন্ত্যবাবুর শেষের লেখাটাই ঠিক।

অচিন্ত্যবাবু তাঁর কল্লোল যুগ গ্রন্থে জীবনানন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন :

জোর করে তাকে দু-একদিন *কল্লোল* অফিসে টেনে নিয়ে গেছি। কিন্তু একটুও আরাম পায়নি।

অচিন্ত্যবাবুর *কল্লোল যুগ*-এর এই অংশটি পড়ে জীবনানন্দ অচিন্ত্যবাবুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

> 'কল্লোলের সেই ঘরটায় আমি দু-চার বার নয়, দুশো বার তো গিয়েছি খুবই, তুমি বিকেলের দিকে আসতে— আমি সকালের দিকে যেতাম। দীনেশরঞ্জনকে সব সময়েই দেখতাম। ...তুমি প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ প্রায়ই আসতে— বেড়াতে বেরুতাম তারপর— চৌরঙ্গীর দিকে প্রায়ই।....'

অচিন্ত্যবাবুকে লেখা জীবনানন্দের এই চিঠিটিও অচিন্ত্যবাবু প্রসঙ্গত তাঁর 'অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ' প্রবন্ধে মুদ্রিত করেছেন। বিকালের দিকে অচিন্ত্যবাবু যে প্রায়ই জীবনানন্দের সঙ্গে গড়ের মাঠের দিকে বেড়াতে যেতেন, সে সম্বন্ধেও অচিন্ত্যবাবু তাঁর ঐ প্রবন্ধে লিখেছেন :

> তখনকার দিনে আমাদের অবস্থা, ছাতাও নেই, মাথাও নেই। আর জীবনানন্দ সিটি কলেজের অধ্যাপক, রোজগার করে দস্তুর মাফিক। ...দুজনে বেড়াতে গিয়েছি চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে গড়ের মাঠের দিকে, মাঝে ইন্দো বর্মায় চা কাটলেট খেয়ে নিয়েছি, জীবনানন্দই খাইয়েছে। এক একদিন বা তার পিছু নিয়ে তাকে ধরে ফেলেছি রেষ্টুরেন্টে, তাকে চম্‌কে দিয়েছি তার পাশে বসে। সুপ্তোত্থিত শিশুর মতো সহাস্য মুখে আমন্ত্রণ করে নিয়েছে। রূঢ় হস্তক্ষেপ করে ভাগ বসিয়েছি তার খাবারের প্লেটে। তার হৃদয়ের ভাণ্ডারে।....

জীবনানন্দ যে কিরূপ বন্ধু-বৎসল ছিলেন এবং বন্ধুদের খাওয়াতেও ভালবাসতেন, অচিন্ত্যবাবুর এই লেখাটি থেকে তারও পরিচয় পাওয়া যায়।

'এক টুকরো নীলিমার মতো একটি কবিতা উড়ে এসে পড়ল কল্লোলে'— অচিন্ত্যবাবুর এই কথাটা পড়লে মনে হয়, জীবনানন্দ তাঁর কবিতাটি ডাকে *কল্লোল* অফিসে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কল্লোল অফিসের পাশে থেকেও জীবনানন্দ নিজে না গিয়ে কি ডাকেই কবিতাটি পাঠিয়েছিলেন? আর তখনও পর্যন্ত কি *কল্লোল*-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশের সঙ্গে জীবনানন্দের পরিচয় হয়নি?

যাই হোক্, দীনেশরঞ্জনের সঙ্গে জীবনানন্দের কিভাবে প্রথম পরিচয় হয়েছিল, সে সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি, অশোকানন্দ দাশের এক লেখা থেকে। তিনি লিখেছেন :

> কবি স্বর্গীয়া উমা দেবী তাঁর কাব্য অনুরাগিণী ছিলেন। হাজরা রোডে তাঁর একটা ক্লাব ছিল— যার নাম ছিল, ফোর আর্টস ক্লাব। তাঁর মধ্যবর্তিতায় দিনেশ দাশের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

সিটি কলেজে অধ্যাপনাকালে জীবনানন্দ যখন প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ থাকতেন, তখন অচিন্ত্যবাবুই শুধু নয়, অন্যান্য সাহিত্যিকরাও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ও আলাপ করতে যেতেন। কেউ অনেকবার গেছেন, কেউ বা ক্বচিৎ কখন গেছেন। যেমন—বুদ্ধদেব বসু একবার গিয়েছিলেন। সে সম্বন্ধে তিনি তাঁর 'জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> হ্যারিসন রোডে তাঁর বোর্ডিঙের তেতলা কিংবা চার তলায় অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার আরোহণ করেছিলাম।

কবি মোহিতলাল মজুমদার অনেকবার গিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে অশোকানন্দ দাশ তাঁর 'আমার দাদা জীবনানন্দ দাশ' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> এই সময় মোহিতলাল মজুমদার তাঁর কবিতা পড়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ করেছিলেন। তিনি তখন সিটি কলেজে কাজ করেন। হ্যারিসন রোডে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ থাকতেন। আমি পাঠ সমাপ্ত করে কিছুদিন তাঁর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ ছিলাম। অনেক শীতের সন্ধ্যায় দেখেছি, মোহিতবাবু কালো কোট পরে গলায় কম্‌ফোর্টার জড়িয়ে এসে আসন গ্রহণ করতেন। বহুক্ষণ ধরে কবিতা নিয়ে তাঁদের আলাপ-আলোচনা চলতো।

১৩৩৩-৩৪ সালে প্রকাশিত কবিতা

১৩৩২ সালে কোনো কোনো পত্রিকায় জীবনানন্দের কয়েকটা কবিতা প্রকাশিত হয়ে থাকলেও, ১৩৩৩ সাল থেকে পর পর কয়েক বছর— বিশেষ করে ১৩৩৩ ও ৩৪ সালে পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশের যেন বন্যা বয়ে গিয়েছিল। এই সময় এমনও হয়েছে যে, একই মাসে তখনকার অন্তত চারটি বিখ্যাত পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। আবার একই মাসে একই কাগজে প্রকাশিত অপ্রকাশিত করে দুটা কবিতাও বেরিয়েছে। ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ মাসে *প্রবাসী*, *বঙ্গবাণী*, *কল্লোল* ও *.লি-কলমে* তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।[১] পরের মাসে কালি-কলমের সম্পাদক তাঁর কাগজে জীবনানন্দের একটা নতুন কবিতা তো ছেপেছেন-ই, এমন কি *শ্রাবণের প্রবাসী*-তে প্রকাশিত জীবনানন্দের 'বেদিয়া' কবিতাটিও উদ্ধৃত করে ছেপেছেন।— এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, তখন সম্পাদকরা বিশেষ করে *কালি-কলম*-এর সম্পাদকের মতো সম্পাদকরা তাঁর কবিতাকে কিরূপ সম্মান দিতেন।

পুরাতন পত্র-পত্রিকা দিনে দিনে ক্রমশই দুর্লভ ও লুপ্ত হয়ে আসছে। তবুও ১৩৩৩ ও ৩৪ সালের যে কটা পত্রিকা দেখবার সুযোগ পেয়েছি, তাতে কোন্ কোন্ কাগজে কোন্ কোন্ মাসের জীবনানন্দের কি কি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তার একটা তালিকা এখানে দিলাম :

কল্লোল ১৩৩৩ সাল

মাস	কবিতা
বৈশাখ	বেদুইন
জ্যৈষ্ঠ	আঁধারের যাত্রী
আষাঢ়	মোর আঁখিজল
শ্রাবণ	নাবিক
কার্তিক	কোহিনুর
পৌষ	শ্মশান
চৈত্র	দক্ষিণা

বঙ্গবাণী ১৩৩৩

আষাঢ়	হিন্দু-মুসলমান
শ্রাবণ	ভারতবর্ষ
ভাদ্র	রামদাস
কার্তিক	নিবেদন

কালি-কলম ১৩৩৩

জ্যৈষ্ঠ	পতিতা
আষাঢ়	মরীচিকার কাছে
শ্রাবণ	শেষ শয্যায়
ভাদ্র	বেদিয়া, (প্রবাসী থেকে উদ্ধৃত)
	কিশোরের প্রতি
কার্তিক	নব-নবীনের লাগি
ফাল্গুন	ওগো দরদিয়া
চৈত্র	সুদূর বিধুর কবি

প্রবাসী ১৩৩৩

শ্রাবণ	বেদিয়া

কল্লোল ১৩৩৪

জ্যৈষ্ঠ	সিন্ধু
পৌষ	ঝরা ফসলের গান
ফাল্গুন	আদিম

বঙ্গবাণী ১৩৩৪

মাঘ	পলাতকা

প্রবাসী ১৩৩৪

মাঘ	কবি

প্রগতি ১৩৩৪

শ্রাবণ	খুশ্‌রোজী
আশ্বিন	কবি
পৌষ	পলাতক
মাঘ	পরবাসী
ফাল্গুন	পিপাসার গান

এখানে ১৩৩৪ সালের এই অসম্পূর্ণ তালিকাটিতেও দেখা যাচ্ছে, এ বছর মাঘ মাসেও অন্তত তিনটি পত্রিকায় একই সঙ্গে কবিতা বেরিয়েছিল।

ড. সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন, ১৩৩৪ সালের মাঘ সংখ্যা প্রবাসীতে জীবনানন্দের 'পলাতক' নামে কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। সুকুমারবাবুকে অনুসরণ করে অম্বুজ বসুও তাঁর জীবনানন্দ সম্বন্ধীয় *গ্রন্থ*— 'একটি নক্ষত্র আসে'তে লিখেছেন যে, ১৩৩৪ সালের মাঘ সংখ্যা *প্রবাসী*-তে যে কবিতাটি বেরোয় তার নাম পলাতক। এঁরা এঁদের গ্রন্থে ঐ কবিতাটি উদ্ধৃতও করেছেন।

এঁদের কথা ঠিক নয়। কেন না, *প্রবাসী*-র ঐ মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতাটির নাম 'কবি'। আরও কবিতাটির নাম 'পলাতক' নয়, 'পলাতকা'। ঐ কবিতাটি বেরোয় *বঙ্গবাণী*-র মাঘ (১৩৩৪) সংখ্যায়। জীবনানন্দের 'পলাতক' নামের একটি কবিতা বেরোয় *প্রগতি*-র পৌষ (১৯৩৪) সংখ্যায়। *প্রগতি* বেরোয় ১৩৩৪ সালের আষাঢ় মাসে। জীবনানন্দ শ্রাবণ মাস থেকে এতে লিখতে শুরু করেন।

১৩৩৪ সালে প্রকাশিত জীবনানন্দের *ঝরা পালক* গ্রন্থের ভূমিকায় জীবনানন্দ বলে গেছেন, ঐ গ্রন্থের কবিতা *বিজলী*-তেও প্রকাশিত হয়েছিল। *বিজলী* না পাওয়ায় জানা গেল না, *বিজলী*-তে কোন্ কোন্ কবিতা বেরিয়েছিল।

পদবী পরিবর্তন

জীবনানন্দের বংশ-পরিচয় প্রসঙ্গে আগেই বলেছি, এঁদের আসল পদবী ছিল— দাসগুপ্ত। তা থেকে এঁরা হয়েছিলেন— দাস। আর দাস বলতে দাশ নয়, দাস-ই।

বনানন্দের পিতার ক্ষেত্রে দেখা যায়— তিনি নিজে *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে, বিভিন্ন রচনায় লেখক হিসাবে, ব্রাহ্মবন্ধু সভার সম্পাদকরূপে প্রভৃতি সর্বত্রই নাম লিখতেন— সত্যানন্দ দাস। *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকায় জীবনানন্দের মা কুসুমকুমারী দেবীর যে-সব কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, সে-সব কবিতার লেখিকা হিসাবে তাঁর নাম আছে— কুসুমকুমারী দাস। *ব্রহ্মবাদী* পত্রিকায় জীবনানন্দের যে কবিতা বেরিয়েছিল, তাতে সূচীপত্রে জীবনানন্দেরও নাম ছিল— জীবনানন্দ দাস।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে জীবনানন্দ তাহলে দাস থেকে দাশ হলেন কবে?

এ সম্বন্ধে জীবনানন্দের ছোটভাই অশোকানন্দবাবুর কাছ থেকে যা জানতে পেরেছি তা হচ্ছে এই—

অশোকানন্দবাবু বলেন :

> আমার ঠাকুরদা ব্রাহ্ম হয়ে জাতিভেদ মানতেন না বলে নিজের পদবী থেকে বৈদ্যত্ব-সূচক গুপ্তটা বাদ দিয়েছিলেন। দাদাও অনেকটা ঐ একই যুক্তিতে আবার এক সময় আমাদের পদবীর সঙ্গে গুপ্তটা বসিয়েছিলেন। তিনি তখন বলেছিলেন— আগে আমরা বৈদ্যই থাকি, আর যাই থাকি, এখন তো আর আমরা জাতিভেদ মানি না। অতএব শুধু শুধু মূল পদবীটাকে বদলেই বা লাভ কি? এই বলে তিনি ঠাকুরদার আমলের ত্যাগ করা গুপ্তটাকে আবার পদবীর শেষে বসিয়েছিলেন। তবে দাদা ঐ সময় দাসগুপ্ত না লিখে দাশগুপ্ত লিখতেন। এর কারণ, আমার মনে আছে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ একবার বৈদ্যজাতির লোকদের বলেছিলেন— বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁদের পদবী দাস বা দাসগুপ্ত তাঁরা দাস, দাসগুপ্তর বদলে দাশ, দাশগুপ্ত লিখলেই ভাল হয়। দেশবন্ধু নিজেই বৈদ্য ছিলেন ব'লে নিজেও নাম লিখতেন— চিত্তরঞ্জন দাশ।
>
> মূলে আমরাও বৈদ্য ছিলাম, এই ভেবেই হয়ত দাদা দেশবন্ধুর কথামতো তখন দাসগুপ্ত না লিখে দাশগুপ্ত লিখেছিলেন। পরে আবার যখন তিনি দাশগুপ্তর গুপ্তটা বাদ দেন, তখন ঐ দাশই থেকে যায়। আমি কোনো দিনই দাশগুপ্ত হইনি। দাস থেকে দাশ হয়েছি।

জীবনানন্দ তাঁর কলেজ জীবন পর্যন্ত বরাবরই দাস ছিলেন। কলেজ জীবনের শেষ দিকে পত্রিকায় লেখা প্রকাশের সময়ই কেবল নামের সঙ্গে দাশগুপ্ত লিখতেন। সিটি কলেজে চাকরির ক্ষেত্রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ.-র সার্টিফিকেট অনুযায়ী দাসই ছিলেন।

দেশবন্ধুর উপর জীবনানন্দের বরাবরই একটা গভীর শ্রদ্ধা ছিল। সেইজন্যই কি তিনি ব্রাহ্ম হয়েও এবং জাতিভেদ না মানা সত্ত্বেও, দেশবন্ধুর কথা অনুযায়ী আগে বৈদ্য ছিলেন বলেই শুধু দাসগুপ্ত বা দাস না হয়ে দাশগুপ্ত ও দাশ হয়েছিলেন?

দেশবন্ধু বৈদ্যজাতির লোকদের পদবীর বানান পরিবর্তনের এই যে নির্দেশ দিয়েছিলেন, এর কারণ সম্বন্ধে আমার মনে হয়— দাস শব্দের যত রকম অর্থই থাকুক, সাধারণের কাছে এ শব্দটার প্রধান বা মুখ্য অর্থ হল— ভৃত্য বা সেবক। আর দাশ শব্দের অন্য অর্থ থাকলেও এর একটা অর্থ হল— ব্রাহ্মণ। বৈদ্যরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলেন এবং উপবীতও ধারণ করেন। এই জন্যই হয়ত দেশবন্ধু, 'দাস' যার লোক-প্রচলিত অর্থ ভৃত্য বা সেবক, তা থেকে ব্রাহ্মণ বৈদ্যদের পৃথক বোঝাবার জন্যই, 'দাশ' এর অন্য অর্থ যাই থাক, অপ্রচলিত দাশ লিখতে বলেছিলেন।

দেশবন্ধুর কথামতো সেই থেকেই বৈদ্যরা দাশ ও দাশগুপ্ত লিখে থাকেন। তবে দাসগুপ্ত উপাধির কেউ কেউ তখনই ভেবেছিলেন, দাসগুপ্তর শেষে গুপ্ত যখন আছে, তখন তাতেই তো বৈদ্য বোঝাচ্ছে। শুধু শুধু 'স' কে 'শ' করার দরকার কি! তাছাড়া দাশ মানে ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্যও তো হয়। এই ভেবে অন্তত দাসগুপ্তর কেউ কেউ 'দাসগুপ্ত'ই রেখেছিলেন। যেমন, প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও পণ্ডিত ড. সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বরাবর দাসগুপ্তই লিখতেন।

যাই হোক, জীবনানন্দ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কবিতা প্রকাশের সময় কিছুদিন নিজের নামের সঙ্গে দাশগুপ্ত ব্যবহার করলেও, পরে তাঁর গ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকে দাশগুপ্ত ছেড়ে দাশ হন। কেন না, ১৩৩৪ সালে তাঁর প্রথম যে গ্রন্থ *ঝরা পালক* বেরোয় তা দাশ পদবীতেই। এই গ্রন্থ প্রকাশের সময় থেকে মূলত তিনি পত্র-পত্রিকাতেও কবিতা দেওয়ার সময় দাশ লিখতে থাকেন এবং সেই থেকেই দাশগুপ্তর গুপ্তও বিসর্জন দেন।

তবে লেখার সঙ্গে দাশগুপ্ত না লিখলেও, মনে হয়, তিনি আরও কয়েক বছর পর্যন্ত মুখে কোথাও কোথাও প্রয়োজন বোধে নিজের নামের সঙ্গে 'দাশগুপ্ত' ব্যবহার করতেন। জীবনানন্দের বিয়ে হয়েছিল ১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাসে। বিবাহের আগে জীবনানন্দ ভাবী স্ত্রী লাবণ্য দেবীকে দেখতে গিয়ে সেখানে নিজের নাম বলেছিলেন— জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। লাবণ্য দেবী সেই সময়ের কথায় তাঁর 'মানুষ জীবনানন্দ' প্রবন্ধে লিখেছেন— জ্যাঠামশায় আমাকে বললেন— এই যে মা এস আলাপ করিয়ে দিই। এঁর নাম জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। দিল্লী থেকে এসেছেন।

লাবণ্য দেবী ছিলেন বৈদ্য রোহিণীকুমার গুপ্তের কন্যা। লাবণ্য দেবীর জ্যাঠামশায়

ব্রাহ্ম ছিলেন। তবুও খুব সম্ভব নিজে ব্রাহ্ম হলেও বৈদ্য সম্প্রদায়ের এই কথাটা বোঝাবার জন্যই জীবনানন্দ দাশগুপ্ত বলেছিলেন। অথচ কয়েক বছর আগেই তিনি গুপ্ত ত্যাগ করেছিলেন।

জীবনানন্দ শেষ পর্যন্ত দাশ হ'লে, তখন কেউ তাঁর নাম লিখতে গিয়ে পদবীর বানানে 'স'র লিখলে তিনি একটু ক্ষুণ্ণই হতেন। কবি কিরণশংকর সেনগুপ্ত একদিন কথায় কথায় আমার কাছে বলেছিলেন :

> জীবনানন্দের নাম লিখতে গিয়ে কেউ তাঁর পদবীটা দাশ না লিখে দাস লিখলে, তিনি বিরক্ত হতেন। একদিন তিনি প্রসঙ্গত আমাকে বললেন,— দেখুন না সাহিত্যিকদেরও অনেকেই আমার নামটা ঠিক করে লিখতে পারেন না। পদবীর বানানটায় তাঁরা প্রায়ই ভুল করেন।

বাংলার বৈষ্ণব মহাজনদের কথা বাদ দিলেও, 'দাস' হিন্দু সমাজের বহু সম্প্রদায়েরই পদবী এবং এটা একটা বহুল প্রচলিত পদবীই। তাই লোকে দাশ ও দাস-এর বিচার না করে প্রায়ই দাস লিখে থাকেন। বৈদ্যরা এক তো হিন্দু সমাজে সংখ্যায় অতি অল্প। তার উপর নাম দেখে বা নাম শুনে কে বৈদ্য তা ঠিক করাও কঠিন। তাছাড়া 'দাশ'-এর প্রচলনও বেশি দিনের নয়। তাই জীবনানন্দের পদবী লিখতে গিয়ে অনেকেই দাস লিখতেন। এমন কি, তিনি নিজে কবিতার সঙ্গে তাঁর নাম লিখে দিলেও, দাশ বানানটা ভুল ভেবে প্রেসের কম্পোজিটার বা প্রুফ রিডার, হয়ত বা সম্পাদক নিজেই কেটে 'দাস' করে দিতেন। তাই ১৩৩৮ সালেও *পরিচয়* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' নামে যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে লেখকের নাম হিসাবে ছিল— জীবনানন্দ দাস।

পরে অবশ্য এ ভুলটা আর কেউ করতেন না। সকলেই জীবনানন্দ দাশ-ই লিখতেন।

এঁদের ক্ষেত্রে এই শ, স,-র গোলমাল যে পরেও একেবারেই হত না, তা নয়। এই রকম একটা ঘটনা দেখি, জীবনানন্দের ছোট ভাই অশোকানন্দের ক্ষেত্রে। যেমন— সিগনেট সংস্করণ হিসাবে জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থের যে ৪র্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তার ভূমিকায় লেখক হিসাবে অশোকানন্দবাবুর নাম আছে অশোকানন্দ দাস। অথচ সিগনেট থেকেই জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর 'রূপসী বাংলা' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক হিসাবে নাম আছে— অশোকানন্দ দাশ। শ থেকে স করা এটা নিছক প্রুফ রিডারের বানান শুদ্ধির মতো কাজ। না হলে বলতে হয়, অশোকানন্দবাবু দাস, দাশ দুই-ই লিখতেন।

ঝরা পালক

জীবনানন্দের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ— *ঝরা পালক*। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণের টাইটেল পৃষ্ঠায় গ্রন্থের প্রকাশকাল হিসাবে লেখা আছে, সন ১৩৩৪ সাল। বই-এর ভিতরে যে ভূমিকা আছে, তাতে দেখা যায়, জীবনানন্দ ভূমিকা লিখে তারিখ দিয়েছেন, ১০ই আশ্বিন ১৩৩৪।

বই-এর ভূমিকায় আশ্বিন মাসের তারিখ থাকলেও আমার মনে হয়, বইটি বেরিয়েছিল পৌষ মাসের কোনো এক সময়ে। আমার এইরূপ অনুমানের কারণ এই—

জীবনানন্দ *ঝরা পালক*-এ গ্রন্থকার হিসাবে তাঁর নাম দেন শ্রীজীবনানন্দ দাশ। ঐ ১৩৩৪ সালের পৌষ মাস থেকেই মাসিক পত্রে জীবনানন্দের প্রকাশিত কবিতার সঙ্গে তাঁর নামও প্রকাশিত হতে থাকে শ্রীজীবনানন্দ দাশ হিসাবে। যেমন— ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসের কল্লোলে 'ঝরা ফসলের গান' নামে তাঁর যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে তাঁর নাম ছিল শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত। অবশ্য ১৩৩৪ সালের পৌষের পরেও কিছুদিন কোনো কোনো পত্রিকায় তাঁর নামের সঙ্গে দাশগুপ্ত থেকে দু-একটা কবিতা বেরিয়েছে। যেমন— ১৩৩৪ সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত 'কবি' নামক কবিতাটির সঙ্গে তাঁর নাম ছিল শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত। এ ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, এ কবিতা তিনি অন্তত দু-এক মাস আগেই প্রবাসীতে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং তখন তিনি দাশগুপ্তই ছিলেন। কল্লোলের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, কল্লোল-সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ ছিলেন জীবনানন্দের বন্ধু-স্থানীয়, আর কল্লোল অফিসের পাশেই জীবনানন্দ থাকতেন। কল্লোল প্রতি মাসের শেষ দিকে বেরোত। তখন প্রবাসী বেরোত প্রতি মাসের ১লা তারিখে।

যাই হোক, তবে এটা ঠিক যে, *ঝরা পালক* প্রকাশের সময় থেকেই জীবনানন্দ বই-এ ও পত্রিকায় সর্বত্রই দাশগুপ্তর গুপ্ত বাদ দিয়ে শুধু দাশ হন।[১] কেন না, বাজারে যে বই বিক্রি হবে তাতে নামের সঙ্গে এক পদবী থাকবে, আর মাসিক পত্রিকায় যে কবিতা প্রকাশিত হবে তাতে ঐ একই নামের সঙ্গে অন্য পদবী থাকবে, এ কেউ করে না। তাই ১৩৩৪ সালের পৌষ মাসের কল্লোলে প্রকাশিত কবিতাটি দেখে মনে হয়, এই পৌষেই বইটিও বেরিয়েছিল।

এখানে প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে, জীবনানন্দের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ *ধূসর*

পাণ্ডুলিপি-র ভূমিকায়ও এক আশ্বিনের উল্লেখ থাকলেও বইটি বেরিয়েছিল তখন মাস দুই পরে অগ্রহায়ণের শেষ দিকে। গ্রন্থের প্রকাশকাল হিসাবে ধূসর পাণ্ডুলিপিতেই এর উল্লেখ আছে।

আমার এইরূপ সিদ্ধান্ত করার আরও একটা কারণ হচ্ছে—

ভূমিকা সমেত সমস্ত বই-ই আশ্বিন-কার্তিকে ছাপা হয়ে গেলেও বই-এর কভার ছাপা হয়েছিল মনে হয়, দু-এক মাস পরে। তাতেই হয়ত বই বেরোতে দেরি হয়েছিল।

অতএব বলা যেতে পারে, *ঝরা পালক* ১৩৩৪ এর পৌষেই বেরিয়েছিল। পৌষের প্রথম দিকে হ'লে খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে হবে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বরে। আর পৌষের শেষ দিকে হলে হবে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে। এই জন্যই হয়ত, জীবনানন্দের *ঝরা পালক*-এর প্রকাশ কাল খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দিতে গিয়ে কেউ বলেছেন, ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে; যেমন— সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস*, (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে লিখেছেন— ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। আবার কেউ বলেছেন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে। যেমন, *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা* গ্রন্থের শেষে জীবনানন্দের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় আছে, তাতে *ঝরা পালক*-এর প্রকাশ কাল বলা হয়েছে— ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ।

ঝরা পালক-এর প্রথম সংস্করণের (দ্বিতীয় সংস্করণ আর প্রকাশিত হয়নি) প্রকাশক ছিলেন সুধীরচন্দ্র সরকার। এঁদের দোকান ছিল তখন ৯০/২এ হ্যারিসন রোডে। মনে হয়, প্রকাশক হিসাবে অপরের নাম থাকলেও জীবনানন্দ নিজেই হয়ত টাকা খরচ করে এ বই ছেপেছিলেন। কেন না, এর পরের দু-খানা বই-ই— *ধূসর পাণ্ডুলিপি* ও *বনলতা সেন* (কবিতা ভবন থেকে প্রকাশিত) তিনি নিজেই টাকা খরচ করে ছেপেছিলেন।

ঝরা পালক বই-এর দাম ছিল এক টাকা। এতে কবিতা ছিল মোট ৩৫টি। এর মধ্যে অনেকগুলি কবিতা আগেই বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। জীবনানন্দ তাই এই গ্রন্থের ভূমিকাতেও লিখেছেন, '*ঝরা পালক*-এর কতকগুলি কবিতা *প্রবাসী*, *বঙ্গবাণী*, *কল্লোল*, *কালি-কলম*, *প্রগতি*, *বিজলী* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বাকিগুলি নতুন।'

ঝরা পালক-এর উৎসর্গ পত্রে বড় অক্ষরে শুধু লেখা আছে, 'কল্যাণীয়াসু'।

ঝরা পালক-এর ভূমিকায় জীবনানন্দ যে বলেছেন, *বিজলী* প্রভৃতি পত্রিকায় এই বই এর কোন্ কোন্ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, এর *বিজলী* প্রভৃতির 'প্রভৃতি'র কথা বাদ দিয়েই বলছি— ঐ সময়কার *বিজলী* পত্রিকা কোথাও না পাওয়ায় জানতে পারলাম না, ঝরা পালকের কোন্ কবিতা বা কোন্ কোন্ কবিতা *বিজলী*-তে প্রকাশিত হয়েছিল।

আগে '১৩৩৩-৩৪' সালে প্রকাশিত কবিতা' অধ্যায়ে *কল্লোল*, *বঙ্গবাণী*, *কালি-কলম* প্রভৃতি পত্রিকায় ঐ সময়ে প্রকাশিত কবিতাসমূহের যে তালিকা দিয়েছি, সেই তালিকার বহু কবিতাই *ঝরা পালক* গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছিল।

বাগেরহাট কলেজে ও রামযশ কলেজে

সিটি কলেজ থেকে জীবনানন্দের চাকরি গেলে জীবনানন্দ কলকাতাতেই থেকে যান। কলকাতায় থেকে এখানে ওখানে চাকরির চেষ্টা করতে থাকেন। কিন্তু বছর খানেক কোথাও কোনো চাকরি পেলেন না। নিজের হাত খরচ ও প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এর খরচ চালাবার জন্য এই সময় সামান্য দু-একটা টিউশনি করতেন মাত্র।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে এক সময় জীবনানন্দ খুলনা জেলায় বাগেরহাট কলেজে ইংরাজির অধ্যাপকের একটা কাজ পেলেন। খুব সম্ভব বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করেই তিনি এই কাজটা জোগাড় করেছিলেন। কাজটা টেম্পরারি ছিল কিনা জানি না, তবে জীবনানন্দ এই চাকরি মাত্র মাস তিনেক করেছিলেন। অশোকানন্দ দাশের মতে— বাগেরহাট কলেজে ভাল না লাগায় দাদা ঐ চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন।

এখানের চাকরি গেলে জীবনানন্দ আবার কলকাতার সেই পুরোনো আস্তানা প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এ ফিরে এলেন। এসে আবার সেই চাকরির চেষ্টা এবং কলকাতার খরচ চালাবার জন্য আবার টিউশনি করতে লাগলেন। ঐ সময় অবশ্য জীবনানন্দের বাড়িতে টাকা না দিলেও চলত। কারণ জীবনানন্দের ছোটভাই অশোকানন্দ ঐ সময় চাকরিতে ঢুকেছিলেন। আর জীবনানন্দের পিতা তো মাস্টারি করছিলেনই।

জীবনানন্দ এই সময় মাঝে মাঝে বরিশালের বাড়িতে যেতেন। বাড়ি গিয়ে কিছুদিন করে কাটিয়ে আসতেন। এইভাবে একবার বরিশাল গেলে সেখানে মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্তর ভাইপো সুকুমার দত্তর সঙ্গে দেখা হয়। সুকুমারবাবু দিল্লীতে একটা উচ্চপদে কাজ করতেন। তিনি জীবনানন্দের কাজ নেই শুনে, দিল্লী গিয়ে সেখানে দিল্লীর রামযশ কলেজে জীবনানন্দের একটা অধ্যাপনার চাকরি করে দিয়েছিলেন।

জীবনানন্দ সাধারণত বাংলাদেশ ছেড়ে বাইরে কোথাও কাজ নিয়ে যেতে চাইতেন না। তাই বাধ্য হয়ে একান্ত অনিচ্ছাতেই দিল্লী গিয়েছিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে জীবনানন্দ রামযশ কলেজে যোগ দেন এবং ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত ঐ চাকরি করেন। মে মাসে তিনি দিল্লী থেকে দেশে বিয়ে করতে এসে আর দিল্লী যাননি।

বিয়ে করার পরই কিন্তু জীবনানন্দ বেকার হয়ে পড়েন। হয় তিনি বিয়ের পর আর দিল্লী না গিয়ে ঐ চাকরিটি ছেড়ে দিয়েছিলেন, না হয় তিনি বিয়ে করতে এসে

দেরি করায় তাঁর চাকরিটি চলে যায়। জীবনানন্দের এই চাকরিটি যে একেবারে নিছক টেম্পরারি ছিল না, তা অনুমান করা যেতে পারে। কারণ, যে অধ্যাপনার চাকরি তাঁর দুদিন পরেই নিশ্চিত শেষ হয়ে যাবে, তিনি জানেন; সেই চাকরিতেই নিজেকে বহাল অধ্যাপক পরিচয় দিয়ে জীবনানন্দ বিয়ে করতে গিয়েছিলেন, এ কখনই মনে হয় না। তবে এমন হতে পারে, চাকরিটি হয়ত টেম্পরারিই ছিল কিন্তু পরে তাঁকে ঐ পদে স্থায়ী করা হবে, এমন একটা কথা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। সেই সাহসেই বা বিশ্বাসেই জীবনানন্দ তখন বিয়ে করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কোনো কারণেই হোক, কর্তৃপক্ষ আর জীবনানন্দকে স্থায়ী করেননি।

জীবনানন্দের সিটি কলেজের চাকরি চলে যাওয়া থেকে রামযশ কলেজের চাকরি ছেড়ে দেওয়া পর্যন্ত এই দু বছরে অর্থাৎ ১৩৩৫ ও ৩৬ সালেও তাঁর কবিতা রচনা ও প্রকাশ করায় আদৌ ভাটা পড়েনি। এই সময় কি বেকার অবস্থায় আর কি সাময়িকভাবে অস্থায়ী চাকরি করার অবস্থায় সব সময়েই তিনি সমানে লিখে গেছেন এবং কাগজে প্রকাশও করেছেন। এই ১৩৩৫ ও ৩৬ সালে শুধু *প্রগতি*-তেই প্রকাশিত তাঁর কবিতাগুলির একটা তালিকা নীচে দিলাম :

প্রগতি ১৩৩৫ সাল

মাস	কবিতা
বৈশাখ	১৩৩৩
আষাঢ়	সহজ
ভাদ্র	পরস্পর
অগ্রহায়ণ	জীবন
পৌষ ও মাঘ (একত্রে)	স্বপ্নের হাতে

প্রগতি ১৩৩৬ সাল

মাস	কবিতা
আষাঢ়	পুরোহিত
ভাদ্র	বোধ
আশ্বিন	আজ
কার্তিক	অবসরের গান

জাতীয় গ্রন্থাগারে ১৩৩৫ ও ৩৬ সালের যে *প্রগতি* আছে, তাতে এই দু বছরেরই শ্রাবণ সংখ্যা নেই। বাৎসরিক সূচীপত্রও নেই। তাই বোঝা গেল না, ঐ দু বছরের শ্রাবণ মাসেও জীবনানন্দের কোনো কবিতা বেরিয়েছিল কিনা।

এখানে উল্লেখিত প্রগতিতে প্রকাশিত কবিতাগুলির একমাত্র 'আজ' কবিতাটি বাদে অন্য সবগুলিই জীবনানন্দ তাঁর গ্রন্থভুক্ত করে গেছেন। 'আজ' ৩২০ লাইনের একটি বিরাট কবিতা।

প্রগতি-র এক 'আজ' কবিতাটি সুদীর্ঘ হ'লেও ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা *কালি-কলম*-এ জীবনানন্দ 'আজ' নামে আর একটি সুন্দর ও ছোট্ট প্রেমের কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। সেটিও জীবনানন্দের কোনো গ্রন্থভুক্ত হয়নি।

১৩৩৫ ও ৩৬ সালে প্রগতি এবং *কালি-কলম* ছাড়া অন্যান্য পত্রিকাতেও তাঁর লেখা নিয়মিত প্রকাশিত হ'ত, এমন কি মাসের পর মাসও কবিতা বেরিয়েছে। যেমন— *ধূপছায়া* কাগজে— ১৩৩৫ সালে ভাদ্র মাসে 'প্রেম', আশ্বিন মাসে 'মাঠের গল্প' ও কার্তিক মাসে 'আমরা' প্রকাশিত হয়েছিল। এই ১৩৩৫ সালের কার্তিক মাসেই *কালি-কলম*-এ 'ফসলের দিনে' নামে জীবনানন্দের আরও একটি সুন্দর প্রেমের কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। 'আমরা' এবং 'ফসলের দিনে' এই দুটি দীর্ঘ কবিতাও জীবনানন্দ তাঁর কোনো গ্রন্থভুক্ত করে যাননি।

বিবাহ

জীবনানন্দের বিয়ে হয় ১৩৩৭ সালের বৈশাখ মাসে। তিনি বিয়ে করেছিলেন খুলনা জেলার সেনহাটী গ্রামের রোহিণীকুমার গুপ্তের কন্যা লাবণ্য গুপ্তকে। লাবণ্য দেবী মাত্র আট বছর বয়সেই তাঁর পিতাকে হারান। তাঁর পিতার মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই লাবণ্য দেবী আবার তাঁর মাকেও হারান।

লাবণ্য দেবী এইভাবে অল্প বয়সেই বাবা-মাকে হারিয়ে জ্যাঠামশায় অমৃতলাল গুপ্তের কাছে চলে যান। অমৃতবাবু তখন গিরিডিতে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হিসাবে কাজ করতেন। অমৃতবাবু একজন গোঁড়া ব্রাহ্ম হলেও, লাবণ্য দেবীর বাবা-মা কিন্তু ব্রাহ্ম ছিলেন না। অমৃতবাবু ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর ভাই রোহিণীবাবু ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হননি। তাই জীবনানন্দের বাড়ির বিবাহিতা মহিলারা অনেকেই মাথায় সিঁদুর না পরলেও, লাবণ্য দেবী কিন্তু সধবা অবস্থায় বরাবরই মাথায় সিঁদুর পরতেন।

যাই হোক, লাবণ্য দেবী গিরিডিতে গিয়ে তাঁর জ্যাঠামশায়ের অভিভাবকত্বে থেকে লেখাপড়া করতে লাগলেন।

অমৃতবাবু একে তো ধর্মপ্রচারক মানুষ, তার উপর ছিলেন অকৃতদার। তাই বাড়িতে ভ্রাতুষ্পুত্রীর দেখাশুনার অসুবিধা হবে ভেবে তাঁকে স্থানীয় স্কুলের ছাত্রী-নিবাসে রেখে পড়াতেন। লাবণ্য দেবী গিরিডি উচ্চ ইংরাজী বালিকা বিদ্যালয়ে পড়তেন এবং ঐ স্কুলের মেয়েদের বোর্ডিং-এ থাকতেন। গিরিডির এই স্কুল তখন ছিল পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লাবণ্য দেবী যখন এই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন, তখন তাঁর জ্যাঠামশায় অমৃতবাবু গিরিডি থেকে ঢাকায় ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হিসাবেই বদলি হন। তাই লাবণ্য দেবীও তাঁর জ্যাঠামশায়ের সঙ্গে ঢাকায় এসে ঢাকার ইডেন কলেজে আই. এ. তে ভর্তি হলেন। এই আই. এ. পড়ার সময়েই জীবনানন্দের সঙ্গে লাবণ্য দেবীর বিয়ে হয়েছিল। লাবণ্য দেবী নিজেই তাঁর বিয়ের কথা সম্বন্ধে লিখেছেন :

> পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাস করে আমি তখন সবেমাত্র ঢাকা ইডেন কলেজে ভর্তি হয়েছি। হস্টেলে থাকি। হঠাৎ একদিন সকালে শুনলাম, জ্যাঠামশায় বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছেন। ...বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। জ্যাঠামশায় আমাকে বললেন—'এই যে মা, এস আলাপ করিয়ে দিই। এঁর নাম জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। দিল্লী থেকে এসেছেন।...

> তিনি আমাকে তিনটি প্রশ্ন করলেন 'আপনার নাম কি? আই. এ. তে কি কি সাবজেক্ট নিয়েছেন? এবং কোন্‌টি আপনার বেশি পছন্দ।
> কোনও মতে প্রশ্ন তিনটির উত্তর দিয়ে ভদ্রলোককে কিছু না বলেই উঠে নীচে দৌড় দিলাম।...
> কিছুক্ষণ পরে জ্যাঠামশায় ভদ্রলোকটিকে নিয়ে নীচে নেমে বাইরের দিকে চলে গেলেন।...
> দুপুর বেলায় জ্যাঠামশায় আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ জিগ্যেস করলেন— আচ্ছা, লাবণ্য মা, সকালের ভদ্রলোকটিকে তোমার কেমন লাগল? আমি তখন পাল্টা প্রশ্ন করলাম— উনি এসেছিলেন কেন? উত্তরে জ্যাঠামশায় বললেন— তাহলে বলি শোনো। উনি দিল্লীর রামযশ কলেজের একজন অধ্যাপক। তোমাকে দেখতে এসেছিলেন।...
> তিনি আমাকে অনেক বোঝালেন...উনি তো তোমাকে পড়াতে রাজি আছেন। তাহলে তোমার বিয়েতে আপত্তি করার কি আছে?
> সত্যই তো, বাবা-মা নেই। ...এখন আমার বিয়ে হয়ে গেলেই জ্যাঠামশায় দায়মুক্ত হবেন। অতএব মত আমাকে দিতেই হবে। ...২৬শে বৈশাখ, ৯ই মে শুক্রবার (শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে) বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল।
> লাবণ্য দেবীর ঐ প্রবন্ধ থেকেই আরও জানা যায় যে, লাবণ্য দেবীকে পছন্দ করার আগে, জীবনানন্দ তাঁর মেসোমশায় বরিশালের বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক রসঞ্জন সেনকে নিয়ে বরিশালেই একবার একটি পাত্রী দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে পাত্রীপক্ষ জীবনানন্দকে বিলেতে পাঠাতেও চেয়েছিলেন। জীবনানন্দের মেসোমশায়ের মত থাকলেও জীবনানন্দ সে পাত্রী পছন্দ করেননি।
> লাবণ্য দেবীকে বিয়ে করার সময় জীবনানন্দ যে উদারতা দেখিয়েছিলেন, সে সম্বন্ধেও লাবণ্য দেবী লিখেছেন— 'বিয়েতে একটি মাত্র আংটি ছাড়া— বোতাম, ঘড়ি অথবা আসবাব কিছুই তাঁকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু এই আংটিটার জন্যই তিনি কত লজ্জিত, কত কুণ্ঠিত। যেন মহা অপরাধে অপরাধী। বিয়ের পর বরিশালে গিয়ে তাঁর বড় পিসিমাকে বলেছিলেন— তোমরা যদি বলে দিতে, তাহলে আমি নিজেই একটা আংটি কিনে নিয়ে যেতাম। আমার জন্য লাবণ্যর জ্যাঠামশায়কে শুধু শুধু কতগুলো টাকা খরচ করতে হ'ল।

জীবনানন্দ লাবণ্য দেবীকে দেখতে যাবার আগেও ঢাকায় গেছেন। ১৩৩৫-৩৬ সালে প্রগতিতে যখন জীবনানন্দের কবিতা বেরুচ্ছে সেই সময় একবার তিনি কয়েক দিনের জন্য ঢাকায় বেড়াতে গিয়েছিলেন এবং সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে এসেছিলেন। বুদ্ধদেব বসু এক প্রবন্ধে লিখেছেন :

> মনে পড়ে...কয়েক দিনের জন্য ঢাকায় এলেন একবার। মেঘলা-দিনে মাঠের পথে ঘুরলাম তাঁর সঙ্গে। পরে তাঁর বিবাহের অনুষ্ঠানে ঢাকায় ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত আছি, অজিত, আমি ও অন্যান্য বন্ধুরা।

এখানে দেখা যাচ্ছে, জীবনানন্দ তাঁর বিয়েতে ঢাকার সাহিত্যিক বন্ধুদেরও নিমন্ত্রণ করেছিলেন।

বিয়ের পর থেকে অর্থাৎ ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর জীবনানন্দ বেকার ছিলেন। এই দীর্ঘ বেকার জীবনকালে তিনি মাত্র কিছুদিন একটা ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করেছিলেন। আর একবার তিনি ছোট ভাই অশোকানন্দর কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে একটা ব্যবসা করেছিলেন। কিন্তু এ দুটো কাজেই তাঁর স্বভাবের সঙ্গে খাপ না খাওয়ায়, তিনি অল্প দিন ক'রে চালিয়ে ছেড়ে দিয়েছিলেন।

অশোকানন্দবাবু বলেন— 'দাদা বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করার কিছুদিন পরে ব্যবসা তুলে দিয়ে আমার কাছ থেকে নেওয়া টাকাটা আমাকে ফেরৎ দেবার সময় বলেছিলেন— 'সামান্য লাভ করতে পেরেছি।' জীবনানন্দ ঐ সময় চাকরির সন্ধানে প্রায়ই বরিশাল থেকে কলকাতায় চলে আসতেন। চাকরি না পেয়ে তিনি টিউশনি করে যা কিছু উপায় করতেন।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে জীবনানন্দের কন্যা মঞ্জুশ্রীর জন্ম হয়।

অনেক দিন বেকার থাকার পর ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জীবনানন্দ বরিশালেই বি. এম. কলেজে ইংরাজির অধ্যাপকের একটা কাজ পেলেন।

বি. এম. কলেজে

জীবনানন্দ বরিশালের বি. এম. কলেজে অধ্যাপকের কাজ পেয়ে তখন অর্থের দিক দিয়ে নিশ্চিত হতে পেরেছিলেন।

এই কলেজে জীবনানন্দের এক ছাত্র আবুল কালাম শামসুদ্দীন তখনকার জীবনানন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন :

> তাঁকে প্রথম দেখি যখন আমরা আই. এ. ক্লাসের ছাত্র। বরিশালের ব্রজমোহন কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন তিনি। শ্যাম রঙের স্বাস্থ্যবান পুরুষ। চল্লিশোত্তর বয়স তখন। পরনে ধুতি, পাঞ্জাবী, পাম্প-সু। কাঁধে পাট করে রাখা চাদর, হাতে একটি কি দুটি বই। মুখ তাঁর সর্বদা ভারী গম্ভীর ; চোখে আশ্চর্য চাঞ্চল্য ও তীক্ষ্ণতা। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতেন।...
>
> শিক্ষকতায় তিনি সর্বজন-প্রিয় হতে পারেননি। এ অতৃপ্তি তাঁর মনে অবশ্য ছিল। তাঁর কবিতা অন্যান্য অধ্যাপক মহলে উপহাসের খোরাক জুগিয়েছে দেখেছি।
>
> বি. এম. কলেজে জীবনানন্দ কেন সর্বজন-প্রিয় অধ্যাপক হ'তে পারেননি, এ সম্বন্ধে বি. এম. কলেজে জীবনানন্দের এক সহকর্মী অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে হেরম্ববাবু বলেছিলেন— কলেজে দেখেছি, আই. এ. ও বি. এ. ক্লাসের যে বইগুলো অত্যন্ত নিরস ও কঠিন, যে বই পড়ে ছাত্ররা কোনওরূপ আনন্দ পাবে না, সেই সব বই-ই বেছে বেছে জীবনানন্দবাবুকে পড়াতে দেওয়া হ'ত। অন্য সহজ ও সরস বইগুলো তাঁর বিভাগের অন্য অধ্যাপকরা পড়াতেন। ঐ রকম একটা বইও তাঁকে পড়াবার জন্য দেওয়া হ'ত না।
>
> জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে বি. এম. কলেজের অধ্যাপকরা উপহাস করতেন কি না, জিজ্ঞাসা করায় হেরম্ববাবু বলেছিলেন— উপহাস খুবই করতেন এবং আমিও সে দলের একজন ছিলাম।

জীবনানন্দকে একে তো ক্লাসে নীরস ও কঠিন বিষয় পড়াতে দেওয়া হ'ত। তার উপর কলেজে তাঁর সহকর্মী অধ্যাপকদেরও অনেকেই তাঁর কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ শুধু মুখেই নয়। ব্যঙ্গ কবিতা লিখে এবং তা কাগজে প্রকাশ করেও তাঁকে আক্রমণ করতেন।

বাইরে শনিবারের চিঠির তীব্র আক্রমণ ও গালি-গালাজ, আবার কলেজেও সহকর্মীদের এইরূপ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও আক্রমণ।

এমন অবস্থায় কবি ও ভাবুক মানুষের পক্ষে মানসিক অবস্থা স্থির রেখে চলাই কষ্টকর ব্যাপার হয়ে পড়ে। তবে জীবনানন্দ অত্যন্ত স্থির ও সহিষ্ণু প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বলেই এ সব সহ্য করে চলতে পারতেন।

জীবনানন্দ তাঁর কবিতার সমালোচনায় খুবই আঘাত পেতেন। তবু সহকর্মীরা বিদ্রূপকারী হলেও, যেহেতু এঁদের সঙ্গে একত্রেই কাজ করতে হবে, তাই তিনি সব সময়েই এঁদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপকে, তাঁর স্বভাব সুলভ হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিতেন। আর কলেজে এঁদের সঙ্গে মেলামেশা, যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলতেন।

বি. এম. কলেজে জীবনানন্দের অধ্যাপক জীবনের কথা বলতে গিয়ে পূর্বোক্ত হেরম্ব চক্রবর্তী তাঁর 'জীবনানন্দকে যেমন দেখেছি' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> আজ মনে পড়ে যে 'নীল জলে সিঙি মাছ' নামে এক ব্যঙ্গ কবিতা প্রকাশ করে তাঁকে আক্রমণ করেছিলাম। প্রথমে তাঁর চোখে ফুটে উঠল একটা সলজ্জ, অপ্রতিভ কাতর ভঙ্গি। তার পর মুহূর্তেই উৎকট হাস্যের একটা দমকা এসে উড়িয়ে নিয়ে গেল বিদ্রূপের ধূম্ররাশি। সেই বিদ্রূপযজ্ঞের হোতা ছিলেন অধ্যাপক নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ...জীবনানন্দবাবু তাঁর কবিত্বের বিরূপ সমালোচনায় বড় ব্যথিত হতেন। বেত্রাহত বালকের মুখে যে করুণ অসহায়তা, তাই দিয়েই তিনি বিরুদ্ধবাদীকে নিরস্ত করতেন। শনিবারের চিঠির গাল খেয়ে তিনি রুষ্ট হতেন কিনা জানি না। কিন্তু কৌতূহলী হয়ে উঠতেন খুব। পত্রিকাখানি এসেছে শুনলে আমার কাছে আসতেন, বন্ধনীর মধ্যে 'জীবানন্দ নহে' পড়তেন। তারপর অনন্যসুলভ সেই উপহাসটি উপহার দিয়ে নীরবে উঠে যেতেন। তাঁর কবিত্বের স্বপ্নাবরণ যেন কিছুতেই ছিন্ন হ'ত না।

হেরম্ববাবু আরও লিখেছেন :

> মাঠের পাশের বাঁকা পথ ধরে কলেজের পিছন দিক দিয়ে কলেজে যেতেন, ক্লাসে শান্ত, গম্ভীর ভঙ্গিতে পড়াতেন ; অবসরকালে কষ্টি পাথরের মূর্তিটির মতো বিশ্রামকক্ষের কোণে বসে থাকতেন।

যাই হোক, জীবনানন্দ বরিশাল কলেজে অধ্যাপক হিসাবে 'সর্বজনপ্রিয়' হতে না পারলেও, তিনি নিজে তখন কিরূপ অধ্যয়ন করতেন, আর বাইরে অমিশুক, অসামাজিক বলে তাঁকে মনে হলেও, তিনি যে কত সহজ, সরল ও মিশুক প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, তাঁর পরিচয় পাই জীবনানন্দের ছাত্র ঐ শামসুদ্দীন সাহেবের লেখা থেকেই। শামসুদ্দীন সাহেব লিখেছেন :

> বাড়ি তাঁর (জীবনানন্দের) একটা মেয়ে স্কুলের কম্‌পাউন্ডের মধ্যে। খুব সম্ভবত সে স্কুলটা তাঁর পিতার প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলো ধরনের বাড়ি, উপরে শণের চাল। বেড়া

> অর্ধেক ইট আর অর্ধেক বাঁশের। কিন্তু ভিতরে সাহিত্য পাঠকের কাছে আশ্চর্য এক জগৎ— বই, বই আর বই। বাংলার, বাংলার বাইরের অসংখ্য পত্রিকা। সবই সযত্নে গুছিয়ে রাখা— দেখেই মনে হয় বার বার পড়া। একধারে একটা ছোট টেবিল। হয়তো তাঁর লেখার।
>
> ...সেদিন তাঁর বাড়িতে না গেলে জীবনানন্দবাবু 'অসামাজিক মানুষ' এই ধারণা করেই চিরদিন দূরে থেকে যেতাম। সে ধারণা অচিরেই ভেঙে গেল। অমন রাসভারী চেহারার ভিতরে একটা সহজ সরল শিশুর মন খুঁজে পেয়ে আমরা চমৎকৃত হয়ে গেলুম।

শামসুদ্দীন সাহেব যখন কলেজের ছাত্র তখন থেকেই তিনি সাহিত্য রচনায় হাত দেন। তাঁর নিজের কথায় 'আমরা তখন লেখায় মত্ত করছি। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ কত কী?

ছাত্রজীবন থেকে শামসুদ্দীন সাহেবের সাহিত্য চর্চায় নেশা ছিল বলে, ঐ সময় তিনি তাঁর বাড়িতে মাঝে মাঝে একটা করে সাহিত্যের সভা বা আড্ডা বসাতেন। জীবনানন্দ শামসুদ্দীন সাহেবের আমন্ত্রণে তাঁদের সেই আড্ডাতেও যেতেন। এ সম্বন্ধে শামসুদ্দীন সাহেব লিখেছেন :

> আমাদের ছোট টিনের ঘরে দোতলায় তাঁকে সাহিত্যের আড্ডাতেও পেয়েছি। একদিন সেই আড্ডায় অচিন্ত্যকুমারকে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন বলে মনে হয়।

শামসুদ্দীন সাহেব বলেছেন— জীবনানন্দের বাড়ি ছিল সম্ভবত জীবনানন্দের পিতার প্রতিষ্ঠিত একটা মেয়ে স্কুলের কম্পাউন্ডের মধ্যে।

মেয়ে স্কুলের কম্পাউন্ডের মধ্যে নয়, জীবনানন্দদের বাড়িরই কম্পাউন্ডের মধ্যে একটি মেয়েদের স্কুল ছিল সত্য। তবে সে স্কুল ছিল অল্প কিছুদিনের জন্য এবং ছোট ছোট মেয়েদের স্কুল। সে স্কুলটা করেছিলেন জীবনানন্দের এক পিসিমা। স্কুল করার ব্যাপারে অবশ্য জীবনানন্দের পিতারও সাহায্য ছিল।

জীবনানন্দের ঐ পিসিমা ছিলেন চিরকুমারী। তিনি স্থানীয় মেয়েদের এক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তিনি তাঁর শিক্ষকতার কাজ থেকে অবসর নিয়ে শেষ বয়সে কিছুদিনের জন্য বাড়িতে ছোট ছোট মেয়েদের একটা স্কুল করেছিলেন।

জীবনানন্দ বি. এম. কলেজে ছিলেন ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এই সময় এক তো কলেজে চাকরি পাওয়ার জন্য তাঁর আর্থিক সচ্ছলতা হয়েছিল, দ্বিতীয়ত, নিজের বাড়িতে সপরিবারে থাকার জন্য তাঁর একটা মানসিক শান্তিও ছিল। এর সময়েই ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তাঁর একমাত্র পুত্র সমরানন্দেরও জন্ম হয়েছিল। তাই বাইরের লোকে তাঁর কবিতা নিয়ে যে যত বিদ্রূপই করুক না কেন, তিনি তাঁর বি. এম. কলেজে অধ্যাপক জীবনে প্রচুর কবিতা লিখেছেন এবং বহু পত্রিকায় অসংখ্য কবিতাও প্রকাশ করেছেন।

জীবনানন্দ যে বছর বি. এম. কলেজে অধ্যাপকের চাকরি পান, সেই বছরেই ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে (১৩৪২ সালের আশ্বিন মাসে) বুদ্ধদেব বসু তাঁর ত্রৈমাসিক *কবিতা* পত্রিকাটিও বার করেন। জীবনানন্দ একমাত্র এই *কবিতা* পত্রিকাতেই তখন কিভাবে তাঁর কবিতা প্রকাশ করেছিলেন, এখানে মাত্র প্রথম দু-বছরের *কবিতা* থেকে তার একটা হিসাব দিলাম।

১৩৪২ সাল ১ম বর্ষ

১ম সংখ্যা,	আশ্বিন	মৃত্যুর আগে
২য় সংখ্যা,	পৌষ	বনলতা সেন, কুড়ি বছর পরে, মৃত মাংস, ঘাস
৩য় সংখ্যা,	চৈত্র	হাওয়ার রাত, আমি যদি হতাম, হায় চিল
৪র্থ সংখ্যা,	আষাঢ়	শঙ্খমালা, বুনোহাঁস

১৩৪৩ সাল ২য় বর্ষ

১ম সংখ্যা,	আশ্বিন	নগ্ন নির্জন হাত, শিকার, বলিল অশ্বত্থ নেই, নদী, হাজার বছর শুধু খেলা করে
২য় সংখ্যা,	পৌষ	সিন্ধু সারস, রাত্রি মাখা ঘাসে (পরে পরিবর্তিত নাম নিরালোক), স্বপ্ন, হরিণেরা
৩য় সংখ্যা,	চৈত্র	শ্রাবণ রাত, বিড়াল
৪র্থ সংখ্যা,	আষাঢ়	আদিম দেবতারা, মুহূর্ত

এখানে দেখা যাচ্ছে, তিনি কোনো সংখ্যায় চারটা পাঁচটা পর্যন্তও কবিতা প্রকাশ করেছেন। এই তালিকার কবিতাগুলির মধ্যে কোনো কোনোটি অবশ্য ১৩৪২ সালের (১৯৩৫ খ্রীঃ) আগেরও লেখা ছিল। যাই হোক, জীবনানন্দ, এই বি. এম. কলেজে থাকাকালে দীর্ঘদিন এইভাবে কম-বেশি হিসাবে বহু কবিতাই ঐ পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য পত্রিকায় তো তিনি লিখতেনই।

সিটি কলেজে অধ্যাপনাকালে জীবনানন্দ যেমন তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ *ঝরা পালক* প্রকাশ করেছিলেন, তেমনি এই বি. এম. কলেজে অধ্যাপনাকালেই তিনি তাঁর দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* এবং তৃতীয়-কাব্যগ্রন্থ *বনলতা সেন* প্রকাশ করেছিলেন।

ধূসর পাণ্ডুলিপি

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র প্রকাশক ছিলেন জীবনানন্দ নিজে, অর্থাৎ তিনি নিজেই টাকা খরচ করে এ বই ছেপেছিলেন। জীবনানন্দ এই সময় বরিশালে ছিলেন বলে, বইয়ের প্রাপ্তিস্থান হিসাবে কলকাতার এক বইয়ের দোকানের ঠিকানা বইয়ে দেওয়া ছিল।

ধূসর পাণ্ডুলিপি ছাপা হয়েছিল কলকাতায়। এর প্রুফ দেখা ইত্যাদি করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেববাবু তখন কলকাতায় থেকে কলকাতার এক কলেজে অধ্যাপনা করছিলেন।

ধূসর পাণ্ডুলিপির প্রথম সংস্করণের টাইটেল পৃষ্ঠার লেখা থেকে জানা যায়, এই বই বেরিয়েছিল— ১৩৪৩-এর অগ্রহায়ণে বা ১৯৩৬-এর ডিসেম্বরে। ধূসর পাণ্ডুলিপিতে ১৭টি কবিতা ছিল। এই ১৭টির অধিকাংশই বুদ্ধদেব বসু ও অজিত দত্ত সম্পাদিত *প্রগতি* পত্রিকায় আগে প্রকাশিত হয়েছিল।

বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন :

> ধূসর পাণ্ডুলিপির ১৭টি কবিতার 'পাখিরা' কল্লোলে, 'ক্যাম্পে' পরিচয়ে, 'মৃত্যুর আগে' কবিতায়, আর কোনো কোনোটি ধূপছায়ায় বেরিয়েছিল। কিন্তু অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশ প্রগতিতে। তার উপর যখন বই ছাপা হলো তখন ধাত্রীর কাজও আমি করেছিলাম। তাই ঐ গ্রন্থটিকে আমার নিজের জীবনের একটি অংশ বলে মনে হয় আমার।

বুদ্ধদেব বসুর এই উপকারের জন্য জীবনানন্দ তাঁর *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থখানি বুদ্ধদেব বসুকে উৎসর্গ করে তাঁর নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। জীবনানন্দ যে কিরূপ সরল, অকপট ও কৃতজ্ঞ মানুষ ছিলেন, এ থেকেও তাঁর সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

জীবনানন্দ তাঁর *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র একটা ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। সেই ভূমিকাটি এই :

> ভূমিকা
>
> আমার প্রথম কবিতার বই প্রকাশিত হয়েছিল— ১৩৩৪ সালে। কিন্তু সে বইখানা অনেকদিন আমার নিজের চোখের আড়ালে হারিয়ে গেছে। আমার মনে হয় সে তার প্রাপ্য মূল্যই পেয়েছে।

> ১৩৩৬ সালে আর একখানা কবিতার বই বার করবার আকাঙক্ষা হয়েছিল। কিন্তু নিজ মনে কবিতা লিখে এবং কয়েকটি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত ক'রে সে ইচ্ছাকে আমি শিশুর মতো ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলাম। শিশুকে অসময়ে এবং বার বার ঘুম পাড়িয়ে রাখতে জননীর যে-রকম কষ্ট হয়, সেই রকম কেমন একটা উদ্বেগ— খুব স্পষ্টও নয়, খুব নিরুত্তেজও নয়— এই ক'বছর ধ'রে বোধ ক'রে এসেছি আমি।
>
> আজ ন'বছর পর আমার দ্বিতীয় কবিতার বই বার হ'ল। এর নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' এর পরিচয় দিচ্ছে। এই বইয়ের সব কবিতাই' ১৩৩২ থেকে ১৩৩৬ সালের মধ্যে রচিত হয়েছে। ১৩৩২ সালে লেখা কবিতা, ১৩৩৬ সালে লেখা কবিতা— প্রায় এগারো বছর আগের, প্রায় সাত বছর আগের রচনা সব আজ ১৩৪৩ সালে এই বইয়ের ভিতর ধরা দিল। আজ সে সব মাসিক পত্রিকা আর নেই— প্রগতি, ধূপছায়া, কল্লোল— এই বইয়ের প্রায় সমস্ত কবিতাই সেই সব মাসিকে প্রকাশিত হয়েছিল একদিন।
>
> সেই সময়কার অনেক অপ্রকাশিত কবিতাও আমার কাছে রয়েছে— যদিও ধূসর পাণ্ডুলিপির অনেক কবিতার চেয়েই তাদের দাবি একটুও কম নয়— তবুও সম্প্রতি আমার কাছে তারা ধূসরতর হ'য়ে বেঁচে রইল।
>
> আশ্বিন ১৩৪৩ জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দের জীবিতকালে *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র আর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়নি। ১৩৬৩ সালের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর দু বছর কয়েক মাস পরে সিগনেট প্রেস থেকে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই সংস্করণে ১ম সংস্করণের ১৭টি কবিতার সঙ্গে আরও ১৫টি অপ্রকাশিত কবিতা যোগ করা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা লিখেছেন অশোকানন্দ দাশ। তিনি তাঁর দাদার ঐ ১৫টি অপ্রকাশিত কবিতা যোগ করতে গিয়ে ভূমিকায় লিখেছেন :

> 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৩ সালের আশ্বিনে'।[১] আজ প্রায় কুড়ি বছর পরে তার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে সিগনেট সংস্করণ হিসেবে। এবারে বইখানির কলেবর আগের চাইতে বর্ধিত হচ্ছে, ...এই অপ্রকাশিত কবিতাগুলি সংযোজনের ব্যাপারে ঈষৎ সংকোচ বোধ হচ্ছে। কেন না, প্রকাশ করার পূর্বে প্রত্যেকটি কবিতাকে পরিমার্জিত করার অভ্যাস কবির ছিল। ...তাই সংযোজিত কবিতাগুচ্ছ যে স্রষ্টার প্রখর অভিভাবকত্ব লাভের সৌভাগ্য থেকে একেবারেই বঞ্চিত, সহৃদয় পাঠককে, এই কথাটি স্মরণে রাখতে অনুরোধ করি।

১ম সংস্করণের সঙ্গে এই ১৫টি অপ্রকাশিত কবিতা যোগ করে যে *ধূসর পাণ্ডুলিপি* সেই বই-ই বর্তমানে প্রচলিত।

বনলতা সেন ও মহাপৃথিবী

জীবনানন্দের তৃতীয় কাব্য-গ্রন্থ *বনলতা সেন*। এ বইটি বেরোয় ১৩৪৯ সালের পৌষ (১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর) মাসে। ডিমাই আকারে মাত্র ষোলো পাতার বই এটি। এ বইয়েরও প্রকাশক ছিলেন জীবনানন্দ নিজেই। বইয়ে লেখা ছিল, প্রকাশক— জীবনানন্দ দাশ, বরিশাল। তবে বইয়ের প্রাপ্তিস্থান ছিল— কবিতা ভবন, ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা।

এই ২০২ রাসবিহারী এভিনিউ-য়ে বুদ্ধদেব বসু তখন থাকতেন এবং এখান থেকেই তাঁর *কবিতা* পত্রিকাও প্রকাশিত হ'ত। বুদ্ধদেববাবু তাঁর এখানকার 'কবিতা ভবন' থেকে তখন 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালা বার করতেন। বুদ্ধদেববাবুর এই 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালারই অন্যতম বই হয়ে বেরিয়েছিল— *বনলতা সেন*।

এই ষোলো পাতার বইয়ের দাম ছিল তখনকার ষোলো পয়সা বা চার আনা। এই বইয়ে কবিতা ছিল মোট ১২টি। কবিতাগুলির নাম এই :

> বনলতা সেন, কুড়ি বছর পরে, ঘাস, হাওয়ার রাত, আমি যদি হতাম, হায় চিল, বুনো হাঁস, শঙ্খমালা, নগ্ন নির্জন হাত, শিকার, হরিণেরা, বিড়াল

বুদ্ধদেব বসু তাঁর এক প্রবন্ধে এই বইটির কথা লিখতে গিয়ে বলেছেন— 'যদিও চার আনা দামের চটি বই এবং এগারোটি মাত্র কবিতা আছে, তবু এটি আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। (*কালের পুতুল*)

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যও তাঁর *কবি জীবনানন্দ দাশ* গ্রন্থে লিখেছেন :

> জীবনানন্দের ষোলোটা কবিতা নিয়ে— এক পয়সায় একটি সিরিজের পুস্তিকা বেরোয় বনলতা সেন নামে বুদ্ধদেব বসুর কবিতা ভবন থেকে।

দেখা যাচ্ছে, *বনলতা সেন* গ্রন্থে কবিতার সংখ্যার কথা বলতে গিয়ে, এঁরা উভয়েই ভুল করেছেন।

জীবনানন্দ তাঁর *বনলতা সেন* কবিতাটির নাম নিয়েই বইটির নামকরণ করেছিলেন— *বনলতা সেন*। 'বনলতা সেন' তাঁর একটি অতি বিখ্যাত কবিতা। এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়— *কবিতা* পত্রিকার ১ম বর্ষের ২য় সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩৪২ সালের পৌষ মাসে। কবিতাটি এখানে দিলাম :

বনলতা সেন

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে— সব নদী— ফুরায় এ-জীবনের সব লেন-দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

কবিতা ভবন থেকে প্রকাশিত *বনলতা সেন* গ্রন্থের ১২টি কবিতাই 'কবিতা' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। জীবনানন্দ তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় কাব্য-গ্রন্থ কা'কেও কা'কেও উৎসর্গ করলেও এই বইটি কিন্তু কা'কেও উৎসর্গ করেননি।

এই *বনলতা সেন* বইটি অত্যন্ত চটি ছিল বলেই হয়ত পরে এই বইটির উপর জীবনানন্দের আকর্ষণ কমে যায়। তাই তিনি এই বইয়ের সব ক'টি কবিতার সঙ্গে আরও ২৩টি নতুন কবিতা দিয়ে অর্থাৎ মোট ৩৫টি কবিতা একত্র করে, আর একটি বই করলেন এবং সে বইয়ের নাম দিলেন, *মহাপৃথিবী*।

মহাপৃথিবী বেরোয় ১৩৫১ সালে কলকাতায় পি ১৩ গণেশচন্দ্র এভিনিউয়ে অবস্থিত 'পূর্বাশা লিমিটেড' থেকে। এ বইয়ের মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বন্ধু সত্যপ্রসন্ন দত্ত। এ বইয়ের দাম ছিল— দেড় টাকা এবং এর পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল— রয়্যাল ৮ পেজি ৮+৪০। বইয়ের উৎসর্গ পত্রে লেখা ছিল— 'প্রেমেন্দ্র মিত্র, সঞ্জয় ভট্টাচার্য প্রিয়বরেষু'।

'কবিতা ভবন' থেকে প্রকাশিত *বনলতা সেন*-র ১২টি কবিতা, *মহাপৃথিবী*-র

অন্য দুটি কবিতা এবং আরও ১৬টি নতুন কবিতা একত্র করে— জীবনানন্দ পরে আর একটি বই করলেন এবং তার নাম দিলেন, *বনলতা সেন*। এই বইয়ের কবিতাগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে জীবনানন্দ বইয়ের প্রথমেই লিখেছেন— ১৩৩২-১৩৪৬। এই বইটি সিগনেট সংস্করণ *বনলতা সেন* হিসাবে ১৩৫৯ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত হয়। এ বইয়ের প্রকাশক ছিলেন সিগনেট প্রেসের দিলীপকুমার গুপ্ত। খুব সম্ভব প্রকাশকের আগ্রহেই জীবনানন্দ তখন এ বইটি করেছিলেন। বর্তমানে জীবনানন্দের *বনলতা সেন* নামে যে গ্রন্থ প্রচলিত, সে এই বইটিই।

মহাপৃথিবী থেকে ১৪টি কবিতা সরিয়ে নেওয়ায় বইটি আয়তনে ক্ষীণ হয়ে যায়। জীবনানন্দও আর এই বই পুনঃ প্রকাশে আগ্রহ দেখাননি। তাই তাঁর জীবিত কালে এ বইয়ের আর কোনো সংস্করণ, এমন কি এতে অন্য নতুন কবিতা দিয়ে এর কলেবর বৃদ্ধি ক'রে প্রকাশেরও চেষ্টা হয়নি।

জীবনানন্দের মৃত্যুর প্রায় ১৫ বছর পরে এতে আরো কিছু নতুন কবিতা যোগ করে সিগনেট প্রেস থেকে সিগনেট সংস্করণ *মহাপৃথিবী* হিসাবে প্রথম বেরোয় ১৩৫১ সালের বৈশাখ মাসে। এই নতুন সংযোজিত কবিতাগুলি ১৩৪২ সাল থেকে ১৩৫১ সালের মধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই সিগনেট সংস্করণ *মহাপৃথিবী* সম্পাদনা করতে গিয়ে এর সম্পাদক মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সম্পাদকের নিবেদন'এ বলেছেন :

> আমরা ১৩৪২ থেকে ১৩৫১ বঙ্গাব্দের মধ্যে (স্মরণীয় : মহাপৃথিবীর প্রকাশ কাল ১৩৫১) প্রকাশিত কবিতা থেকে অন্তত কিছু কবিতা সংগ্রহ করার চেষ্টা করি। এর পিছনে আমাদের বিনীত অভিপ্রায় ছিল এই যে, মহাপৃথিবী থেকে যে ১৪টি কবিতা অন্যত্র সরানো হয়েছে, অন্তত সেই সংখ্যক নতুন কবিতা যোগ করে তাকে প্রায় একটি পূর্ববৎ আকার দেয়া।...
>
> যাতে এই নতুন গ্রথিত কবিতাগুলো আলাদা করে শনাক্ত করা যায়, সেই জন্যই 'আমিষাশী তরবার' নাম দিয়ে তাদের পৃথক করা হ'ল।

এই সিগনেট সংস্করণ মহাপৃথিবী গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে দেখছি, লেখা আছে— শ্রীমতী মঞ্জুশ্রীকে : বাবার আশীর্বাদ। অথচ মূল *মহাপৃথিবী* গ্রন্থ জীবনানন্দ উৎসর্গ করেছিলেন— প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে। পূর্বাশা লিমিটেড থেকে প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী' এবং সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত *মহাপৃথিবী*— দুটো পৃথক বই ভেবেই কি জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে কেউ এইভাবে উৎসর্গের বদল করেছেন। তাই যদি হয়, তাহলে *ধূসর পাণ্ডুলিপি* ১ম সংস্করণ এবং *ধূসর পাণ্ডুলিপি* সিগনেট সংস্করণ— এ দুটোও তো পৃথক বই। অথচ এ বই ১ম সংস্করণে যাঁকে উৎসর্গ করা ছিল, পরবর্তী সংস্করণেও তাঁকেই— অর্থাৎ বুদ্ধদেব বসুকে— উৎসর্গ করা আছে। কোনও বদল হয়নি।

কলকাতায় আগমন ও চাকরির সন্ধানে

বরিশালে নিজের বাড়িতে সুন্দর ও আনন্দময় পরিবেশে বাস ক'রে স্থানীয় কলেজে অধ্যাপনা করতে থাকলেও, কলকাতায় চলে আসবার জন্য একটা বাসনা জীবনানন্দের মনে অনেক দিন থেকেই ছিল।

কারণ, বিভিন্ন সাময়িক পত্র, সংবাদপত্র ও পুস্তকাদির প্রকাশ ও বড় বাজার বলতে যা বুঝায় তা এই কলকাতাতেই। আর *কবিতা, চতুরঙ্গ, পূর্বাশা, দেশ* প্রভৃতি যে সব পত্রিকায় তিনি দীর্ঘ দিন ধরে কবিতা লিখে আসছিলেন, সেগুলিরও প্রকাশ স্থান এই কলকাতাতেই। তাঁর বহু সাহিত্যিক বন্ধুরও বাড়ি কলকাতায়। তাই দূর মফঃস্বল বরিশাল থেকে রাজধানী কলকাতায় চলে এলে, কবিতা ও কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে আরও সুবিধা হবে, এই ভেবেই তিনি কলকাতায় চলে আসতে চাইতেন।

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে কলেজে গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি একবার কলকাতায় এসে ছোটভাই অশোকানন্দের বাসায় ছিলেন। কলকাতা থেকে ফিরে গিয়ে তিনি তখন অশোকানন্দবাবুর স্ত্রী নলিনী দেবীকে যে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠি থেকেও তাঁর কলকাতায় চলে আসবার একটা প্রবল ইচ্ছার কথা জানা যায়। তিনি লিখেছিলেন :

> ..কলকাতায় গিয়ে এবার নানা রকম অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল ; সাহিত্যিক, ব্যবসায়িক ইত্যাদি নানারূপ নতুন সম্ভাবনার ইশারা পাওয়া গেল। বরাবরই আমার আত্মবৃত্তি জীবিকা নিয়ে কলকাতায় থাকবার ইচ্ছা। এবার সে ইচ্ছা আরও জোর পেয়েছে।

কিন্তু কলকাতায় থাকবার ইচ্ছা প্রবল হলেও, কলকাতায় একটা ভাল মতো চাকরি না পেলে তো আর আসতে পারেন না। কারণ, কিছুদিন পূর্বে পিতার মৃত্যু হলেও,[১] মা, কন্যা, পুত্র ও স্ত্রীকে নিয়ে জীবনানন্দের সংসার তখন নিতান্ত ছোটও নয়। তাই কলকাতায় চলে আসার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও জীবনানন্দকে বাধ্য হয়ে বরিশালেই থাকতে হয়েছিল।

কলকাতায় যে আর্থিক অনিশ্চয়তার জন্য জীবনানন্দ এতদিন বরিশাল ত্যাগ করতে সাহসী হচ্ছিলেন না, ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট দেশ বিভাগ স্থির হওয়ায়, সেই আর্থিক অনিশ্চয়তাকে মেনে নিয়েই, তিনি দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে সপরিবারে বরিশাল ত্যাগ করে কলকাতায় চলে এলেন। কলকাতায় এসে তিনি সপরিবারে ১৮৩ নং ল্যান্সডাউন রোডে (বর্তমান নাম শরৎ বসু রোড) ছোট

ভাই অশোকানন্দের বাসাতেই বাস করতে লাগলেন।

জীবনানন্দ বরিশাল থেকে চলে আসবার সময় কলেজের চাকরিতে কিন্তু একেবারে ইস্তফা দিয়ে আসেননি। কলকাতায় কাজ-কর্ম কিছু একটা জোগাড় করতে না পারলে, আবার এই কলেজেই ফিরে আসবেন, এইরূপ স্থির করেছিলেন। কারণ, তিনি দেখেছিলেন, দেশ বিভাগের অব্যবহিত পূর্বে তাঁর মতো কিছু লোক পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করলেও, তখন পূর্ববঙ্গের অধিকাংশ হিন্দুই সেখানে বাস করছিলেন।

কলেজে ছুটি নিয়ে এলেও জীবনানন্দ কিন্তু আর কোনো দিনই সে কলেজে ফিরে যাননি। কারণ, দেশ-বিভাগের অব্যবহিত পর থেকেই যে হারে হিন্দুরা দলে দলে পূর্ব-পাকিস্তান ত্যাগ করতে লাগল, তাতে তিনি চিরকালের জন্যই তাঁর সাধের বরিশাল যাওয়ার আশা ত্যাগ করলেন। এরপর যতদিন বেঁচেছিলেন, আর কোনো দিনই তিনি বরিশালে যাননি।

জীবনানন্দ কলকাতায় এসেই এখানকার পুরাতন বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিতদের সঙ্গে যোগযোগ করে আগে একটা চাকরি জোগাড় করার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই ভাবে একদিকে যেমন বন্ধুদের দ্বারস্থ হতে লাগলেন, অপর দিকে তেমনি খবরের কাগজে চাকরি খালির বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্তও করতে লাগলেন।

কয়েক মাস কেটে গেল, জীবনানন্দ কোথাও কোনো কাজের সন্ধান করতে পারলেন না। তখন তিনি বেশ একটু হতাশ হয়ে পড়লেন।

এই সময় কলকাতার ক্রীক রো থেকে *স্বরাজ* নামে একটা নতুন দৈনিক পত্রিকা বেরোবার ঠিক হয়। এই *স্বরাজ* পত্রিকায় মালিকদের সঙ্গে *পূর্বাশা* সম্পাদক কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের বিশেষ পরিচয় ছিল। তাই তিনি তাঁদের ব'লে ঐ কাগজ বেরুলে তাতে জীবনানন্দের একটা চাকরি করে দেন।

স্বরাজ-এর কর্তৃপক্ষ জীবনানন্দকে ঐ পত্রিকার রবিবারের সাহিত্য বিভাগটি সম্পাদনার ভার দিয়েছিলেন। এই চাকরিতে জীবনানন্দের বেতন ছিল খবু সামান্যই। তাও এ চাকরিও তাঁর বেশি দিন টিকল না। কারণ, কয়েক মাস পরেই *স্বরাজ* বন্ধ হয়ে যাওয়ায়, জীবনানন্দের ঐ চাকরিটিও চলে গেল।

স্বরাজ-এর কাজ চলে গেলে জীবনানন্দ তখন একবার কয়েকজনে মিলে একটা মাসিক পত্রিকা বার করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। ঐ কয়েকজনের মধ্যে তাঁর বরিশালের ছাত্র আবুল কালাম শামসুদ্দীনও একজন ছিলেন। এ সম্বন্ধে শামসুদ্দীন সাহেব লিখেছেন :

> স্বরাজ বন্ধ হয়ে যাবার পর একটা মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করেছিলাম, তিনি, আমি ও নির্মল চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু বিজ্ঞাপন সংগ্রহে তিন জনই অপটু ছিলাম বলে শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলালো না।
>
> স্বরাজের চাকরি চলে যাবার পর কত চেষ্টা করেও দীর্ঘ দু'বছর আড়াই বছর

আর কোথাও কোনও কাজ পেলেন না। বরিশাল বি. এম. কলেজে যে নরেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন, সেই নরেন্দ্রবাবু কলকাতার উপকণ্ঠে দমদম মতিঝিল কলেজে অধ্যক্ষ হয়ে এসেছেন শুনে সেখানেও একটা প্রফেসারীর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু বৃথাই।

জীবনানন্দ তখন কলকাতা বা কলকাতার আশপাশেই শুধু নয়, কলকাতা থেকে দূরেও চাকরি পাওয়ার জন্য বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্ত করেছেন। এবং সেখানেও পরিচিত কেউ থাকলে, চাকরিটা ক'রে দেবার জন্য তাঁর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন। কোনো বিজ্ঞাপনে, আবেদনকারীর কাছ থেকে পরিচিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের রেফারেন্স দেওয়ার কথা থাকলে, জীবনানন্দ দরখাস্তে পদস্থ বন্ধুদের 'রেফারেন্স' দিয়েছেন, দিয়ে পরে চিঠি লিখে তাঁদের সে কথা জানিয়েছেন।

জীবনানন্দের এইরূপ একটা চিঠি দেখি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা। ১৩. ৬. ৪৯ তারিখে তিনি অচিন্ত্যবাবুকে লিখেছিলেন :

> ...আমি বিশেষ কোনো কাজ করছি না আজকাল। লিখে পড়িয়ে অল্প-স্বল্প রোজগারেই চলে যাচ্ছে। একটা চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম। রেফারেন্স চেয়েছিল— তার ভেতর তোমার নাম দিয়েছি। এ সব চাকরি হবে না।...

এই রেফারেন্স চাওয়ার চাকরিটা খুব সম্ভব অধ্যাপকের চাকরি ছিল না। তবে অচিন্ত্যবাবু যখন আসানসোলের সাব্ জজ ছিলেন, সেই সময় আসানসোল কলেজে একজন ইংরাজির অধ্যাপক নেবে বিজ্ঞাপন দেখে জীবনানন্দ চাকরিটা পাওয়ার আশায় দরখাস্ত করেছিলেন, এবং কাজটা ক'রে দেবার জন্য অচিন্ত্যবাবুকে বলেও ছিলেন। কিন্তু সে চাকরি জীবনানন্দের হয়নি।

অচিন্ত্যবাবুকে লেখা জীবনানন্দের চিঠিতে যে সামান্য উপার্জনের কথা আছে, তা হ'ল টিউশনির সামান্য উপার্জন। ঐ বেকার অবস্থায় জীবনানন্দ ক্বচিৎ কখন দু একটি টিউশনি করে যা সামান্য কিছু উপার্জন করতেন। আর কাগজে লিখে— সেও ক্বচিৎ কখন যৎসামান্য পেতেন। তখন দু একটা কাগজ ছাড়া লেখার জন্য বিশেষ করে আবার কবিতা লেখার জন্য টাকা দিতই না। তিনি অধিকাংশ কাগজেই কিছু না নিয়েই লেখা দিতেন। এই সময় অবশ্য অভাব অনটনের জন্য, নানা চিন্তায় বেশি লিখতেও পারতেন না।

জীবনানন্দের তখন যত চিন্তাই থাক, সাহিত্যিকরা তাঁকে ডাকলে বা তাঁদের দলে নেবার চেষ্টা করলে, তিনি নিজের সাধ্যানুযায়ী তাঁদের ডাকে সাড়া দিতেনই। তাই দেখি, ঐ সময়েই কলকাতার তরুণ সাহিত্যিকরা মিলে যে 'সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র' করেছিলেন, তাতে তাঁদের আহ্বানে তিনি সহ-সভাপতি হয়েছিলেন। আর ঐ সাহিত্য কেন্দ্রের মুখপত্র *দ্বন্দ্ব*-তেও তাঁকে কিছুদিনের জন্য অন্যতম সম্পাদক হিসাবে দেখি। অবশ্য অন্যতম সম্পাদক তিনি নামেই ছিলেন, না হলে অন্য সম্পাদক

তো ছিলেনই, তাছাড়া কাগজের গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রের এক এক জনের উপর ভার দেওয়া ছিল। এই সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের কোনো কোনো সভায় জীবনানন্দ যোগদানও করেছেন। আবার যেতে না পারলে, নিজের বক্তব্য চিঠির আকারে লিখেও জানিয়েছেন। সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্রের এমনি একবারের সভায় যেতে না পেরে যে চিঠিটি পাঠিয়েছিলেন, সেদিন সভায় জীবনানন্দের চিঠিটি পড়া হয়েছিল। এবং পরবর্তী সংখ্যা *দ্বন্দ্ব* পত্রিকায় সে-চিঠিটির কিয়দংশ ছাপাও হয়েছিল। *দ্বন্দ্ব*-এ লেখা হয়েছিল :

> সম্মেলনে কবি জীবনানন্দ দাশের প্রেরিত একটি অভিনন্দন বাণী পঠিত হয়। বাণীটির একাংশ এইরূপ— 'সাহিত্যের উচিত-স্বাধীনতা স্টেট বিপদগ্রস্ত হবে। আমার মনে হয়, বাংলাদেশ এভাবে এখনও ভাবতে শুরু করেনি, কিন্তু শিগ্‌গিরই করতে পারে। সমকালীন সাহিত্য কেন্দ্র একদিকে সমাজ ও জনতার বিমূঢ় উপেক্ষা ও অন্যদিকে রাষ্ট্র ইত্যাদির অন্যায় ও অবোধ কর্তৃত্বের হাত থেকে সাহিত্যকে যথাসম্ভব মুক্ত রাখবার কাজে ধৈর্য, জ্ঞান ও বিনয়ের সঙ্গে অগ্রসর হচ্ছেন অনুভব করে আমি আনন্দিত হয়েছি। সাহিত্যের উন্নতি ও সার্থকতার জন্যে আপনারা মিলিত হয়েছেন ; আপনাদের পরিপূর্ণ সাফল্য কামনা করি।

এই পত্রাংশটি ১৩৫৭ সালের পূজা সংখ্যা (১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে) *দ্বন্দ্ব* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। জীবনানন্দ তখনও ঐ পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক।

জীবনানন্দ তরুণ সাহিত্যিকদের ডাকে এইভাবে সাড়া দিয়ে এবং নিজে কিছু কিছু কবিতা লিখে ও প্রকাশ করে, তখন নিজের আর্থিক অবস্থার কথা ভুলবার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু তবুও কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত তিনি সমানেই করে যেতেন। এইভাবে দরখাস্ত করতে করতে এক সময় তিনি মেদিনীপুর জেলায় খড়গপুর কলেজে একটা চাকরি পেলেন।

খড়গপুর কলেজে ও বড়িষা কলেজে

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের একেবারে শেষদিকে জীবনানন্দ খড়গপুর কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান। খড়গপুর কলেজে কাজ নিয়ে তিনি সেখানে কলেজের হস্টেলে থাকতেন এবং ছুটিতে কলকাতার বাড়িতে আসতেন।

জীবনানন্দ খড়গপুরে কাজে যোগ দেওয়ার কিছুদিন আগেই তাঁর ছোট ভাই অশোকানন্দ কলকাতা থেকে বদলি হয়ে দিল্লী চলে যান। ফলে স্ত্রী ও ১২ বছর বয়স্ক পুত্র সমরানন্দকে কলকাতায় রেখেই জীবনানন্দকে খড়গপুরে যেতে হয়েছিল। জীবনানন্দের কন্যা মঞ্জুশ্রী তার পিসিমা সুচরিতা দাশের কাছে থেকে পড়াশুনা করত বলে, সে তখন তমলুকে ছিল। কলকাতার বাড়িতে স্ত্রী, পুত্র ছাড়া একজন ঠিকে ঝি এবং বাজার-হাট ও রান্না-বান্না করার জন্য একটা বালক ভৃত্যও অবশ্য ছিল।

জীবনানন্দ খড়গপুরে থেকে সর্বদাই বাড়ির জন্য চিন্তিত থাকতেন। কিন্তু উপায়ও নেই। কেন না, অনেক চেষ্টা করেও তিনি কলকাতা বা কলকাতার আশপাশে কোথাও কোনো রকমেরও একটা কাজ জোগাড় করতে পারেননি। তাই বাধ্য হয়েই স্ত্রী ও অল্পবয়স্ক পুত্রকে কলকাতায় ফেলে তাঁকে দূরে পড়ে থাকতে হয়েছিল। চাকরি ছাড়লে আবার এদিকে সংসারও অচল হয়।

এই সময় জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দেবীও আবার কলকাতায় ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে বি. টি. পড়তে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি বরিশালে থাকার সময়ই ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আই. এ. ও ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে বি. এ. পাস করেছিলেন।

এই ভাবেই পাঁচ-ছ মাস কাটল। ঐ সময় জীবনানন্দ একদিন খড়গপুর থেকে বাড়ি এসে দেখেন— স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ হয়ে বিছানায় শুয়ে আছেন। শুনলেন— গত তিন দিন ধরে তাঁর ঐ অবস্থা। শুনেই জীবনানন্দ তৎক্ষণাৎ তাঁর খুড়তুতো ভাই (পঞ্চম কাকা প্রেমানন্দের পুত্র) ডা. অমলানন্দ দাশকে ডাকলেন। অমলবাবু কলকাতায় মেডিকেল কলেজের একজন ডাক্তার ছিলেন।

অমলবাবু এসে লাবণ্য দেবীকে পরীক্ষা করে জীবনানন্দকে বললেন— বৌদির 'অ্যানজাইনা' হয়েছে। হার্ট খুবই দুর্বল। একদম নড়াচড়া করতে দেবেন না।

তারপর বৌদির দিকে চেয়ে পরিহাস করে বললেন— বৌদিকে দড়ি দিয়ে খাটের সঙ্গে কয়েক দিনের জন্য বেঁধে রেখে দিন।

জীবনানন্দ রুগ্না স্ত্রীর পরিচর্যায় লেগে গেলেন। চাকরি রইল পড়ে। প্রথমে দরখাস্ত করে কলেজে কয়েক দিনের ছুটি নিলেন, কিন্তু স্ত্রী সুস্থ হয়ে আর ওঠেন না। স্ত্রীর পরিচর্যার ভার কারও উপর দেবার মতো নিকট আত্মীয়স্বজনও পেলেন না। আর অপরের উপর ভার দিয়ে তিনি নিশ্চিন্তও হতে পারতেন না। তাই বাধ্য হয়েই শেষে খড়গপুর কলেজের চাকরিটা ছেড়ে দিলেন। এই সময় জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দেবী প্রায় একটানা চার মাস অসুখে ভুগেছিলেন।

খড়গপুরের চাকরি ছেড়ে দিয়ে জীবনানন্দ আবার বেকার হলেন। এবার কলকাতা কি কলকাতার আশপাশেই একটা চাকরির খোঁজ করতে লাগলেন। কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করতে লাগলেন। দরখাস্ত করে কাজ পাবার আশায় পরিচিত জনদের ধরতেও লাগলেন কিন্তু কোথাও কিছুই হ'ল না।

এই সময়ে জীবনানন্দের চাকরি প্রার্থনার দুটি ঘটনা এখানে বলছি—

এই ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দেই এক সময় কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি তাঁদের প্রতিষ্ঠানে একজন রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যাণ্ট নেওয়ার জন্য কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছিলেন। জীবনানন্দ সেই বিজ্ঞাপন দেখে প্রার্থী হিসাবে তাতে দরখাস্ত করেছিলেন।

ঐ পদের জন্য তখন আর একজন প্রার্থী ছিলেন কবি কিরণশংকর সেনগুপ্ত। কিরণশংকরবাবুও ইংরাজি সাহিত্যের এম. এ.। কিরণশংকরবাবু বলেন— আমি দরখাস্ত করে কে কে সিলেকশন কমিটিতে আছেন খোঁজ নিই। খোঁজ নিয়ে, চাকরিটা পাওয়ার আশায়, একদিন সুপারিশ ধ'রে কমিটির একজন সদস্যের বাড়িতে যাই। যখন যাই, তখন সেই ভদ্রলোক ঐ চাকরির আবেদনকারীদের দরখাস্তগুলো খুলে খুলে পড়ছিলেন। তাঁর কাছেই তখন আবেদনপত্রগুলো সবই ছিল। আমি সেদিন তাঁর কাছ থেকেই কথায় কথায় জানতে পেরেছিলাম— জীবনানন্দও ঐ পদের একজন প্রার্থী। তিনি জীবনানন্দকে চিনতেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয়ও ছিল।

সিলেকশন কমিটির ঐ সদস্য ভদ্রলোক ইণ্টারভিউ-এ আমাকে ডাকবেন বলেছিলেন। আমাকে ডেকেও ছিলেন। কিন্তু চাকরিটা আমার হয়নি। আমাকে ইণ্টারভিউ-এ ডাকা হলেও, আমি জানি জীবনানন্দকে ডাকা পর্যন্ত হয়নি।

এই সময়কার আর একটা ঘটনা—

কলকাতার চারুচন্দ্র কলেজে একজন ইংরাজির অধ্যাপক নেওয়া হবে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে জীবনানন্দ একটা দরখাস্ত করলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন— তাঁর পরিচিত কবি নরেশ গুহ তখন ঐ কলেজেই একজন ইংরাজির অধ্যাপক। চাকরিটা করে দেবার জন্য জীবনানন্দ নরেশবাবুকে গিয়ে ধরলেনও। কিন্তু কিছুই হল না।

জীবনানন্দ শুধু নরেশবাবুকেই নয়, ঐ কলেজের বাংলার অধ্যাপক তাঁর পরিচিত *একক* সম্পাদক কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসুকেও ধরেছিলেন। শুদ্ধসত্ত্ববাবুও জীবনানন্দের জন্য একদিন কলেজের অধ্যক্ষকে বলেছিলেন। কিন্তু তিনিও কিছুই করতে পারেননি। অন্য এক প্রার্থী কলেজ পরিচালক সমিতির কোনো কোনো সদস্য ও অধ্যক্ষকে

ধ'রে চাকরিটা পেয়েছিলেন।

জীবনানন্দ এই ভাবে যখন কাজের চেষ্টায় চারিদিকে আবেদন করে কেবলই ব্যর্থ হচ্ছিলেন, সেই সময় তিনি একবার তাঁর এক পরিচিত ভদ্রলোকের কথামতো তাঁর সঙ্গে মিলে একটা ব্যবসা করবেন স্থির করেছিলেন। জীবনানন্দ ইতিপূর্বে একবার দুজনে মিলে ভাগে ব্যবসাও করেছিলেন। এবার ঐ ভদ্রলোকের টাকা। জীবনানন্দের প্রেসিডেন্সি কলেজের এক সহপাঠী তখন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খুব উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জীবনানন্দ আশা করেছিলেন, তাঁকে ধরে তাঁদের ব্যবসায়ের প্রয়োজনীয় পারমিটটা বার করতে পারবেন।

ঐ সময়কার একদিনের একটা ঘটনা বলছি। কাহিনীটা বলেছিলেন, জীবনানন্দের কবিতার একজন বড় ভক্ত এবং জীবনানন্দের বিশেষ পরিচিত, বন্ধু-স্থানীয় অবনীমোহন কুশারি, আই. এ. এস.। জীবনানন্দ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহে এই অবনীবাবুর কাছে গেলে তখন তিনি আমাকে এই কাহিনীটি বলেছিলেন। অবনীবাবু তখন কলকাতায় লেক টাউনে নিজের বাড়িতে থেকে অবসর জীবন যাপন করছিলেন। অবনীবাবু বলেছিলেন—

সেটা ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

আমি তখন আমার হুগলীর জেলা শাসকের পদ থেকে বদলি হয়ে কলকাতায় রাইটার্স বিল্ডিংসে সেচ বিভাগে ডেপুটি সেক্রেটারি হ'য়ে এসেছি। আমার থাকার বাসা কলকাতায় জীবনানন্দবাবুর ল্যান্সডাউন রোডের বাসার কাছেই ছিল। তিনি আমার পূর্ব পরিচিত ছিলেন। আমি যখন বরিশালে এস. ডি. ও. ছিলাম, তখনই তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় হয়, তাঁর লেখার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে পরিচয় তারও আগের। আমি এই কলকাতায় থাকার সময় মাঝে মাঝে তাঁর বাসায় যেতাম। তিনিও কখন কখন আমার বাসায় আসতেন।

সেই সময়কার একদিনের দুপুরের একটা ঘটনা— অফিসে গেছি। সেদিন খুব গরম। দুপুরে হঠাৎ জীবনানন্দবাবু রাইটার্স বিল্ডিংসে আমার ঘরে এসে ঢুকলেন। আমি বিস্মিত হ'য়ে বললাম— আপনি এখানে হঠাৎ কি মনে ক'রে? তিনি বললেন— এখানে এসেছিলাম সত্যেনের কাছে।

— কোন্ সত্যেন?

— সত্যেন ব্যানার্জী আই সি. এস. রেভিনিউ বোর্ডের মেম্বার। সত্যেন আমার সহপাঠী। তার কাছেই এসেছিলাম। ভাবলাম, এসেছি যখন আপনার সঙ্গেও একটু দেখা করে যাই।

— বেশ করেছেন। তা সত্যেনবাবুর কাছে এসেছিলেন কি জন্যে?

— একটা বিশেষ দরকার ছিল।

— দরকার তো বটেই, তা না হ'লে আপনি এখানে আসেন। তা দরকারটা কি শুনতে পারি কি?

— একজনের সঙ্গে কিছু একটা ব্যবসা করব ভাবছি। তাই এসেছিলাম, সত্যেন যদি একটা পারমিটের ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারে...

এই কথা বলতে বলতেই দেখি জীবনানন্দবাবু হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে চেয়ারের হাতলের উপর ঝুঁকে পড়লেন। আমি তৎক্ষণাৎ উঠে ঘরের পাখাটা আরো জোর ক'রে দিয়ে হাতে করে কুঁজো থেকে জল নিয়ে তাঁর চোখে মুখে দিলাম। এবং ঐ চেয়ারে তাঁকে যতটা সম্ভব শোয়ানোর মতন করে দিয়ে আমি তাঁকে ধরে রইলাম।

কিছুক্ষণ পরে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল। তিনি অনেকক্ষণ ক্লান্ত ভাবে চেয়ারে বসে রইলেন। তারপর একটু সুস্থ হয়ে বাড়ি যেতে চাইলে, আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নেমে এলাম। এসে একটা ট্যাক্সি ডাকলাম। একা যেতে পারবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায়, যখন বললেন, পারব, তখন তাঁকে ট্যাক্সিতে তুলে দিলাম।

এই ভাবে বৎসরাধিক কাল ধরে জীবনানন্দ যখন সর্বত্রই ব্যর্থ হচ্ছিলেন, তখন সঞ্জয় ভট্টাচার্য একদিন জীবনানন্দকে বলেন— ব্যাঙ্কে চাকরি করবেন? টাকা পয়সার হিসাব নিকাশের চাকরি কি আপনার ভাল লাগবে? এ রকম চাকরি যদি করতে চান, তাহলে বলুন। আমি না হয় একবার কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনের মালিকদের বলে দেখি। আমি বললে— আশা করি তাঁরা আপনাকে ব্যাঙ্কে একটা চাকরি দেবেন।

কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং করপোরেশনই সঞ্জয়বাবুর সম্পাদিত 'পূর্বাশা' কাগজটা চালাত। তাই ঐ ব্যাঙ্কের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সঞ্জয়বাবুর বিশেষ পরিচয় ও হৃদ্যতা ছিল। তাছাড়া ঐ ব্যাঙ্কের তথা পূর্বাশারও মালিকরা এবং সঞ্জয়বাবুও সকলেই ছিলেন কুমিল্লার লোক। এইজন্যই সঞ্জয়বাবু জীবনানন্দকে ব্যাঙ্কের চাকরির কথা বলেছিলেন।

জীবনানন্দ অভাবে পড়ে নিমরাজি হয়ে যখন ব্যাঙ্কের চাকরি পেলে তাই করবেন বলে মনস্থ করছিলেন, সেই সময় দৈবক্রমে বড়িষা কলেজে একটা চাকরি পেয়ে গেলেন।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর তখন *আনন্দবাজার* ও *যুগান্তর* পত্রিকায় তাঁর যে সংক্ষিপ্ত জীবনী বেরিয়েছিল, তাতে লেখা হয়েছিল— জীবনানন্দ এক সময় ব্যাঙ্কেও চাকরি নিয়েছিলেন।

এ কথাটা ঠিক নয়। কেননা, তিনি চাকরি নেবেন বলে ঠিক করেছিলেন, কিন্তু ঐ সময় হঠাৎ বড়িষা কলেজে চাকরি পাওয়ায়, সে চাকরি না নিয়ে কলেজের চাকরিতেই চলে যান।

বড়িষা কলেজে জীবনানন্দের চাকরিটার একটু ইতিহাস আছে। সেটা এই—

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দে জীবনানন্দের ছোটভাই অশোকানন্দের বিয়ে হয় কলকাতার অরুণনাথ চক্রবর্তীর কন্যা নলিনী চক্রবর্তীর সঙ্গে। বিয়ের সময় নলিনী দেবী কলকাতায় তাঁর এক লেখিকা বান্ধবীকেও নিমন্ত্রণ করেছিলেন। বিয়ে বাড়িতে এসে জীবনানন্দের সঙ্গে ঐ লেখিকা ভদ্রমহিলার প্রথম পরিচয় হয়। পরে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবনানন্দ সপরিবারে বরিশাল থেকে কলকাতায় চলে এসে অশোকানন্দের বাড়িতেই যখন

থাকতেন, তখন মাঝে মাঝে ঐ লেখিকা ভদ্রমহিলা তাঁর বান্ধবী নলিনী দেবীর কাছে এলে জীবনানন্দের সঙ্গেও তাঁর আলাপ হ'ত। এতে জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় কিছুটা ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে কলকাতার উপকণ্ঠে বড়িষা কলেজের একজন ইংরাজির অধ্যাপক স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে চলে গেলে, ঐ কলেজে একজন অধ্যাপকের পদ খালি হয়। নলিনী দেবীর বান্ধবী ঐ লেখিকা ভদ্রমহিলার দাদা বড়িষা কলেজের অধ্যক্ষ থাকায় তিনি তাঁর দাদার কাছে ঐ পদ খালির কথা শুনেছিলেন। জীবনানন্দের যে চাকরি নেই একথাও তিনি জানতেন। তাই তিনি তাঁর দাদাকে বলে ঐ খালি জায়গায় জীবনানন্দের চাকরিটা করে দিয়েছিলেন।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জীবনানন্দ বড়িষা কলেজে ঢুকেছিলেন এবং এখানে চাকরি করেছিলেন ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ মাস চার মাত্র। এর পরই ঐ কলেজ থেকে তাঁর চাকরি চলে যায়। ঐ চাকরিটি খালি থাকা সত্ত্বেও তখন তাঁকে স্থায়ী করার জন্য আর কেউই কিছু বলেননি বা চেষ্টাও করেননি।

বড়িষা কলেজে জীবনানন্দকে কেন স্থায়ী করা হ'ল না, এই কথা জানবার জন্য, এই গ্রন্থটি লেখার সময় একদিন ঐ লেখিকা ভদ্রমহিলার কাছে গিয়েছিলাম। তাঁকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেছিলেন— জীবনানন্দ পড়াতে পারতেন না। তার উপর চাকরির ক্ষেত্রে তাঁর বয়সও হয়ে গিয়েছিল।

উত্তরে আমি বলেছিলাম— বড়িষা কলেজের পরে তিনি যখন হাওড়া গার্লস কলেজে পড়াতেন, শুনেছি তখন তো তিনি ভালই পড়াতেন, আর ছাত্রীদের খুব প্রিয় অধ্যাপকও ছিলেন।

আমার এই কথায় ঐ ভদ্রমহিলা বলেছিলেন— মেয়েদের কলেজে পড়ানোয় আর ছেলেদের কলেজে পড়ানোয় অনেক তফাৎ।

আমি বলেছিলাম— ঐ কলেজেও তো মেয়েরা পড়ত। তাছাড়া কলেজে সকলেই যে ভাল পড়াতে পারবেন, তা তো নাও হতে পারে। জীবনানন্দ দীর্ঘদিন ধরে কয়েকটা কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। কই কোথাও তো পড়াতে পারেন না বলে তাঁর চাকরি যায়নি।

তখন ভদ্রমহিলা বললেন— ওর বয়স হয়ে গিয়েছিল। একটা স্পনসারড্ কলেজে ঐ বয়সের লোককে লাগানো যায় না।

বললাম— হাওড়া গার্লস কলেজেও তো পরে লেগেছিলেন।

তিনি বললেন— দাদা, ওসব দায় দায়িত্ব নিতে রাজি ছিলেন না। জানেন তো মাথার উপর তখন এডুকেশন সেক্রেটারি ডি. এম. সেন। তিনি কিরূপ কড়া লোক?

কে কড়া আর কে নরম, তা আমার জানবার প্রয়োজন ছিল না, আমি যা জানবার সেটুকু জেনেই চলে এলাম।

জীবনানন্দ পড়াতে পারতেন না এবং বয়সও হয়ে গিয়েছিল— এ কথা, ঐ

ভদ্রমহিলা বললেও, ঐ কলেজের আর একজন ইংরাজির অধ্যাপক শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় কিন্তু অন্য কথা বলেন। *উত্তরসূরী* কাগজে এই শান্তিবাবু জীবনানন্দের মৃত্যুর পর এ সম্বন্ধে এক প্রবন্ধে যা লিখেছিলেন, অম্বুজ বসুও শান্তিবাবুকে অনুসরণ করে তাঁর *একটি নক্ষত্র আসে* গ্রন্থে তাই লিখে গেছেন। এঁরা লিখেছেন—

খড়গপুরের চাকরি ত্যাগ করে ঐ বছর নভেম্বর মাসে তিনি বড়িষা কলেজের ইংরাজি বিভাগে অস্থায়ীভাবে যোগ দেন। ঐ সময়ে তাঁর স্বাস্থ্য ভাল যাচ্ছিল না, রক্তচাপ জনিত একটা মানসিক দৌর্বল্য দেখা দিয়েছিল। ক্লাসের পূর্ব মুহূর্তে বড় অসহায় মনে করতেন নিজেকে। সহানুভূতিশীল সহকর্মীর হাতে বাড়িয়ে দিতেন নিজের হাত। সহকর্মীর অনুমতির উপরেই নির্ভর করছে তাঁর ক্লাসে প্রবেশ করা না করা। ইদানীং চোখের দৃষ্টিও ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছিল। সুতরাং নির্ধারিত চারমাস পার হয়ে গেলে তাঁকে স্থায়ী করে রাখার চেষ্টা না করে কর্তৃপক্ষ অধিকতর কর্মঠ ব্যক্তির সন্ধান করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলেন।

শান্তিবাবু একথা বললেও ঐ কলেজে জীবনানন্দের তখনকার এক ছাত্র কমলশংকর গুহ (পোঃ অশ্বিনীনগর, কলিকাতা-৫৯) এবং ঐ কলেজে জীবনানন্দের এক সহকর্মী অধ্যাপক নিরঞ্জন চৌধুরী এ কথা স্বীকার করেন না। এঁরা বলেন— তাঁকে ঐরূপ অসুস্থ বলে তখন আমরা কই কখনও দেখিনি। এই প্রসঙ্গ লেখার সময় নিরঞ্জনবাবু পশ্চিমবঙ্গ সরকারে রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট লাইব্রেরিয়ান হিসাবে কাজ করতেন।

বড়িষা কলেজের সংলগ্ন বড়িষা স্কুলের শিক্ষক কবি নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদার এ সম্বন্ধে বলেন— জীবনানন্দ ও আমি, অনেক সময় একই সঙ্গে কলকাতা থেকে ৭নং বাসে চড়ে বড়িষার যেতাম এবং ফেরার সময়ও অনেক সময় এক সঙ্গেই কলকাতায় ফিরতাম। কিন্তু তাঁকে তখন খুব দুর্বল বলে একদিনও দেখিনি।

জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দেবীকে শান্তিবাবুর ঐ লেখার কথা বলেছিলাম। শুনে, ও কথা সত্য নয় বলে তিনিও বলেছিলেন।

এঁদের কথা বাদ দিয়েও আমাদেরও ধারণা যে, যে-লোক কলকাতা থেকে অফিস টাইমে ভিড়ের মধ্যে অতদূর যেতে পারেন, তিনি ক্লাসের পূর্ব মুহূর্তে অসহায় মনে করতেন, এ ঠিক নয়। আমার মনে হয়, শান্তিবাবু যখন এ প্রবন্ধ লেখেন, তখন তিনি ঐ কলেজেরই অধ্যাপক ছিলেন বলে, হয়ত কলেজের পক্ষ টেনেই ঐ কথা লিখেছিলেন। জীবনানন্দ তখন মনে বা দেহে কিছুটা অসুস্থ থাকলেও শান্তিবাবু কলেজের হয়ে বলতে গিয়ে সেটাকে খুব বড় করেই দেখিয়েছেন।

যাই হোক, বড়িষা কলেজের চাকরি চলে যাওয়ায় জীবনানন্দ আবার বেকার হলেন। আবার তিনি কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্ত করতে লাগলেন।

এই সময় ডায়মণ্ড হারবার ফকির চাঁদ কলেজে একজন ইংরাজির অধ্যাপক নেওয়া হবে বলে কলেজ কর্তৃপক্ষ কাগজে বিজ্ঞাপন দেন। বিজ্ঞাপনে কলেজের

নাম ছিল না, ছিল বক্স নম্বর। জীবনানন্দ সেই বিজ্ঞাপন দেখে এখানে দরখাস্ত করলে আবেদনকারীদের মধ্যে কয়েকজনের সঙ্গে জীবনানন্দকেও যথারীতি ইন্টারভিউ-এ আহ্বান করা হয়।

এই চাকরির প্রার্থী হয়ে জীবনানন্দ ইন্টারভিউ-এ গেলে, সেখানে বর্তমান গ্রন্থকারের সঙ্গে জীবনানন্দের সাক্ষাৎ পরিচয় হয়। সেদিন ঐ অধ্যাপক নিয়োগের সিলেকশন বোর্ডের অন্যতম সদস্য হিসাবে বর্তমান লেখক উপস্থিত ছিলেন এবং প্রার্থী হিসাবে জীবনানন্দের শুধু নাম শুনেই সকলকে ব'লে তাঁর চাকরি ক'রে দিয়েছিলেন।

জীবনানন্দ এই চাকরি পেয়েও শেষ পর্যন্ত তাঁর নিজের সাংসারিক কয়েকটা অসুবিধার জন্য কলকাতা ছেড়ে অত দূরে যেতে পারলেন না। তখন তিনি বর্তমান গ্রন্থকারকে একজন হিতৈষী বন্ধু জেনে কলকাতার কাছাকাছি আর কোথাও একটা চাকরি ক'রে দিতে বলেন।

জীবনানন্দ ডায়মণ্ড হারবার কলেজে যোগদান করতে না পাবায় তখন বর্তমান গ্রন্থকার তাঁর বিশেষ পরিচিত হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ (প্রতিষ্ঠাতাও) বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে ধরে হাওড়া গার্লস কলেজে জীবনানন্দের চাকরি করে দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থের শেষে 'জীবনানন্দের সঙ্গে গ্রন্থকারের পরিচয়' প্রবন্ধে ও সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

সমালোচনার সম্মুখে

'বি. এম. কলেজে' অধ্যায়ে দেখিয়েছি, সেখানে কলেজে জীবনানন্দের কোনো কোনো সহকর্মী অধ্যাপক তাঁর কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। জীবনানন্দের পরিচিত-অপরিচিতদের মধ্যে আরও কেউ কেউ হয়ত তাঁর কবিতা নিয়ে তাঁকে বিদ্রূপ করতেন। কিন্তু যে সব তেমন কিছুই নয়। জীবনানন্দকে সব চেয়ে তীব্র, এমন কি এক এক সময় অতি নির্দয় ও অ-কহতব্যভাবে আক্রমণ করতেন শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাস। সজনীকান্ত জীবনানন্দের কবিতার সূত্র ধরে মাঝে মাঝে মানুষ জীবনানন্দকে নিয়েও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। তিনি জীবনানন্দকে মাতাল, পাগল ইত্যাদি কত কী-ই না বলতেন।

কবিতা, চতুরঙ্গ, পরিচয় প্রভৃতি যে কোনো পত্রিকাতেই জীবনানন্দের কবিতা প্রকাশিত হোক না কেন, সজনীকান্ত ঠিক খুঁজে খুঁজে জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতেনই। সজনীকান্তের এই ধরনের আক্রমণের— ওরই মধ্যে একটু ভদ্রগোছের— কয়েকটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি—

১৩৪৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা *কবিতা* পত্রিকায় 'ও হৈমন্তিকা' নামে জীবনানন্দের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দ তাঁর *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থে এই কবিতাটিকে অন্তর্ভুক্ত করবার সময় 'ও হৈমন্তিকা' নাম বদলে 'আকাশলীনা' করেছিলেন। আর কবিতার মধ্যের হৈমন্তিকীকে বদলে সুরঞ্জনা করেছিলেন। যাই হোক, এই 'ও হৈমন্তিকা' কবিতাটি কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে সজনীকান্ত তখন ১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের *শনিবারের চিঠি*-তে লিখেছিলেন—

কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) দাশকে আর ঠেকাইয়া রাখা গেল না ; রসের যে তুরীয়-লোকে তিনি উত্তরোত্তর উত্তীর্ণ হইতেছেন বুদ্ধদেব বসু অথবা সমর সেনের প্রশংসা সেখানে আর পৌঁছবে না। জলসিড়ি নদীর ধারে যেখানে ধানসিড়ি ক্ষেত তাহারই পাশে জাম হিজলের বনে তাঁহার মন এতকাল পড়িয়া ছিল। নাটোরের বনলতা সেন সেখান হইতে তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া কাঁচাগোল্লা খাওয়াই অনেকটা দুরস্ত করিয়া আনিয়া ছিলেন। কিন্তু জাল ছিঁড়িয়া তিনি আবার ভাসিয়াছেন— চিতাবাঘিনীর ঘ্রাণে ব্যাকুল চঘাই-হরিণের মতো। আর তাঁহাকে ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না।

এবার হৈমন্তিকী। হৈমন্তিকীকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিতেছেন :

আকাশের আড়ালে আকাশে।
মৃত্তিকার মত তুমি আজঃ
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।
হে হৈমন্তিকী,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস !

প্রেয়সীকে এতকাল আমরা হৃদয়ে লইতাম— ভালবাসিতাম। এইবার প্রেয়সীর হৃদয়ে চরিবার দিন আসিল। এক সঙ্গে দেহের আহার ও মনের ওষুধ— এ সম্ভাবনার কথা কে কল্পনা করিতে পারিয়াছিল?

কিন্তু হৃদয় কি অকারণেই ঘাস হইয়াছে?

...একদিন নীল ডিম করেছ বুনন ;
আজো তারা শিশিরে নীরব।

প্রেয়সী নীল ডিম বুনিয়াছেন, ঘাসের মাঝখানে শিশিরে পড়িয়া তারা নীরব আছে। কবি প্রতীক্ষা করিতেছেন :

পাখির ঝর্ণা হয়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব !

কবিতা পত্রিকার সুদিন আসিতেছে মনে হইতেছে।— সংবাদ সাহিত্য, অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪।

চতুরঙ্গ পত্রিকায় জীবনানন্দের 'ফুটপাথে' কবিতাটি প্রকাশিত হ'লে তখন সজনীকান্ত তাঁর *শনিবারের চিঠি*-তে লিখেছিলেন :

কবি জীবনানন্দ (জীবানন্দ নহে) 'চতুরঙ্গ' (চৌরঙ্গীর ?) 'ফুটপাথে' বসিয়া পড়িয়াছেন—
অনেক রাত হয়েছে— অনেক গভীর রাত হয়েছে :
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে— ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো
এই-যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব করে হাঁটছি আমি।

কলিকাতার ফুটপাথে আমরাও চলাফেরা করি এবং অনেক গভীর রাতে যে না করি হলফ করিয়া তাহা বলিতে পারিব না। কিন্তু ফুটপাথে সর্পিণী সহোদরার মতো বিষাক্ত ট্রামের লাইন দেখা কখনও ভাগ্যে ঘটে নাই। আমাদের বরাবরই

সন্দেহ ছিল, হোটেলগুলি পুরা দাম লইয়া আমাদিগকে ঠকায়, এইবারে তাহা প্রমাণ হইয়া গেল। জীবনানন্দবাবুর (জীবানন্দ নয়) বরাত ভাল, খাঁটি জায়গার সন্ধান তিনি পাইয়াছেন। লক্ষণ সব ঠিক ঠিক মিলিয়া যাইতেছে, কবি 'নির্জলা' সত্য বলিতেছেন :

পায়ের তলে লিক্‌লিকে ট্রামের লাইন,— মাথার ওপরে
অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাস করছে আমাকে।...
সবুজ ঘাসের ভেতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা মরে রয়েছে
দেখতে পাবে না তুমি এখানে? [২]

শেষ পরিণতিতে আমরা সরিষা ফুল দেখিয়া থাকি, দেয়ালি পোকা সম্পূর্ণ অভিনব। জীবনানন্দের (জীবানন্দের নহে) অরিজিনালিটি আর অস্বীকার করা চলিবে না।— সংবাদ সাহিত্য— কার্তিক, ১৩৪৫।

ধবল কুষ্ঠ জানিতাম, কিন্তু কবি জীবনানন্দ দাশ (জীহ্বানন্দ নহে) সম্প্রতি 'ধবল শব্দ'[৩] শুনিতেছেন। কবিরাজ মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি শাস্ত্র ঘাঁটিয়া বিশেষ সংকোচের সহিত বলিলেন, ফেরঙ্গ রোগ পর্যায়ে এ একটা কঠিন ব্যাধি। 'রক্ত-গোধিকার লালে'র সহিত 'কৃষ্ণ' কর্ণমর্দনের' নিয়মিত প্রয়োগ ব্যতিরেকে এই ব্যাধি সারিবার নহে। ব্যাধি নিশ্চয়, নহিলে এরূপ প্রলাপ কেন?

মোদের প্রদীপ বড় ধীরে জ্বলে— ধীরে জ্বলে— ধীরে জ্বলে— আমার টেবিলে
মনীষার বইগুলো আরো স্থির— শান্ত আরাধনাশীল ;
পৃথিবীতে চরি সমস্বরে— রক্তগোধিকার মত লাল ;
দণ্ডী সত্যাগ্রহে আমি বিকোষিত জীবনের করুণ আভাস
অনুভব করি ; কোনো গ্লাসিয়ার— হিম স্তব্ধ কর্মোরেণ্ট— পাল
বুঝিবে আমার কথা, জীবনের বিদ্যুৎ-কম্পাস অবসানে
তুষার ধূসর ঘুম খাবে, তারা মেরু সমুদ্রের মত অস্ত ব্যাদনে।

ভাইপো ন্যাপলা পাশে দাঁড়াইয়া কবিতাটি শুনিতেছিল, হঠাৎ 'হয়েছে', 'হয়েছে' বলিয়া সে লাফাইয়া উঠিল। বিরক্ত হইয়া প্রশ্ন করিলাম— কি হয়েছে? — আমার বিরক্তি ন্যাপলা টের পাইয়াছিল। মাথা চুলকাইয়া বলিল— ধূসর।

তাহার হাতে শব্দ প্রতিযোগিতার একটা কাগজ, বুঝিলাম 'ধূসরে' আটকাইয়া ছিল। (*সংবাদ সাহিত্য*, মাঘ, ১৩৪৫)

পরিচয় পত্রিকায় জীবনানন্দের 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য'[৪] (পরে জীবনানন্দ তাঁর এই কবিতাটিকে *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেন) কবিতাটি প্রকাশিত হ'লে, তখন এই কবিতাটি নিয়ে সজনীকান্ত তাঁর *শনিবারের চিঠি*-র সংবাদ সাহিত্যে লিখেছিলেন :

গোধূলি সন্ধির নৃত্য দেখিয়াছেন? চৈত্রের 'পরিচয়ে' দেখিতে পাইবেন। নাটোরের বনলতা সেনকে বিস্মৃত হইয়া কবি জীবনানন্দের (জিহ্বানন্দ নহে) এই টারণন্‌টেলা নাচ ! হায়রে যদি নাচ না হইয়া সোয়ান সঙ হইত ! ...
গোপালদা একবার আর্তকণ্ঠ। বলিলেন, থাম। তিনি ই. বি. আর. ও বি. এন. আর-এর টাইম টেবল ঘাঁটিতে লাগিলেন। বরিশাল হইতে রাঁচি। খানিক পরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন— দেখছি, দুর্ভোগ বড় কম হবে না।— সংবাদ সাহিত্য— চৈত্র, ১৪৪৫।
'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতাটি পড়লে দেখবেন, তাতে টারান্‌টেলা নাচের কোনো কথাই নেই। এই টারান্‌টেলার কথা আছে জীবনানন্দের 'সিন্ধু সারস' কবিতায়। এই কবিতাটি তাঁর 'মহাপৃথিবী' গ্রন্থে আছে। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৩ সালের পৌষ মাসের 'কবিতা' পত্রিকায়।
Learning words নামক ইংরাজি-বাংলা অভিধানের রচয়িতা অধ্যাপক ড. দিলীপকুমার মিত্রকে একদিন কথায় কথায় টারান্‌টেলা নাচের কথা বললে, তিনি বললেন— টারান্‌টেলা নাচ হ'ল— দ্রুতগতির ইতালীয় নৃত্য।
আমার বন্ধু মৈত্রেয়ী ঊর্মি রায় একজন লেখিকা। একদিন এই বই-এর প্রুফ দেখার সময় তাঁকে এই 'সমালোচনার সম্মুখে' অংশটি পড়ে শোনাচ্ছিলাম। সেই সময় আমার স্ত্রী মীনাক্ষী দেবী আমার পাশে বসেছিলেন। পড়ার সময় আমার মুখে Swan Song শুনেই তিনি বললেন— আমি স্কুলে উপরের ক্লাসে এই Swan Song কথাটা অনেকবার পড়িয়েছি। এর অর্থ— মৃত্যুর আগে শেষ কাজ বা গান বা কণ্ঠস্বর।
তাঁর 'সূর্যের ঘুম ভেঙেছে' কবিতার বইয়ের শেষে যে ইংরাজি কবিতাগুলো আছে, তার একটার এক জায়গায় তো তিনি লিখেওছেন :
I wished to finish my swan song
After my journey long

এখানে শনিবারের চিঠি থেকে জীবনানন্দকে আক্রমণাত্মক সজনীকান্তর লেখা উদ্ধৃত করতে গিয়ে দেখছি, সজনীকান্ত তাঁর লেখার মধ্যে যখনই জীবনানন্দের নাম করেছেন, তখনই জীবানন্দের নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে হয় 'জীবানন্দ নহে' নয়ত 'জিহ্বানন্দ নহে' লিখেছেন। জীবনানন্দের লেখা নিয়ে যেমন, জীবনানন্দের নাম নিয়েও তেমনি সজনীকান্তের এ আর এক ধরনের বিদ্রূপ।
জীবনানন্দের সময়ে জীবানন্দ নামে এক ব্যক্তি নাকি কবিতা লিখতেন। তাঁর থেকে পৃথক করে বোঝাবার জন্যই কি সজনীকান্ত জীবনানন্দ লিখেই পাশে বন্ধনীর মধ্যে 'জীবানন্দ নহে' লিখতেন? তবে জীবনানন্দকে নিয়ে সজনীকান্তের 'জিহ্বানন্দ নহে' লেখা সম্বন্ধে একজনের কাছে শুনেছি— জীবনানন্দ কথা বলবার সময় মুদ্রাদোষের মতো মাঝে মাঝে জিবটা ঠোঁটের উপর বুলিয়ে নিতেন বলেই নাকি সজনীকান্ত ঐ কথা লিখতেন।

জীবনানন্দের শেষ জীবনে বছর দুই তাঁর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল। ঐ সময় একদিনও কিন্তু আমি তাঁকে ঠোটের উপর জিব বুলোতে দেখিনি। জীবনানন্দের কয়েকজন বন্ধুর কাছে শুনেছি, জীবনানন্দকে ওরকম করতে তাঁরাও দেখেননি।

জীবনানন্দ বরিশালে ব্রজমোহন কলেজে যখন অধ্যাপনা করতেন, তাঁর তখনকার ঐ কলেজের এক সহকর্মী অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তীর এক লেখায় দেখছি, জীবনানন্দ কখন কখন জিব দিয়ে তাঁর ঠোঁট বুলিয়ে নিতেন। তবে সে কিন্তু অন্য কারণে। মুদ্রাদোষ হিসাবে নয়। যাই হোক, হেরম্ববাবু লিখেছেন— 'প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির মনে যে কৌতূহল ছিল, তাঁর মনে প্রকৃতি কল্পনা-শক্তির যে সক্রিয়তা সঞ্চার করত, তেমন উদ্দীপনা মানব সম্পর্কে কখনও জেগেছে কিনা জানি না। আমি তো বরং দেখেছি যে, মানুষের ভিড়ে কবি যেন নিঃসাড় হয়ে যেতেন। এমন কি ক্লাসে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড়েও তাঁর গলা শুকিয়ে যেত। বার বার জিব দিয়ে বিশুষ্ক ওষ্ঠপ্রান্ত লেহন না করলে ভাল করে বাক্য স্ফূর্তি হ'ত না।

হেরম্ববাবুর মুখেই শুনেছি, ব্রজমোহন কলেজে জীবনানন্দকে অত্যন্ত নিরস ও কঠিন বিষয়গুলোই পড়াতে দেওয়া হ'ত, ফলে তিনি কলেজের ছাত্রছাত্রীদের কাছে প্রিয় অধ্যাপক হতে পারেন নি। পড়ানো নিয়ে ক্লাসে অখুশি ছাত্রছাত্রীদের কাছে নিজেকে বিব্রত মনে করেই কি তরুণ অধ্যাপক জীবনানন্দ তখন ঐরূপ করতেন?

হেরম্ববাবু শনিবারের চিঠির গ্রাহক ছিলেন এবং নিজেও একজন কবি ছিলেন। তিনি এক সময় জীবনানন্দের কবিতার উপর ব্যঙ্গ কবিতা লিখে কোনো একটি কাগজে প্রকাশও করেছিলেন। ব্রজমোহন কলেজের অন্য কয়েকজন অধ্যাপকও জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। এঁদের কারও সঙ্গে সজনীকান্তের পরিচয় ছিল কিনা, আর এঁদের কারও কাছ থেকেই তিনি জীবনানন্দের ঐ ঠোঁটে জিব বুলোনোর কথা শুনেছিলেন কিনা জানি না। জীবনানন্দের অধ্যাপক জীবনের প্রথম দিকে সত্যই যদি ঐরূপ অভ্যাস থাকত, তাহলে সজনীকান্ত সিটি কলেজের কোনো অধ্যাপক বা ছাত্রের কাছ থেকেও, অবশ্য শুনে থাকতে পারেন। কেন না সভাসমিতি বিমুখ জীবনানন্দকে তখনও পর্যন্ত সজনীকান্ত নিজে কোথাও ভালভাবে দেখেছিলেন কিনা সন্দেহ। যাই হোক, যার কাছ থেকেই সজনীকন্ত একথা শুনে থাকুন, আর এর মধ্যে যে কোনো কারণেই হোক, যদি কিছু সত্য থেকেও থাকে, তাই নিয়ে মানুষকে ঐভাবে বিদ্রূপ করাটা মোটেই সুরুচির পরিচয় নয়।

আগে বরিশাল থেকে কলকাতায় আসার যে ট্রেন ছিল, তার নাম ছিল— ই. বি. আর. অর্থাৎ ইষ্ট বেঙ্গল রেলওয়ে। আর কলকাতা থেকে রাঁচি যাবার যে ট্রেন ছিল, তার নাম ছিল— বি. এন. আর. বা বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে। জীবনানন্দ ঐ সময় বরিশালে থাকতেন। সজনীকান্ত তাঁর গোপালদার মুখে 'রাঁচি' বসিয়ে রাঁচির পাগলা গারদের কথাই বলতে চেয়েছেন, অর্থাৎ জীবনানন্দকে পাগল বলেছেন।

আগে বলেছি *পরিচয়* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতা প্রকাশিত হ'লে, তখন সজনীকান্ত তাঁর *শনিবারের চিঠি*-তে জীবনানন্দকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছিলেন।

জীবনানন্দ সজনীকান্তের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, তখন সজনীকান্তর আক্রমণের একটা জবাব দেবার চেষ্টা করেছিলেন। জবাব লিখেও ছিলেন। কিন্তু তিনি সে লেখা কোথাও প্রকাশ করেননি। এ সম্পর্কে আমার অনুমান, তাঁর ঐ লেখা প্রকাশিত হ'লে সজনীকান্ত তাঁকে আরও তীব্রভাবে আক্রমণ করতে পাবেন, এই ভয়েই তিনি লিখেও লেখাটা কোথাও প্রকাশ করতে সাহস পাননি।

জীবনানন্দের সেই অপ্রকাশিত লেখা, তাঁর মৃত্যুর পর *শতভিষা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পরে কারও কারও মতো সন্দীপ দত্ত তাঁর সম্পাদিত *জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিকী* সংকলন গ্রন্থে *শতভিষা* থেকে ঐ লেখাটি নিয়ে— 'ক্যাম্পে : জীবনানন্দ দাশ : কবির স্বকৃত ব্যাখ্যা' নামে প্রকাশ করেন।

জীবনানন্দ প্রাসঙ্গিকী গ্রন্থ থেকে 'ক্যাম্পে' কবিতা সম্বন্ধে জীবনানন্দের সেই স্বকৃত ব্যাখ্যাটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

ক্যাম্পে : জীবনানন্দ দাশ : কবির স্বকৃত ব্যাখ্যা

আমার 'ক্যাম্পে' কবিতাটি সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা দরকার মনে করি। কবিতাটি যখন শেষ হ'ল তখন মনে হয়েছিল সহজ শব্দে শাদা ভাষায় লিখেছি বটে, কিন্তু তবুও কবিতাটি হয়তো অনেকে বুঝবে না। বাস্তবিকই 'ক্যাম্পে' কবিতাটির মানে অনেকের কাছে এতই দুর্বোধ্য রয়ে গেছে যে এ কবিতাটিকে তাঁরা নির্বিবাদেই অশ্লীল ব'লে মনে করেছেন।

কিন্তু তবুও 'ক্যাম্পে' অশ্লীল নয়। যদিও কোনো একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের— মানুষের-কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নিঃসহায়তার সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নিঃসহায়— 'ক্যাম্পে' কবিতাটির ইঙ্গিত এই ; এইমাত্র। কবিতাটির এই সুর শিকারী, শিকার, হিংসা এবং প্রলোভনে ভুলিয়ে যে হিংসা সফল— পৃথিবীর এই সব ব্যবহারে বিরক্ত তত নয়, — বিষণ্ণ যতখানি; বিষণ্ণ— নিরাশ্রয়। 'ক্যাম্পে' কবিতায় কবির মনে হয়েছে তবু যে স্থূল হরিণ-শিকারীই শুধু প্রলোভনে ভুলিয়ে হিংসার আড়ম্বর জাঁকাচ্ছে না, সৃষ্টিই যেন তেমন এক শিকারী, আমাদের সকলের জীবন নিয়েই যেন তার সকল শিকার চলেছে ; প্রেম-প্রাণ-স্বপ্নের একটা ওলটপালট ধ্বংসের নিরবচ্ছিন্ন আয়োজন যেন সবদিকে : King Lear-এর As flies to wanton boys are we to the gods. They kill us for their sport এই আয়োজন। বাংলা সাহিত্যে— অন্তত কাব্যে এ সুর— 'ক্যাম্পে' কবিতাটির এই পবিত্র কঠিন নিরাশ্রয়তার সুর; 'জ্যোৎস্নার ওই মৃত মৃগদের মতো আমরা সবাই'— এই সুর আগে এসেছে কিনা জানি না। অন্তত এ সুরের সঙ্গে চলতি বাঙালী পাঠক ও লেখক যে খুব কম পরিচিত তা নিঃসঙ্কোচে বলা যেতে পারে। যে জিনিস অভ্যস্থ বুদ্ধি বিচার

কল্পনাকে আঘাত করে— যা পরিচিত নয় তার অপরাধ ঢের। কিন্তু তবুও অশ্লীলতার দোষে 'ক্যাম্পে' কবিতাটি সব চেয়ে কম অপরাধী। ইংরাজী জার্মান বা ফ্রেঞ্চে এ কবিতাটি অনুবাদ ক'রে যদি বিদেশী Literary circle-এ পাঠানো হ'ত, তাহলে এ কবিতাটির কি রকম সমালোচনা হ'ত ধারণা করতে পারা যায় ; 'ক্যাম্পে' কবিতাটির যে সুরের কথা আমি ইতিপূর্বে বলেছি তাই নিয়ে বিশ্লেষণ চলত। দু-একটি Prurient-মন ছাড়া এ কবিতাটির ভিতর থেকেই নিজেদের প্রয়োজনীয় খোরাক খুঁজে বার করবার অবাধ শক্তি তাদের রয়েছে ; এই তাদের একমাত্র শক্তি এই Prurience-এর কাছে 'ক্যাম্পে' অশ্লীল,— আকাশের নক্ষত্রও শ্লীল নয়। শেলীর 'Soul's sister' পাশ্চাত্য কবি সমালোচক ও পাঠকদের গভীর আদরের expression,— কিন্তু 'হৃদয়ের বোন' [এই expression-টির জন্য শেলীর কাছে আমি ঋণী]— এই শব্দ দুটি prurient অন্তঃকরণকে শুধু বুঝতে দেয় যে সে কত prurient — তার ভিতর অন্য কোনো চেতনা জাগায় না। Muteykeh (একটি ঘোটকী) সম্বন্ধে Browning বলেছেন, 'She was the child of his heart by day, the wife of his breast by night' না জানি Browning সম্বন্ধে prurience কি বলত?
কিন্তু বাংলাদেশে সজ্‌নে গাছ ছাড়া আরো ঢের গাছ আছে— সুন্দরী গাছ বাংলার বিশাল সুন্দরবন ছেয়ে রয়েছে যে সজ্‌নের কাছে তা অবিদিত থাকতে পারে— prurience-এর কাছে প্রকৃত সমালোচকের অন্তরাত্মা যেমন চিরকালই অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত। বাংলাদেশের সব কবিই এই ১৯৩২ সালে কলেজীয় কবিতা যুদ্ধের naivete-র ভিতর রয়ে যায়নি। কিন্তু হায়, যদি তেমন হ'য়ে থাকতে পারা যেত ! সহজ সরল বোধ নিয়ে সুসাধ্য সুগম পথে চিন্তালেশশূন্যতার অপরূপ উল্লাসে জীবন কত মজারই না হ'ত তাহ'লে।

জীবনানন্দ দাশ

এখন জীবনানন্দের এই লেখাটা নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক—

জীবনানন্দ তাঁর এই লেখায় *King Lear* থেকে যে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, সে লেখা আছে— সেক্সপীয়রের *King Lear* নাটকের ৪র্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। সেখানে সেক্সপীয়র Gloucester-এর মুখ দিয়ে এই কথা বলিয়েছেন।

জীবনানন্দ সাধারণত ঈশ্বর বা দেবতাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতেন না। তিনি সজনীকান্ত দাসের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তার উত্তর দিতে গিয়ে সৃষ্টিই যেন তেমন এক শিকারী ইত্যাদি বললেও সেক্সপীয়রের ঐ কথা উদ্ধৃত করেছেন।

(সন্দীপ দত্তর বইয়ে সেক্সপীয়রের এই লেখাটি ছাপার ভুলে হয়েছে— *As this to wanton toys are we to the gods. They kill us for their sport.*)

জীবনানন্দ লিখেছেন prurience-এর কাছে 'ক্যাম্পে' অশ্লীল— আকাশের নক্ষত্রও শ্লীল নয়।

আকাশের নক্ষত্রও শ্লীল নয়— জীবনানন্দ যে কি অর্থে এ কথাটা বলেছেন

তা বুঝতে পারছি না। আমরা জানি উত্তর আকাশের ধ্রুব নক্ষত্র বা ধ্রুবতারা এবং সপ্তর্ষি মণ্ডলের সাতটি নক্ষত্র : এই ধ্রুব, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ। এঁদের নাম নিয়েই জ্যোতিষীরা নামকরণ করেছেন। এঁরা সকলেই শ্লীল ও মহান।

ধ্রুব এবং সপ্তর্ষিমণ্ডলের এই নক্ষত্রগুলি ছাড়া আকাশের অগণিত নক্ষত্রের মধ্য থেকে ২৭টি নক্ষত্র নিয়ে জ্যোতিষীরা তাঁদের জ্যোতিষ গণনা ইত্যাদি কাজ করে থাকেন। ঐ ২৭টি নক্ষত্র হ'ল : অশ্বিনী, অনুরাধা, পূর্বভাদ্রপদ, উত্তর ভাদ্রপদ, রেবতী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু, পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্ব ফাল্গুনী, উত্তর ফাল্গুনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, ধনিষ্ঠা, শতাভিষা, শ্রবণা। এদের মধ্যে স্বাতী সূর্যের স্ত্রী, অশ্বিনী ও রোহিণী চন্দ্রের স্ত্রী— এই ভাবে জ্যোতিষীরা নক্ষত্রদের নিয়ে কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেছেন। এ সব কাহিনী তো 'ক্যাম্পে' কবিতার জীবন্ত হরিণ ও ঘাই হরিণীদের কাহিনীর মতো নয়, তাই এখানে জীবনানন্দের এই কৈফিয়ৎটা সঙ্গত হয়েছে বলে মনে হয় না।

জীবনানন্দ বলেছেন, 'ক্যাম্পে' কবিতায় তিনি যে 'হৃদয়ের বোন' লিখেছেন। এই expression টির জন্য শেলীর কাছে তিনি ঋণী। শেলীর *Soul's sister* পাশ্চাত্য কবি, সমালোচক ও পাঠকদের গভীর আদরের expression.

শেলী তাঁর কোন্ কবিতায় *Soul's sister* বা 'হৃদয়ের গান' লিখেছেন, জীবনানন্দ এখানে তাঁর লেখায় তা বলেননি। তবে শেলীর *Epipsychidion* গ্রন্থে দেখছি, তিনি এক জায়গায় লিখেছেন :

Emily,

A ship is floating in the harbour now,
A wind is hovering o'er the mountain's brow ;
There is path on the sea's azure floor,
No keel has ever ploughed that path before ;
The halcyons brood around the foamless isles ;
The treacherous Ocean has forsworn its wiles ;
The merry mariners are bold and free ;
Say, my heart's sister, wilt thou sail with me ?

শেলী লিখেছেন, *my heart's sister*, মনে হয় জীবনানন্দ শেলীর এই h*eart's sister* কেই *soul's sister* বলেছেন।

শেলী তাঁর এই কাব্য গ্রন্থ বা দীর্ঘ কবিতাটি প্রসঙ্গে প্রথম পাতাতেই কবিতার শিরোনামের নীচে লিখেছেন :

Verses Addressed To The Noble And Unfortunate Lady Emilia Viviani, Now Imprisoned In The Convent Of St. Anne, Pisa

লণ্ডনের সেণ্ট মার্টিন স্ট্রীট থেকে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত ম্যাকমিলন অ্যান্ড কোং লিমিটেড-এর *Poems of Shelley* নামে একটি বই আমার সংগ্রহে আছে। এই বই-এর কবিতাবলী 'selected and arranged by Stopford A. Brooke.' সেই বই থেকেই আগে *heart's sister* কবিতা অংশটা উদ্ধৃত করেছি।

আমার সংগ্রহের ঐ *Poems of Shelley* বই-এর শেষে সংকলক ও সম্পাদক যে Notes লিখেছেন, সেই Notes -এর মধ্যে *Epipsychidion* বইটি সম্বন্ধে এক জায়গায় লিখেছেন :

The fault of the poem as an exposition of the Platonic theory of love, even with Shelley's addition thereto, is perhaps the very root of its excellence as poetry

আমার সংগ্রহের শেলীর এই কবিতাবলী *Epipsychidion* বই এর প্রথম পাতার শেষ দিকে Advertisement (by Shelley) আছে। তার প্রথমাংশের কিছুটা এই :

The writer of the following lines died at Florence as he was preparing for a voyage to one of the wildest of the Sporades which he had bought...

জীবনানন্দ লিখেছেন— শেলীর *Soul's sister (heart's sister)*—হৃদয়ের বোন expressionটি পাশ্চাত্য কবি সমালোচক ও পাঠকদের গভীর আদরের expression।

বোনকে অন্য কিছু না ভেবে আজকের সমাজের সত্যকার বোনের মতো ভেবে হৃদয়ের বোন বলায় যে গভীর আদরের expression হয়, তা পাশ্চাত্য কেন প্রাচ্যেরও কবি, সমালোচক, পাঠকরা ছাড়াও সাধারণ মানুষরা ভালই বোঝেন।

শেলী তাঁর কবিতায় *Emily* কে যে 'হৃদয়ের বোন' বা *Soul's sister* বলেছেন, সেই *Emily* তাঁর নিজের বোন নয়, তাঁর এক অনাত্মীয়া।

তাছাড়া শেলীর ঐ বই-এর শেষে সম্পাদকের Notes-এ এক জায়গায় *Platonic theory of Love*-এর উল্লেখ দেখছি।

ক্যাম্পে কবিতায় জীবনানন্দ তাঁর কবি কল্পনায় লিখেছেন— হরিণদের 'হৃদয়ের বোন' হরিণী জ্যোৎস্না রাতে হরিণদের ডেকেছিল।

ঘাই হরিণী সারারাত ডাকে

...

পুরুষ হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার,

তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে,
তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদের ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।

এখানে এই যে হরিণী বা ঘাই হরিণী, এ হরিণদের সহোদরা বোন তো নাও হতে পারে। আর যদিই হয়, সকলেই জানেন, মানুষের সমাজের ভাইবোনের সম্পর্ক, আর পশু সমাজের ভাইবোনের সম্পর্ক, তো সকল ক্ষেত্রে এক নয়।

জীবনানন্দ তাঁর ক্যাম্পে কবিতায় কোথাও বলেননি, তাঁর 'হৃদয়ের বোন' তাঁকে ঐভাবে ডেকেছিল। তিনি শুধু এক জায়গায় লিখেছেন :

আমার হৃদয়— এক পুরুষ হরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়— চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমারে কি চায় নাই ধরা দিতে?

এখানে 'তোমারে' এর সঙ্গে 'হৃদয়ের বোন'-এর সম্পর্ক নেই। এই 'তোমারে' কবির কোনো প্রেমিকা বা ছলনাময়ী প্রেমিকাও হতে পারে।

সজনীকান্ত 'ক্যাম্পে' বর্ণিত হরিণ—হরিণীর অর্থাৎ পশু সমাজের ভাই বোনের কাহিনীকে ভুল করে বা জীবনানন্দকে গালাগালি দেবার জন্য ইচ্ছা করে মনুষ্য সমাজের কাহিনী বানিয়ে আক্রমণ করেছিলেন।

যাঁরা ভুল করে বা ইচ্ছা করে আক্রমণ করে থাকেন, তাঁদের কাছে জীবনানন্দের ব্রাউনিং-এর ঘোটকীকে নিয়ে কল্পিত বিভিন্ন অনুভূতির মতনের কথার উদাহরণের মূল্য কি?

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান অধ্যাপিকা ড. সুমিতা চক্রবর্তী তাঁর *কবিতার অন্তরঙ্গ পাঠ*; *জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে* গ্রন্থে ক্যাম্পে কবিতার আলোচনা করতে গিয়ে এক জায়গায় লিখেছেন, 'এ কথাটিও কিন্তু বিবেচনা করতে হবে আমাদের যে সজনীকান্তের সমালোচনায় একটি নিহিত সত্যের ইঙ্গিতও ছিল।'

এই লিখে সুমিতা দেবী কোনো কোনো লোকায়ত রামায়ণ কাহিনীতে বলা হয়েছে সীতা রামের ভগ্নী ইত্যাদি বলে যে আলোচনা করেছেন, তা অপ্রাসঙ্গিক ও অবান্তর বলে মনে করি।

সুমিতা দেবী সজনীকান্তের ঐ ভুল ও নির্মম আক্রমণের মধ্যে কি করে কোথায় 'নিহিত সত্যের ইঙ্গিত' পেলেন?

সজনীকান্ত তাঁর *আত্মস্মৃতি*গ্রন্থে লিখেছেন, 'দার্জিলিং গিরিশৃঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত কবি নজরুল ইসলামের মুলাকাত হয়। এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গ হাবিলদার কবি স্বয়ং প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে এই নৈর্ব্যক্তিক আলোচনাটি ছিল :

কবি হেসে বললেন— সজনে গাছকে কোনো বকমেই উপেক্ষা করা চলে না, কেননা চমৎকার ফুলঝুরির মতো ফুল সেজে থাকে। ...কবি হাসতে হাসতে বললেন— এই রকম আর একটি জীবের নাম করা চলে, দেখতে সে বেশ সুশ্রী, কিন্তু সেও ঠিক এই কারণে সাহিত্যের আসরে একঘরে হয়ে আছে।— আমরা সবাই উৎসুক হয়ে উঠলুম। তিনি মুখ টিপে বললেন— মুরগী।

(এখানে উল্লেখযোগ্য যে, 'শনিবারের চিঠি'র মলাটে বিরাট এক মোরগের ছবি থাকতো।)

...রবীন্দ্রনাথ আমাদের উপর আরও চটিলেন। তাহার প্রকাশ হইল কার্তিকের 'বিচিত্রা'য় 'নবীন কবি' প্রবন্ধ। শনিবারের চিঠির প্রতি ইঙ্গিত করিয়া 'সাহিত্যিক মোরগের লড়াই' কথাটা তিনি ব্যবহার করিলেন।...

পূর্বের 'সজনে ফুল' ও 'মুরগী'র ঘা মনে ছিল, নতুন করিয়া সাহিত্যিক মোরগের উপমা তাহাতেই জ্বালা ধরাইয়া দিল। ইহারই লজ্জাকর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাইল ১১ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর ১৯৩১) অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র জয়ন্তীকে কেন্দ্র করিয়া ...আমরা 'জয়ন্তী সংখ্যা' প্রকাশ করিয়া কঠোর রবীন্দ্র-বিদূষণ করিয়া বসিলাম। শ্রী অমল হোম প্রমুখ রবীন্দ্র-জয়ন্তীর উদ্যোক্তারা লক্ষ্য হইলেও সরাসরি রবীন্দ্রনাথকেও আঘাত কম করিলাম না। ...মোটের উপর আমাদের প্রতিহিংসা শালীনতার সীমা লঙঘন করিয়া গেল।

দার্জিলিংয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নজরুলের সাক্ষাৎ হয় ১৯৩১-এর জুনে। এই সাক্ষাৎ নিয়ে লেখা নজরুলের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বরের বা ১৩৩৮-এর আশ্বিনের স্বদেশ পত্রিকায়।

জীবনানন্দের ক্যাম্পে প্রকাশিত হয় ১৩৩৮-এর মাঘের পরিচয়ে। সজনীকান্ত 'ক্যাম্পে' নিয়ে জীবনানন্দকে আক্রমণ করেন ১৩৩৮-এর মাঘে বা ১৯৩২-এর জানুয়ারীতে।

জীবনানন্দ সজনীকান্তের আক্রমণের জবাব লিখেছিলেন ১৯৩২-এ।

এটা সহজেই বোঝা যায় যে, জীবনানন্দ তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতার আক্রমণের উত্তরে যে জবাব লিখেছিলেন, তাতে 'সজনে গাছ' হ'ল সজনীকান্ত দাস। আর তিনি এই 'সজনে গাছ' নিয়েছিলেন *স্বদেশ*-এ নজরুলের লেখা পড়েই।

সজনে গাছ, মুরগী, সাহিত্যিক মোরগের লড়াই রবীন্দ্রনাথের এই কথা ক'টির জন্য সজনীকান্ত তখন তাঁর *শনিবারের চিঠি*-র রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যায় শালীনতার সীমা লঙঘন করেই রবীন্দ্রনাথকে আক্রমণ করেছিলেন।

আমার অনুমান, জীবনানন্দ তাঁর এই আলোচ্য লেখায় সজনীকান্তকে সজনে গাছ বলে লিখলেও *শনিবারের চিঠি*-র রবীন্দ্র-জয়ন্তী সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের প্রতি সজনীকান্তের প্রতিহিংসার কথা পড়ে অথবা শুনে তাঁর এই 'ক্যাম্পে'-র প্রতিবাদ প্রবন্ধ ছাপাতে সাহস করেননি।

জীবনানন্দ তাঁর লেখায় কলেজীয় কবিতা যুদ্ধের কথা উল্লেখ করে কয়েকটি কথা বলেছেন।

১২৬০ সালের ২৪শে বৈশাখ তারিখে কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র দ্বারকানাথ অধিকারী ঈশ্বর গুপ্তের *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় 'অদ্ভুত স্বপ্ন' নামে একটি কবিতা লেখেন। এই কবিতায় তিনি *সংবাদ প্রভাকর*-এর অপর দুই লেখক হুগলী কলেজের ছাত্র বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হিন্দু কলেজের ছাত্র দীনবন্ধু মিত্রকে আক্রমণ করেন। এইভেই কলেজীয় কবিতা যুদ্ধের সূত্রপাত হয়। দ্বারকানাথের কবিতা প্রকাশের পর ১২৬০ সালের ১৩ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের *সংবাদ প্রভাকর*-এ দীনবন্ধু মিত্র তার উত্তর দেন। দু মাস পরে ১১ই শ্রাবণ তারিখের সংবাদ প্রভাকরে দ্বারকানাথ আর একটি কবিতা প্রকাশ করে কবিতা যুদ্ধের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু করেন। ২৬শে শ্রাবণের সংবাদ প্রভাকরে দীনবন্ধু আবার দ্বারকানাথের কবিতার উত্তর দেন।

দ্বারকানাথের প্রথম কবিতায় প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি আক্রমণ থাকলেও বঙ্কিমচন্দ্র এ পর্যন্ত এই কবিতাযুদ্ধে অবতীর্ণ হননি ; শেষে ১২৬০ সালের ১২ই আশ্বিন তারিখের *সংবাদ প্রভাকর*-এ 'বিষম বিচিত্র নাটক' নামে একটি কবিতা লিখে দ্বারকানাথ অধিকারীর কবিতার উত্তর দেন।

এই হ'ল কলেজীয় কবিতা যুদ্ধ।

জীবনানন্দ তাঁর লেখায় কলেজীয় কবিতা যুদ্ধের কথা বললেও তাঁর এই লেখার সঙ্গে আসল কলেজীয় কবিতা যুদ্ধের খাপ খায় না। কারণ সজনীকান্ত তো সমালোচনা করেছেন জীবনানন্দের কবিতার, আর সে লেখা কলেজীয় কবিতা যুদ্ধের ন্যায় কবিতায় নয়, নিছক পরিষ্কার গদ্যে।

জীবনানন্দ লিখেছেন, বাংলাদেশের সব কবিই ঐ কলেজীয় কবিতা যুদ্ধের আওতায় পড়েননি। অর্থাৎ সজনীকান্তের আক্রমণের মধ্যে আসেননি। তিনিও যদি ওঁদের মতো এই আক্রমণের বাইরে থাকতে পারতেন, তাহলে তাঁর জীবন সুগম পথে চিন্তা লেশ শূন্যতার অপরূপ উল্লাসের হ'ত।

দেখা যাচ্ছে, জীবনানন্দ সজনীকান্তের আক্রমণে অত্যন্ত বিব্রত হতেন এবং অশান্তিও ভোগ করতেন। যে সব কবি সজনীকান্তের দ্বারা আক্রান্ত হতেন না, জীবনানন্দ তাঁদের মতোই শান্তি চাইছিলেন।

হাওড়া গার্লস কলেজে

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনার কাজ পান এবং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই কলেজের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন।

জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজে যোগদান করার বছর খানেক আগে, ১৩৫৯ সালের শ্রাবণ মাসে সিগনেট প্রেস থেকে তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতার বইটি প্রকাশিত হয়ে বহুল ভাবে প্রচারিত হয়েছিল। তার ফলে ঐ কলেজের বহু ছাত্রী এবং অনেক অধ্যাপক-অধ্যাপিকাও তখন *বনলতা সেন* বইটি পড়েছিলেন। তাই জীবনানন্দ এই কলেজে কাজ নেওয়ার আগে থেকেই তাঁর কবিতার মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে এখানকার অনেকেরই একটা পরিচিতি ঘটে গিয়েছিল এবং জীবনানন্দ কলেজে যোগ দিলে তাঁকে এখানকার সকলেই সসম্মানে গ্রহণ করেছিলেন।

জীবনানন্দ এখানকার অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকার সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যান। এবং তিনিও অল্পদিনের মধ্যে এঁদের সকলের সঙ্গেই বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কলেজে প্রফেসার্স রুমে অবসর সময়ে সকলের সঙ্গে কথাবার্তায় এবং তাঁদের হাস্য-পরিহাসেও যোগদান করতেন। বহু অধ্যাপকের আমন্ত্রণে তিনি তাঁদের বাড়িতে যেতেন, আবার তাঁরাও তাঁর বাড়িতে আসতেন।

একদিকে কলেজের সহকর্মীদের সহৃদয় ব্যবহারে তিনি যেমন মুগ্ধ হয়েছিলেন, অপরদিকে ছাত্রীদেরও শান্ত, নম্র ও তাঁর প্রতি গভীর সশ্রদ্ধ আচরণে তিনি অত্যন্ত প্রীত হয়েছিলেন। আর সরোবর এবং বহু বৃক্ষ পরিশোভিত কলেজের মনোরম পরিবেশটিও তাঁর কবি মনকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। ফলে এখানে এসে তিনি মনের অপার শান্তিতে প্রাণ খুলে ক্লাসে পড়াতেন। তাঁর পড়ানোয় ছাত্রীরাই শুধু সন্তুষ্ট হয়নি, স্বয়ং অধ্যক্ষও সন্তুষ্ট হয়ে অল্প কয়েকদিন পরেই তাঁকে সহকারী অধ্যক্ষ করতে মনস্থ করেন।

জীবনানন্দকে সহকারী অধ্যক্ষ করার প্রস্তাব দিলে তিনি কিন্তু রাজি হননি। বলেছিলেন— আর না, বেশ আছি।

হঠাৎ মৃত্যু এসে তাঁকে ছিনিয়ে না নিলে, তিনি বাকি জীবনটা পরম শান্তিতেই এখানে অধ্যাপনা করে কাটাতে পারতেন। তিনি এখানে এক বছর কয়েক মাস মাত্র অধ্যাপনা করতে পেরেছিলেন।

হাওড়া গার্লস কলেজে জীবনানন্দের অধ্যাপনার কথা প্রসঙ্গে ওখানকার তাঁর সহকর্মী বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) লিখেছেন :

> এই কলেজে তাঁহার অবস্থান মাত্র এক বৎসর কয়েক মাস।
> ...আমাদের কলেজের এই শ্যাম-স্নিগ্ধ পরিবেশ, নিতান্তই আত্মীয়সুলভ সৌজন্য-পরিপ্লুত হৃদ্য ব্যবহারে তাঁহার অন্তরবাসী ঘরোয়া মানুষটি যেন ধীরে ধীরে অহংতন্মাত্রের নির্মোক ত্যাগ করিয়া সাধারণত্বের মনোভূমিতে নামিয়া আসিতে ছিল।

অসিতবাবু তাঁর এই প্রবন্ধে জীবনানন্দকে তাঁদের 'হাস্য-পরিহাসের অংশভাগী' এবং 'বন্ধুবৎসল ও ইংরাজি সাহিত্যের কৃতী অধ্যাপক' বলেও বর্ণনা করেছেন।

এই কলেজে জীবনানন্দের আর এক সহকর্মী দর্শন বিভাগের অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষও তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন :

> হাওড়া গার্লস কলেজের পরিবেশে তিনি পেলেন, তাঁর রম্য সুর, কাম্য সহযোগ। অধ্যাপনায় যে এত রস আছে, কলেজের আঙ্গিনায় নবীন জীবন প্রবাহের সান্নিধ্য যে এত প্রাণবন্ত তা উপলব্ধি করলেন নতুন ভাবে। শত শত ছাত্রীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার প্রেক্ষিতে তিনি নিজেকে অনবদ্যরূপে ফুটিয়ে তুলতে লাগলেন অধ্যাপনার মাধ্যমে। অল্প দিনের মধ্যে তিনি কলেজকে ভালবেসে ফেললেন।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর কলেজের অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যও এই কলেজে তাঁর অধ্যাপনা সম্বন্ধে লিখেছিলেন :

> মাসের পর মাস চলে গেছে। কলেজের সঙ্গে তাঁর আন্তরিক প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়ে গেল। গত ছুটির পূর্বে পরীক্ষার সময় কথায় কথায় জানিয়ে দিলেন যে গার্লস কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রীদের বড় ভাল লেগেছে তাঁর। কলেজের মধ্যে একটা আত্মীয়তার পরিবেশ তাঁকে অভিভূত করেছে। বুঝলাম যে, তিনি কলেজকে ভাল বেসেছেন। কলেজের অধ্যাপকমণ্ডলীর প্রত্যেকেই তাঁকে ভালবাসতেন।

কলেজে জীবনানন্দের কাজে ও ব্যবহারে শুধু অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক-অধ্যাপিকারাই যে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন তা নয়, যাদের তিনি পড়াতেন সেই ছাত্রীরাও যে তাঁর পড়ানোর কিরূপ মুগ্ধ হয়েছিল তার দু-একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

হাওড়া গার্লস কলেজে জীবনানন্দের তখনকার ৪র্থ বার্ষিক শ্রেণীর এক ছাত্রী প্রীতি চট্টোপাধ্যায় জীবনানন্দের কাছে পড়ার কথায় লিখেছিলেন :

> মুখের উপর বিরাট গাম্ভীর্য, চোখে জ্ঞানের গভীরতা, সমস্তটা মিলিয়ে একটা সম্ভ্রম জাগায়। র‍্যালের একটি দুর্বোধ্য প্রবন্ধ তিনি পড়াচ্ছিলেন। অবাক হয়ে গেলাম তাঁর পড়ানোর পদ্ধতিতে। প্রতিটি কথাকে তিনি বিভিন্ন ইংরাজিতে সাত কি আট বার

বলেছিলেন আমাদেব বোঝাবার জন্য। অপূর্ব তাঁব পড়ানো, চেষ্টা কবেও কেউ অন্যমনস্ক হযে যেতে পাববে না। তাঁর আকর্ষণীয় বাক্‌ভঙ্গি সবিয়ে আনবে তাকে অন্যমনস্কতা থেকে। চমক ভাঙ্গলো, বেজিষ্টার হাতে উঠে দাঁড়ালেন। তারপর বেরিয়ে গেলেন ক্লাস হতে। কখন ঘণ্টা পড়ে গিয়েছে, জানতে পারিনি; কোন্ এক কল্পনার রাজ্যে চলে গিযেছিলাম তাঁর বক্তৃতার মাঝ দিয়ে। বক্তৃতার শেষে আবার আমাকে ফিরিয়ে আনলো এই বাস্তব পবিবেশে।...

বড় আশ্চর্য তাঁর চরিত্র, কোনোদিনের জন্যও তিনি নিজের কথা কিছুই বলতেন না। তিনি যে কবিতা লেখেন, এ কথাও কোনো দিন তাঁর কাছ থেকে শুনতে পাইনি। ...লক্ষ্য করতাম, ক্লাসে পড়াবার সময তিনি হাতের একটি বিশেষ ভঙ্গি করতেন। সেই বিশিষ্ট ভঙ্গিমা আমি আর কারুর দেখিনি। আর বিস্মিত হতাম তাঁর বক্তৃতা দেবার ক্ষমতায়, তাঁব সুগম্ভীব স্বব যখন সমস্ত ক্লাসের মাঝে ছড়িয়ে গিয়ে আবার তা প্রতিধ্বনিত হযে এক অপূর্ব রহস্যময আবহাওয়ার সৃষ্টি করতো।...

ছুটিব পব ক্লাস আরম্ভ হযে গেল, বার্ষিক পরীক্ষার পর। তিনি আমাদের গল্‌সওয়ার্দির 'জাস্‌টিস' শুরু কবে দিলেন। জাস্‌টিস আবম্ভ হবার আগে আমরা একদিন তাঁর কাছে গল্প শুনতে চাইলাম। তিনি বললেন— 'তোমাদের এখন ফোর্থ ইয়ার, এখন আর গল্প বলার সময় নেই।' আমরা ছাড়লাম না, তখন তিনি কৌশলে জাস্‌টিস-এর গল্পটা আমাদের শুনিয়ে দিলেন। গল্‌সওয়ার্দি সম্বন্ধে তিনি সেদিন আমাদের কাছে অনেক কথা বলেছিলেন। বিশেষ গল্‌সওয়ার্দি যে পরিপ্রেক্ষিতেব ওপর জাসটিস্ লিখেছিলেন সেই সম্বন্ধে।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীরই আর এক ছাত্রী বকুল মজুমদার লিখেছেন :

বাংলা সাহিত্যের কবি ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক— প্রথমটা একটু বিস্ময়কর মনে হয়েছিল ছাত্রীদের— কিন্তু তাঁর পড়াবার ভঙ্গিটি দেখে তাবা খুশি না হয়ে থাকতে পারেনি।

কবি আরম্ভ করলেন, বিখ্যাত সাহিত্যিক স্যার ওয়াল্টার র‍্যালের প্রবন্ধ 'দি ইনফ্লুয়েন্স অব্ দি ইংলিশ ভয়েজেস অব্ দি সিক্সটিন্‌থ সেনচুরি অন্ পোয়ট্রি অ্যাণ্ড ইমাজিনেশন'— কবি-কণ্ঠ ভেসে গেল বহু দূরে— সহজ সরল হয়ে গেল ছাত্রীদের মনে খটমট প্রবন্ধের প্রত্যেকটি ভাষা। কবির দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত হ'ল তাঁরই রূপ প্রকাশে। তাঁর হস্ত উত্তোলনের মধ্যেও যেন সহজ হয়ে গেল কুয়াশাচ্ছন্ন ইংরাজি সাহিত্যের ভাব...

ছাত্রীদের সাথে প্রয়োজনের বেশি একটি কথাও তিনি কোনোদিনই বলেননি। ক্লাসে পড়া বোঝাবার সময় কোনো ছাত্রী মনে হয় এতটুকুও অন্যমনস্ক হ'ত না ; জানি না এটা তাঁর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শের গুণ না তাঁকে শ্রদ্ধা করার জন্য। তিরস্কার পাওয়া তো দূরের কথা— এমন কি উপদেশের নীরস নীতি কথাও তাঁর কাছ থেকে কেউ কোনোদিন পায়নি।

এঁদের এইসব লেখা থেকেই শুধু নয়, জীবনানন্দ যখন ঐ কলেজে পড়াতেন তখন স্বয়ং অধ্যক্ষের মুখ থেকেও আমি জীবনানন্দের পড়ানোর সুখ্যাতি শুনেছি। অধ্যক্ষের মুখে জীবনানন্দের এই প্রশংসা শুনে আমি তখন মনে মনে একটু গর্ব বোধ করতাম। কারণ, এই কলেজে জীবনানন্দের অধ্যাপকের কাজটা পাওয়ার ব্যাপাবে আমি অনেকটা যুক্ত ছিলাম। বইয়ে অন্যত্র এ সম্বন্ধে বলেছি।

হাওড়া গার্লস কলেজে ঢুকে সহকর্মীদেব সহৃদয় ব্যবহারে এবং ছাত্রীদেরও তাঁর প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় জীবনানন্দ মনে-প্রাণে সত্যিকারের এক অপার আনন্দ ও শান্তি লাভ করেছিলেন। তাই এতদিন নানা দুর্যোগের মধ্যে প'ড়ে তাঁর সাহিত্য-সাধনায় যেটুকু ভাটা পড়েছিল, তা আবার নতুন করে পুরো উদ্যমে শুরু হ'ল। শুধু কবিতাই নয়, এই সময় তিনি গল্প-উপন্যাসও লিখতে শুরু করলেন। এই সময় তাঁর মনে সাহিত্য সৃষ্টির যে প্রেরণা এসেছিল, সে সম্বন্ধে তাঁর ছোটভাই অশোকানন্দ দাশও লিখেছেন :

> তাঁর জীবনের শেষ দুটি বৎসর তাঁব হৃদযে প্লাবন এসেছিল, অনেক কিছু লিখবাব জন্য মন প্রস্তুত হযেছিল।

সাতটি তারার তিমির ও শ্রেষ্ঠ কবিতা

হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনা কালেই জীবনানন্দের নির্বাচিত কবিতার সংকলন গ্রন্থ *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা* নামে কলকাতার নাভানা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এর পাঁচ ছয় বছর আগে ১৩৫৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে তাঁর সাতটি *তারার তিমির* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই *তারার তিমির*-এর প্রকাশক ছিলেন 'গুপ্ত, রহমান অ্যাণ্ড গুপ্ত' প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আতাওয়ার রহমান। এঁদের প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ছিল কলকাতায় গণেশচন্দ্র এভিনিউয়ে। এইখানেই ছিল *চতুরঙ্গ* পত্রিকার অফিস। হুমায়ুন কবির *চতুরঙ্গ*-এর সম্পাদক ছিলেন। তবে কাগজ দেখাশুনা করতেন এই আতাওয়ার রহমান সাহেবই।

জীবনানন্দ তাঁর *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন হুমায়ুন কবিরকে। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন— হুমায়ুন কবির— বন্ধুবরেষু। এই বইয়ে কবিতা ছিল মোট ৪০টি। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর *ধূসর পাণ্ডুলিপি* ও *মহাপৃথিবী* গ্রন্থের মতো এতে কিন্তু কোনো নতুন কবিতা সংযোজন করা হয়নি। অবশ্য প্রকাশক বদল হয়েছেন। *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থের কবিতাগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে জীবনানন্দ বলেছেন— রচনাকাল ১৩৩৫— ১৩৫০ সাল।

১৩৫০ সালে বাঙ্গলা দেশে দুর্ভিক্ষ ও মহামারী দেখা দেয়। আর ১৩৫০-এর তিন চার বছর আগে থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও চলে আসছিল। তাই এই গ্রন্থের অনেক কবিতাও বাঙ্গলার দুর্ভিক্ষ, মহামারী এবং বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা। জীবনানন্দ মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধের লোকক্ষয়ে অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন।

এই গ্রন্থের কয়েকটি কবিতার ন্যায় এই বইয়ের নামকরণের ব্যাপারেও আমরা তাঁর ঐ ব্যথার আভাস পাই। জীবনানন্দ তাঁর এই বইয়ের নামকরণে বলেছেন— তারার তিমির। এখন এ সম্বন্ধে কিছুটা আলোচনা করা যাক—

আমরা যেমন বলি চাঁদের আলো, তেমনি বলে থাকি তারা বা নক্ষত্রেরও আলো। চাঁদের অন্ধকার বা তিমির যেমন আমরা বলি না, তেমনি তারার অন্ধকার বা তিমিরও বলি না। কিন্তু জীবনানন্দ বলেছেন— তারার তিমির। জীবনানন্দ এ কথা বললেও— তারার তো আর তিমির কখনই হয় না। তারার আলো মিটমিটে বা অনুজ্জ্বল হতে পারে, কিন্তু সে তো তারার অন্ধকার নয়, তারার আলোই।

যাই হোক, জীবনানন্দ তবে এ কথা বললেন কেন? তিনি কি এ নাম অর্থহীন হিসাবেই ব্যবহার করেছেন? আমার তো মনে হয়, মোটেই তা নয়। একটা বিশেষ গভীর অর্থে তিনি ইচ্ছা করেই এ কথাটা বলেছেন। তাঁর সেই অর্থের ইঙ্গিতটা মনে হয় এই—

জীবনানন্দ তাঁর বইয়ের নাম করেছেন, *সাতটি তারার তিমির*। এই সাতটি তারা অর্থে তিনি যে সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারাকে লক্ষ্য করে বলেছেন তা সহজেই অনুমান করা যেতে পারে। উত্তর আকাশে বৃহৎ ভল্লুকাকারে বা লাঙ্গলাকারে অবস্থিত সাতটি নক্ষত্রই হ'ল— সপ্তর্ষিমণ্ডল। ভারতীয় জ্যোতিষীরা প্রাচীন ভারতের সাতজন বিশিষ্ট ঋষির নামানুসারে এই নক্ষত্রগুলির নামকরণ করেছেন। ঐ সাতজন ঋষি হলেন— মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু ও বশিষ্ঠ।

প্রাচীন ভারতের এই সাতজন ঋষির নামাঙ্কিত তারাগুলি ভারতের মাথার উপর উত্তর আকাশে থেকে আমাদের দীর্ঘকাল ধরে আলো দিয়ে আসছে অর্থাৎ আমরা ভারতীয়রা এই বিশিষ্ট ঋষিদের জীবন কথা ও কর্মের কথা থেকে দীর্ঘ দিন ধরে জ্ঞান লাভ করে আসছি।

সাতটি তারার তিমির গ্রন্থের কবিতাগুলো আগের লেখা হলেও এ বইটি যখন ছাপা হয় অর্থাৎ ১৯৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তখন দেশের অবস্থা ছিল এই— দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দু-তিন বছর আগে শেষ হলেও, তার জের তখনও বিশ্বময়। বাঙ্গলা দেশের উপর দিয়ে ১৩৫০-এ যে মহামন্বন্তর বয়ে যায়, তারও ক্ষত তখনও মোছেনি। আর সর্বোপরি এই সময়েই ভারতে ঘটে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভীষণ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং ব্যাপক হত্যা, লুণ্ঠন, অগ্নি-সংযোগ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশ বিভাগ। দেশ বিভাগ হওয়ার পরে ১৯৪৭।৪৮ খ্রীষ্টাব্দেও সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা এদিকে ওদিকে লেগেই থাকে। এতে ভাবুক কবি জীবনানন্দ খুবই ব্যথিত হয়েছিলেন।

আমরা ভারতীয়রা যে সপ্ত ঋষির কাছ থেকে এতদিন জ্ঞান বা আলো পেয়ে আসছিলাম, এখন অর্থাৎ এই গ্রন্থটি প্রকাশের সময় জীবনানন্দ দেখলেন, সপ্ত ঋষির জ্ঞান বা আলো আমাদের মধ্যে আর নেই, আমরা ঐ ঋষিদের অর্থাৎ ঐ তারামণ্ডলীর আলো আর অনুভব করছি না, করছি ঘোর অন্ধকার। তাই তিনি বইয়ের নাম দিলেন— *সাতটি তারার তিমির*।

হিন্দু হই, আর মুসলমানই হই, আমরা সকলেই ভারতীয়। প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ ভুলে আমরা এই সময় হিংসায় উন্মত্ত হয়েছিলাম। নিজেদের মধ্যে এই হাঙ্গামা ও বিভেদে জীবনানন্দ মর্মাহত ও ব্যথিত হয়েছিলেন।

তিনি বইয়ের নাম দিয়েছেন তারার তিমির। আর তিনি কি হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বা প্রীতির নিদর্শন হিসাবে এই বইও তাই মুসলমান বন্ধু হুমায়ুন কবিরকেই উৎসর্গ করেছিলেন?

জীবনানন্দের *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থটির নামকরণের কথা বলতে গিয়ে এই

সঙ্গে তাঁর অন্যান্য বইগুলোর নামকরণের কথাও মনে আসছে। সে সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলছি—

আমরা মহাসমুদ্র ও মহাকাশ বলে থাকি, কিন্তু মহাপৃথিবী বড় একটা বলি না। জীবনানন্দ হয়ত ভেবেছিলেন— মহাসমুদ্র ও মহাকাশ যদি হয়, মহাপৃথিবী হবে না কেন? এই ভেবেই হয়ত তিনি তাঁর গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন— মহাপৃথিবী। মহাপৃথিবী অর্থে তিনি নিঃসন্দেহে সাগর ও 'আকাশের মতো পৃথিবীরও বিশালত্বই বোঝাতে চেয়েছেন। আর তিনি এও বোঝাতে চেয়েছেন যে, এই মহাপৃথিবীতে সুখ দুঃখ, ভাল মন্দ, হাসি অশ্রু সবই রয়েছে। তাই আমরা জীবনানন্দের মহাপৃথিবী গ্রন্থে আশা নিরাশা, শান্তি অশান্তি প্রভৃতি সব সুরেরই কবিতা দেখি।

জীবনানন্দের *ধূসব পাণ্ডুলিপি*-র নামকরণে ধূসর শব্দ দেখে অনেকেই বলে থাকেন, জীবনানন্দ যে ধূসরতার কবি তা তাঁর গ্রন্থের নামকরণ থেকেও জানা যায়।

জীবনানন্দ তাঁর অনেক কবিতায় ধূসর বর্ণের কথা বলেছেন সত্য, কিন্তু তিনি তাঁব কবিতায় যেমন ধূসর বর্ণের কথা বলেছেন, তেমনি নীল, সবুজ, লাল, সোনালী, সাদা, বেগুনি, পাটকিলে প্রভৃতি নানা রঙের কথাও উল্লেখ করেছেন। নীল ও সবুজ রঙেব কথা ববং তিনি ধূসর রঙের চেয়ে বেশি বারই উল্লেখ করেছেন। অতএব তিনি যে ধূসরতার বা ধূসর বর্ণ-প্রিয় কবি তা মোটেই নয়। তিনি সকল বর্ণের এবং ধূসব নয়, বরং অনেক উজ্জ্বল বর্ণেরই কবি। আর তাছাড়া ধূসর পাণ্ডুলিপি নামকরণ করেছেন বলেই বা তিনি ধূসরতাব কবি হবেন কেন? তিনি তাঁর এ বইয়ের ভূমিকায় তো একরূপ পরিষ্কারই বলেছেন— পাণ্ডুলিপিগুলো অনেক দিন পড়ে থেকে ধূসর বর্ণের হয়ে এসেছিল বলেই বই এর এই নাম দিয়েছেন।

জীবনানন্দ তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থের যে নামকরণ করেছেন— *ঝরা পালক*, এর কারণ মনে হয়, ঐ গ্রন্থের অনেকগুলি কবিতায় তিনি নিরাশা, হতাশা বা ব্যর্থতার কথা বলেছেন বলেই হয়ত ঐরূপ নামকরণ করেছিলেন। অবশ্য অন্য কারণও থাকতে পারে।

কবিতা ভবন থেকে প্রকাশিত এবং সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত উভয় *বনলতা সেন* গ্রন্থেরই জীবনানন্দ নামকরণ করেছেন, তাঁর বিখ্যাত 'বনলতা সেন' কবিতাটির নাম দিয়ে। তিনি এইভাবে কোনো কবিতার নাম নিয়ে, তাঁর আর কোনো কাব্য-গ্রন্থে নামকরণ করেননি।

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থটি বেরোয় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বা ১৩৬১ সালের বৈশাখে। জীবনসনন্দ এই গ্রন্থের যে ভূমিকা লিখেছেন, তাতে তিনি বলেছেন— আমার ৫ খানা কবিতার বই থেকে নির্বাচিত কিছু কবিতা নেওয়া হয়েছে। আর আছে, কিছু প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত নতুন কবিতা। — এ বই প্রকাশিত হয় কলকাতার নাভানা প্রেস থেকে।

জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থের পরের সংস্করণ কবিতার সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া

হয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত তাঁর *রূপসী বাংলা* ও *বেলা অবেলা কালবেলা* গ্রন্থ দুটি থেকে কিছু কবিতা এবং কোনো কোনো পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি কবিতা এতে সংযোজন করা হয়েছে।

জীবনানন্দ তাঁর *শ্রেষ্ঠ কবিতা* গ্রন্থের জন্য যে ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, সেইটাই পরের সংস্করণেও প্রথমেই দেওয়া আছে। এই লেখার মাথায় ১ম সংস্করণের ভূমিকা বা শুধু ভূমিকা কিছু লেখা নেই। আগেই বলেছি জীবনানন্দ তাঁর এই লেখায় বলেছেন— আমার ৫ খানা কবিতার বই থেকে কবিতা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ৫ খানা নয় ৭ খানা বই থেকে কবিতা নেওয়া হয়েছে। সূচীপত্রে এর তালিকা দেওয়া হয়েছে। তাই প্রথমেই জীবনানন্দের ভূমিকাটি পড়ে সূচীপত্রের দিকে দেখলেই পাঠক-পাঠিকাদের মনে একটু খটকা লাগতে পারে। আমার মনে হয়, ১ম সংস্করণের পরে জীবনানন্দের আরও যে যে বই থেকে বা অন্যত্র যেখান থেকে নতুন কবিতা এতে যোগ করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে প্রকাশকের একটা নিবেদন বা বক্তব্য থাকা ভাল। আর জীবনানন্দের লেখাটার মাথায় ১ম সংস্করণের ভূমিকা লিখে দেওয়াও যেতে পারে।

বাঙ্গলা গদ্য ও ইংরাজি রচনা

জীবনানন্দ শুধু কবিতাই লিখতেন না, তিনি বাঙ্গলার প্রচুর চিন্তাশীল প্রবন্ধও লিখে গেছেন। তবে তাঁর লেখা এই সব প্রবন্ধ বেশির ভাগই সাহিত্য ও শিক্ষা সংক্রান্ত। আবার সাহিত্য সংক্রান্তগুলির মধ্যে অধিকাংশই কবিতা বিষয়ক। নিজে কবি এবং শিক্ষক ছিলেন বলেই— সাহিত্য তথা কবিতা ও শিক্ষা সম্বন্ধে যখন যা চিন্তা করেছেন, সুযোগ পেলে তাকেই প্রবন্ধে রূপ দিয়েছেন।

জীবনানন্দ সাধারণভাবে কবিতার বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেকগুলি প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। তিনি কখন কখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা এবং নজরুলের কবিতা নিয়েও আলোচনা করেছেন। যেমন— জীবনানন্দ যখন বরিশালে বি. এম. কলেজের অধ্যাপক, তখন ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগষ্ট তারিখে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু হ'লে বি. এম. কলেজের ছাত্র ও অধ্যাপকরা মিলে কলেজে এক রবীন্দ্র স্মরণসভা করেছিলেন। সভার উদ্যোক্তারা 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' সম্বন্ধে কিছু বলবার জন্য জীবনানন্দকে অনুরোধ করেছিলেন। জীবনানন্দ এঁদের অনুরোধে 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' নামে একটি প্রবন্ধ লিখে তখন ঐ সভায় পাঠ করেছিলেন।

১৩৫১ সালের পৌষ সংখ্যা *কবিতা* পত্রিকা নজরুল সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হ'লে তা'তে সম্পাদকের অনুরোধে জীবনানন্দ তখন নজরুলের কবিতার উপর একটা প্রবন্ধ লিখে দিয়েছিলেন।

জীবনানন্দ বন্ধু-বান্ধব ও স্নেহভাজনদের কবিতার বই-এর উপরও সমালোচনা প্রবন্ধ লিখেছেন। যেমন, বুদ্ধদেব বসুর *কঙ্কাবতী* গ্রন্থের উপর একটা সমালোচনা লিখেছিলেন। সেটি ১৩৪৪ সালের পৌষ মাসের *কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। আর একবার তাঁর পরিচিত কিরণশংকর সেনগুপ্তর একটা কবিতা বইয়ের-ও সমালোচনা লিখে দিয়েছিলেন।

বন্ধু-বান্ধব বা স্নেহভাজনরা অনুরোধ করলেই যে অমনি তাঁদের বই সম্বন্ধে কিছু লিখে দিতেন, তা মোটেই নয়। বই ভাল না লাগলে বা পছন্দ না হ'লে একটা কথাও লিখতেন না। এ সম্বন্ধে একটা ঘটনা বলছি :

> একবার জীবনানন্দের বিশেষ পরিচিতা এক লেখিকা ভদ্রমহিলা তাঁর লেখা একটা বই জীবনানন্দকে দেন। দিয়ে বইটা সম্বন্ধে কিছু লিখে দিতে অনুরোধ করে যান।

ভদ্রমহিলার অনুরোধ থেকে জীবনানন্দ এটুকু বুঝেছিলেন যে, প্রশংসাসূচক লেখাই তিনি চাইছেন। কিন্তু বই হাতে করে দু-চার লাইন পড়েই জীবনানন্দ টের পেয়ে ছিলেন যে, এ বইয়ের প্রশংসা করার কিছুই নেই। তাই কিছু না লিখে বইটা বাড়িতে টেবিলের উপর ফেলে রেখেছিলেন।

জীবনানন্দ ঐ সময় বড়িযা কলেজে অধ্যাপনা করতেন। একদিন ঐ কলেজের এক অধ্যাপক নিরঞ্জন চৌধুরী সেই সময় জীবনানন্দের বাড়িতে আসেন। এসে জীবনানন্দের টেবিলের উপর সেই বইটা দেখে বললেন— এ বই আপনার এখানে?

জীবনান্দ বললেন— এই বইয়ের লেখিকা আমার পরিচিতা। ধবেছেন, বইটা সম্বন্ধে কিছু লিখে দিতে হবে। আপনি বইটা পড়েছেন?

— পড়েছি। অশ্লীল বই।

— তবে আর না। লিখে দেওয়া তো দূরের কথা, ও বই বাড়িতেই আর রাখব না। এবার এলে বই ফিরিয়ে দেব।

এই কাহিনী আমি নিরঞ্জনবাবুর কাছ থেকে শুনেছি। নিরঞ্জনবাবু লেখিকা ভদ্রমহিলার নাম এবং তাঁর বইটারও নাম আমাকে বলেছিলেন।

জীবনানন্দের শিক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ দেশ, বসুমতী প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

জীবনানন্দ শুধু কবিতা ও প্রবন্ধই নয়, গল্প-উপন্যাস বচনায়ও শেষ জীবনে হাত দিয়েছিলেন। এমন কি একটি আত্মজীবনী লিখবারও মনস্থ করেছিলেন। জীবনানন্দ শেষ জীবনে গল্প-উপন্যাস লিখতে শুরু করলেও, ঔপন্যাসিক হবার ঝোঁক তাঁর অনেক দিনের। একবার তিনি এ নিয়ে একজনকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন— 'ছেলেবেলা থেকে গল্প উপন্যাস স্বদেশী ও বিদেশী— নেহাৎ কম পড়িনি। ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচেনি।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর কয়েকটি গল্প, উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে;

জীবনানন্দ যেমন বাঙ্গলার প্রধানত সাহিত্য ও শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন, তেমনি ইংরাজিতেও তিনি এই সব বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর এই সব প্রবন্ধ সাধারণত *স্টেট্‌সম্যান, হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড* প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ত। যেমন— ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর তারিখের *স্টেট্‌সম্যান* পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বেঙ্গলি পোয়ট্রি টু-ডে' এবং ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বরের *হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড*-এ প্রকাশিত হয় 'দি বেঙ্গলি নভেল টু-ডে' নামক প্রবন্ধ।

'কলেজ জীবন' অধ্যায়ে বলেছি, জীবনানন্দ কলেজে পড়ার সময় ইংরাজি কবিতা লিখতেন। তাঁর তখনকার লেখার খাতা খুঁজতে গিয়ে জীবনানন্দের ছোটভাই অশোকানন্দ দুটি পোকায় কাটা খাতা পেয়েছিলেন। তাতে কীটদষ্ট কয়েকটি ইংরাজি কবিতা তিনি দেখতে পান। এরপর পরিণত বয়সে জীবনানন্দ ক্বচিৎ কখন ইংরাজিতে

কবিতা লিখেছেন। বুদ্ধদেব বসু তাঁর *কবিতা* পত্রিকায় একবার অবাঙ্গালী ভারতীয় ও বিদেশীদের জন্য বাঙ্গালী কবিদের রচিত বা অনূদিত কিছু ইংরাজি কবিতা প্রকাশ করেছিলেন। তাতে জীবনানন্দ তাঁর *বনলতা সেন* গ্রন্থের 'অন্ধকার' কবিতাটি নিজে ইংরাজিতে অনুবাদ করে দিয়েছিলেন। সেই কবিতা তখন ১৩৬০ সালের আষাঢ় মাসের *কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া জীবনানন্দ তাঁর আরও চারটি কবিতার ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন। সেই কবিতাগুলি হ'ল *বনলতা সেন* গ্রন্থের 'বনলতা সেন' ও 'বেড়াল' এবং *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থের 'মনোসরণি' ও 'নাবিক'।

প্রশংসা ও সম্মান

এমন শিক্ষিত বাঙ্গালী খুব কমই আছেন, যাঁরা কবি জীবনানন্দের নাম শোনেননি বা অন্তত তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতাটি পড়েননি। আজ জীবনানন্দের কবিতা স্কুলে পড়ানো হয়, তাঁর কাব্য বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বি. এ., এম. এ.-তে পাঠ্য। তাঁর কোনো কোনো কবিতায় সুর বসিয়ে গান হিসাবে গাওয়া হচ্ছে। আবৃত্তি সভায় আবৃত্তিকাররা তাঁর কবিতা আবৃত্তি করছেন। বিভিন্ন নৃত্য-সংস্থা তাঁর কোনো কোনো কবিতার নৃত্যরূপ মঞ্চস্থও করছেন। বিভিন্ন ভাষায় তাঁর কবিতার অনুবাদ হচ্ছে এবং বিদেশে সুদূর আমেরিকায়ও তাঁর জীবন ও কাব্য নিয়ে গবেষণা চলছে।

এখন দেশে বিদেশে কবি হিসাবে জীবনানন্দের এই যে খ্যাতি, তাঁর জীবিতকালে কিন্তু এ খ্যাতির প্রায় সব কিছুই ছিল না। অথচ তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনার প্রায় সবই তাঁর জীবিতকালেই প্রকাশিত হয়েছে। তখন তাঁর যেটুকু খ্যাতি বা সম্মান ছিল, তা কেবল কয়েকজন আধুনিক কবি ও মুষ্টিমেয় আধুনিক কবিতার পাঠকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এবং এঁরাই প্রধানত তাঁর জীবিতকালে তাঁকে যা সম্মান দেবার তা দিয়েছেন। যেমন, বুদ্ধদেব বসু ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য, এঁরা উভয়েই আধুনিক কবি বলেই জীবনানন্দের জীবিতকালে তাঁর কাব্য নিয়ে সপ্রশংস আলোচনা করেছেন এবং এঁদের নিজ নিজ সম্পাদিত পত্রিকায় জীবনানন্দের কবিতা সাদরে প্রকাশ করেছেন। এঁদের মতো আরও কয়েকজন তরুণ কবিও তখন তাঁদের নিজেদের কাগজে জীবনানন্দের কবিতা প্রকাশের জন্য তাঁর কাছে ধর্ণা দিয়েছেন। এই শেষোক্ত কবিরা জীবনানন্দের কবিতার ভক্ত তো বটেই, এমন কি এঁরা প্রায় সকলেই অল্প-বিস্তরভাবে জীবনানন্দের কবিতার ভাব, ভাষা, আঙ্গিক, উপমা প্রভৃতির অনুকারকও।

জীবনানন্দের জীবনের শেষ দিকে 'নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন' নামে একটি সংস্থা কলকাতায় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কয়েক দিন ধরে ররীন্দ্র-জন্মোৎসব পালন করতেন। এঁরা তখন এঁদের নির্বাচনে বছরের শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থের কবিকে একটা পুরস্কার দিতেন। এঁদের এই পুরস্কারের নাম ছিল— রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার। এই পুরস্কারের নগদ মূল্য ছিল— একশত টাকা। এই টাকার সঙ্গে এঁরা অবশ্য কবিকে একটা তসরের চাদর এবং একটা ডালায় করে কিছু ফল ও মিষ্টান্নও দিতেন।

১৩৫৯ সালে প্রকাশিত কবিতা গ্রন্থসমূহের মধ্যে জীবনানন্দের সিগনেট সংস্করণ *বনলতা সেন* গ্রন্থটি এঁদের বিচারে শ্রেষ্ঠ নির্বাচিত হওয়ায়, ১৩৬০ সালে রবীন্দ্র-

জন্মোৎসব পালনের সময় এই নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন, এঁদের রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার জীবনানন্দকে দিয়েছিলেন। জীবনানন্দই সর্বপ্রথম এঁদের এই পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

এ সম্পর্কে ১৩৬০ সালের ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখের *যুগান্তর* পত্রিকায়— আগের দিন অর্থাৎ ১লা জ্যৈষ্ঠ শুক্রবার তারিখে মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম দিনের কথায় লিখেছিলেন :

> নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন ১৯৫৩ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থের জন্য যে এক শত টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন, কবি শ্রীজীবনানন্দ দাশের কাব্য-গ্রন্থ বনলতা সেন নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি শ্রীঅতুল গুপ্ত কর্তৃক এ বৎসরের শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় ঐ পুরস্কার তাঁহাকে দান করা হইবে বলিয়া এই দিন ঘোষণা করা হয়।

এই নিয়ে পরের দিন ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখের যুগান্তরে, ২রা জ্যৈষ্ঠ তারিখের অনুষ্ঠানের কথা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

> নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত নয় দিন ব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব শনিবার সমাপ্ত হয়। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে কবি শ্রীজীবনানন্দ দাশকে নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক ১৯৫৩ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্য গ্রন্থের জন্য ঘোষিত একশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৯৫৩ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ বলে *যুগান্তর* ভুল করেছিলেন। কেন না, ১৩৬০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের গোড়ার দিকে হয় ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের মাঝামাঝি। অতএব ১৯৫৩ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্য-গ্রন্থ হতে পারে না। এটা হবে বঙ্গাব্দের হিসাবে ১৩৫৯ সালের শ্রেষ্ঠ কাব্য। রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনও এই হিসাবেই বিচার করেছিলেন। যুগান্তর এই সংবাদে জীবনানন্দের নাম লিখতে গিয়ে আর একটা ভুল করেছিলেন। সেটা জীবনানন্দের পদবীর বানানে দাশ না লিখে দাস লিখেছিলেন। আগে 'পদবী পরিবর্তন' অধ্যায়ে আমি দেখিয়েছি— লোকের এই অনিচ্ছাকৃত সামান্য ভুলের জন্যও জীবনানন্দ একটু ক্ষুণ্ণই হতেন।

২রা জ্যৈষ্ঠ শনিবার অপরাহ্নে মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত সভায় জীবনানন্দ স্বয়ং উপস্থিত থেকে এঁদের প্রদত্ত উপহারগুলি গ্রহণ করেছিলেন।

এঁদের দেওয়া এই পুরস্কারের অর্থ মূল্য যতই অল্প হউক না কেন, তবুও জীবনানন্দ এই সম্মান লাভ করে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন।

রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে তখন কয়েকজন আধুনিক কবি ছিলেন বলেই হয়ত জীবনানন্দের এই সম্মান লাভ হয়েছিল। কেন না এঁরা আধুনিক কবিদের সম্মান দেবার জন্যই এই পুরস্কারের প্রবর্তন করেছিলেন। তাই দেখি, এঁরা পরের বছরে কবি সুধীন্দ্র দত্তকেও তাঁর কাব্যের জন্য পুরস্কার দিচ্ছেন।

এই আধুনিক কবিদেরই উদ্যোগে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ও ২৯শে জানুয়ারি কলকাতার সিনেট হলে (সেই হল আজ আর নেই, সেখানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুতলা-বিশিষ্ট বাড়ি হয়ে সেই বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার স্থানান্তরিত হয়েছে) যে কবি সম্মেলন হয়েছিল, তাতে এঁরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করবার জন্য জীবনানন্দকে সাদরে নিয়ে গিয়েছিলেন। জীবনানন্দও গিয়ে নিজের কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে এসেছিলেন।

বেতারেও জীবনানন্দ স্বরচিত কবিতা পাঠের জন্য বহু বার আমন্ত্রিত হয়েছেন এবং প্রতিবারেই গিয়ে কবিতা পড়েও এসেছেন।

এসব ছাড়াও সব চেয়ে বড় কথা, যে সজনীকান্ত দাস দীর্ঘকাল ধরে জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে এসেছেন, সেই সজনীকান্তও জীবনানন্দের জীবনের শেষদিকে তাঁর কবিতার প্রশংসা করেছেন। জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দেবীর একটা লেখায় দেখছি, তিনি লিখেছেন :

> একবার কোনও এক জায়গায় কবির স্বরচিত কবিতা আবৃত্তির কথা ছিল। তাঁর সেদিন শরীরটা খুবই খারাপ ছিল। তিনি সজনীবাবুকে (সজনীকান্ত দাস) অনুরোধ জানালেন যে, তাঁকে যেন আবৃত্তির কাজটা প্রথম দিকেই সেরে নিতে দেওয়া হয়। সজনীবাবু চটে গিয়ে বললেন,— 'আপনি তো বেশ লোক মশাই। আপনাকে প্রথম দিকে আবৃত্তি করতে দিয়ে শেষে আমি চেয়ার বেঞ্চ নিয়ে বসে থাকি।' শেষে হাসতে হাসতে বললেন— 'কিছু মনে করবেন না জীবনানন্দবাবু, আমি জানি যে আপনার কবিতা শোনার পরে ছাত্রদলকে কিছুতেই আর আটকে রাখা যাবে না। সুতরাং আজ একটু কষ্ট করতেই হবে।— (মানুষ জীবনানন্দ)

লাবণ্য দেবীর এই লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে, সজনীকান্ত প্রকাশ্য ভাবে নিজমুখেই জীবনানন্দের কবিতার প্রশংসা করেছিলেন।

সজনীকান্তের আর একটা কাজ। জীবনানন্দের মৃত্যুর ৯ মাস আগে অর্থাৎ ১৩৬০ সালের মাঘ মাসে, শনিবারের চিঠিতে দেখি সজনীকান্ত অসিতকুমার চক্রবর্তী নামে একজনের একটা কবিতা ছেপেছেন। কবিতাটির নাম 'বনলতা সেনের প্রতি।' এ কবিতায় জীবনানন্দকে আর গালাগালি নেই।

অসিতবাবুর কবিতার গুণাগুণ যাই হোক, সজনীকান্ত যে তাঁর কাগজে জীবনানন্দের কোনো কবিতার উপর লেখা কারও কবিতা প্রকাশ করেছিলেন, সেইটাই বড় কথা। আর এই কবিতা প্রকাশ করে সজনীকান্ত জীবনানন্দের কবিতার প্রতি নিজের শ্রদ্ধাও জানিয়েছেন বুঝতে হবে। যাই হোক্, অসিতবাবুর সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

বনলতা সেনের প্রতি

রাত্রি অনেক হ'ল
ঘুমে চোখ চায় আজ জুড়াতে
এখন কোথায় তুমি চল
হৃদয়কে কোন্ সুরে ভরাতে।
শোন, তুমি কোথা যাও, শোন বলি আস্তে
এ যুগের কবিদের নবতম কাব্যে
চিরকেলে চাঁদ হ'ল কিষাণের কাস্তে
পুরোনো দিনের গান কেন আজ ভাব্‌বে?
দারুচিনি দ্বীপ নয়
বিবর্ণ এ নগরের গলির কোটর
এইখানে জীবনের তিলে তিলে ক্ষয়
হাওয়ায় হাওয়ায় কাঁপে মৃত্যুর ছায়' থরথর।
এখানে হঠাৎ আজ যদি
আসে কোনও বনলতা সেন
রুদ্ধগতি আজিকার জীবনের নদী
এখানে কোথায় তিনি হৃদয়ের তৃষা মেটাবেন?
পাখির নীড়ের মত চোখ তুলে একবার চেয়ে দেখ বনলতা সেন,
পৃথিবীর ঘরে ঘরে সিংহল সমুদ্র হতে মালয় সাগরে
তিমির-স্তিমিত রাত্রি, শকুনেরা করে লেন দেন
এখানে কোথায় তুমি? প্রেতায়িত আজিকার বিদর্ভ নগরে?

এই কবিতায় লেখা হয়েছে হঠাৎ যদি কোনও বনলতা সেন আসে, এখানে কোথায় তিনি হৃদয়ের তৃষ্ণা মেটাবেন? এই লেখায় 'আসে'টা 'আসেন' হওয়াই ঠিক নয় কি? এটা তো গদ্য কবিতা ! অবশ্য এটা তেমন কিছুই নয়। আসল কবিতাটিই।

যে সজনীকান্ত দাস তাঁর *শনিবারের চিঠি*-তে দীর্ঘদিন ধরে জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, সেই সজনীকান্তই জীবনানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর *শনিবারের চিঠি*-তে লিখেছিলেন :

'কবি জীবনানন্দের কাব্যের প্রতি আমরা যৌবনে যথেষ্ট বিদ্রূপতা করিয়াছি : তাঁহার দুর্বোধ্যতাকে ব্যঙ্গ করিয়া বহু পংক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাঁহোকে হাস্যাস্পদ করিবার চেষ্টা করিতেও ছাড়ি নাই...
এ কথা আজ স্বীকার করা কর্তব্য মনে করিতেছি যে, রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-সাহিত্যের তিনি অন্যতম গৌরব ছিলেন। তিনি অকপটে সুদৃঢ় নিষ্ঠার সহিত কাব্য-সরস্বতীর সেবা করিয়া গিয়াছেন।

দুর্ঘটনা ও মৃত্যু

হাওড়া গার্লস কলেজে জীবনানন্দ সকলের কাছ থেকে আন্তরিক ও বাহ্যিক সম্মান-শ্রদ্ধাই শুধু পেতেন না, কলেজের অধ্যক্ষ তথা প্রতিষ্ঠাতা অন্যান্য অধ্যাপকদের অপেক্ষা জীবনানন্দের বিশেষ আর্থিক সুবিধারও ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। জীবনানন্দ সেকালের উপযোগী ভাল বেতনই কলেজ থেকে পেতেন। জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দেবীও কিছুদিন আগে বি. টি. পাস করে ঐ সময় কলকাতায় একটি স্কুলে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিয়েছিলেন। ফলে জীবনানন্দের সংসারে ভালরূপ আর্থিক স্বচ্ছলতাও দেখা দিয়েছিল। জীবনানন্দ কন্যা মঞ্জুশ্রীকে তার পিসিমার কাছ থেকে এনে নিজেদের কাছে রেখে তাকে কলকাতায় কলেজে পড়াচ্ছিলেন। পুত্র সমরানন্দও স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ছিল। জীবনানন্দের তখন খুবই সুখের ও শান্তির সংসার।

কিন্তু তাঁর এই শান্তির সংসারেই তখন এমন একটা বিষবৎ অশান্তি বিরাজ করছিল, যার জন্য অতি শান্ত ও ধীর প্রকৃতির জীবনানন্দও পাগল হবার উপক্রম হয়েছিলেন। আর ঐ অশান্তির কারণেই শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যুও ঘটেছিল।

জীবনানন্দের মৃত্যু-কারণ স্বরূপ সেই অশান্তিটা ছিল এই—

তিনি যখন বেকার ও আর্থিক সংকটের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন, তখন এক সময় কিছুটা আর্থিক সাশ্রয়ের জন্য নিজের ফ্ল্যাটের একখানা ঘর একটি মাঝামাঝি বয়সের মেয়েকে ভাড়া দিয়েছিলেন। মেয়েটি একা থাকত বটে, কিন্তু দিবারাত্র তার কাছে 'জটিল জনসমাগম' হ'ত।

জীবনানন্দ মেয়েটিকে ভাড়াটে হিসাবে বসিয়ে অল্প ক'দিনের মধ্যেই তার স্বরূপ জানতে পারলেন। সেই থেকেই তাঁর নিজের জীবনেও অশান্তি শুরু হ'ল। মেয়েটিকে কিভাবে তোলা যায়, তখন তাঁর একমাত্র ধ্যান হ'ল। এজন্য তিনি অনেক বন্ধুরই দ্বারস্থ হলেন। ক্ষমতাসম্পন্ন অধিকাংশ বন্ধুই কিছু করলেন না। আর যাঁরা চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরাও কিছু করতে পারলেন না।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই কলকাতা এবং কলকাতার আশপাশে অসংখ্য নতুন কলেজ গড়ে ওঠে। তখন কংগ্রেসের রাজত্ব এবং জীবনানন্দের অনেক সাহিত্যিক বন্ধুও তখন কংগ্রেসের সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত ছিলেন। এঁদের কেউ যদি তখন পশ্চিমবঙ্গের দরদী মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে, কি কংগ্রেসের কোনো কর্মকর্তাকে জীবনানন্দের কথা বলতেন, তাহলে অধ্যাপনার

কাজ তো বটেই, না হলে অন্য যে কোনো একটা কাজ জীবনানন্দ পেতেনই। তখন একটা কাজ পেলে, জীবনানন্দকে নিজ হাতে আর ঐ ভাড়াটে-রূপ বিষবৃক্ষটি রোপণ করতে হ'ত না। তাও যদি পরেও জীবনানন্দের কোনো বন্ধু তাঁর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ঐ মেয়েটিকে তুলে দিতে পারতেন, তাহলে নিশ্চয়ই জীবনানন্দ বেঁচে যেতেন। এবং বেঁচে দেশকে আরও তাঁর কাব্য-সুধা দান করে যেতে পারতেন।

যাই হোক, ঐ মেয়েটি যে কি প্রকৃতির ছিল এবং মেয়েটির জন্য জীবনানন্দ তখন যে কিভাবে বিব্রত হয়ে উঠেছিলেন, সে সম্বন্ধে যাঁরা মেয়েটিকে দেখেছিলেন, বা তার সম্বন্ধে জেনেছিলেন, এমন দুজনের লেখা এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। বড়িষা কলেজে জীবনানন্দের সহকর্মী অধ্যাপক শান্তিপ্রিয় চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> জীবনানন্দবাবু ল্যান্সডাউন রোডে দেশপ্রিয় পার্কের সামনে যে বাড়িতে থাকতেন, সেই বাড়িরই খানিকটা অংশ তিনি এক বিধবা ভদ্রমহিলাকে থাকতে দিয়েছিলেন একজনের অনুরোধে— এবং নির্জনতার নিস্তব্ধতাপ্রিয় কবি সেই ভদ্রমহিলার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন নির্মমতম আঘাত। তাঁর চরিত্রের সঙ্গে যা আদৌ খাপ খায় না, তাই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে প্রত্যেক সন্ধ্যায় এবং রাত্রিতে। পার্শ্ববর্তী কক্ষের হৃদয়হীন চিৎকার এবং জটিল জনসমাগম জীবনানন্দের সমস্ত ইন্দ্রিয়বশ শরীরকে করাতের মতো চিরতো। জাগরণক্লান্ত রাত্রি এবং দুশ্চিন্তাপূর্ণ দিন নিয়ে কবি জীবনানন্দ মৃত্যুর দিকে এগোচ্ছিলেন ধীরে ধীরে।

জীবনানন্দের ছোট বোন সুচরিতা দাশও লিখেছেন :

> ল্যান্সডাউনের...ওই বাড়িতে অজস্র বই-এর বন্ধুত্বে, মনের একান্ততায় হয়ত ভালই থাকতেন তিনি, যদি না জনৈকা প্রতিবেশিনীর অভদ্র দৌরাত্ম্যে সর্বক্ষণ বাড়ির হাওয়া পরিবেশ পঙ্কিল থাকত।

সুচরিতা দেবীর কথার মেয়েটির 'অভদ্র দৌরাত্ম্য' এবং 'হাওয়া পরিবেশ পঙ্কিল', তবে শান্তিপ্রিয়বাবুর লেখায় মেয়েটির কাছে 'জটিল জনসমাগম' এবং প্রত্যেক সন্ধ্যায় ও রাত্রিতে এজন্য জীবনানন্দকে 'করাতের মত চিরতো'— এ থেকেই পাঠক-পাঠিকারা বুঝতে পারছেন, মেয়েটি কি জাতের ছিল। এর বেশি খুলে বলার আর প্রয়োজন নেই।

ন্যায় ও নীতি-পরায়ণ এবং আদর্শবাদী জীবনানন্দ এমন একটি মেয়েকে, একই রকের তিনখানা ঘরের সামনের ঘরটা দিয়ে সেখানে সপরিবারে বাস করছিলেন। এ প্রায় কল্পনারও অতীত।

এই সময়েই জীবনানন্দ একদিন পথে বাড়ির কথা চিন্তা করতে করতে (যা তিনি তখন প্রায় সব সময়েই চিন্তা করতেন) অন্যমনস্ক হয়ে ট্রামের ধাক্কায় আহত হলেন। সে দিনের সেই ঘটনাটা ছিল এই :

জীবনানন্দের বাড়ির ঠিক সামনেই ছিল দেশপ্রিয় পার্ক। দেশপ্রিয় পার্কও বেশ বড় পার্ক। তবুও তিনি এখানে না বেড়িয়ে সিধা ল্যান্সডাউন রোড ধরে দক্ষিণ দিকে হেঁটে লেকে চলে যেতেন। প্রকৃতির কবি জীবনানন্দের কাছে লেকের প্রাকৃতিক পরিবেশ বড় আকর্ষণীয় ছিল। তাই তিনি নিয়মিত প্রতিদিনই লেকে বেড়াতে যেতেন। জীবনানন্দের এই বেড়াবার সময় ক্বচিৎ তাঁর পরিচিত কেউ সঙ্গী হতেন। না হলে তিনি একাই বেড়াতে বেরুতেন। লেকে গিয়ে সেখানে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে ও বসে তারপর বাড়ি ফিরে আসতেন।

জীবনানন্দ ব্লাড প্রেসার বা রক্ত চাপ জনিত রোগে অনেক দিন থেকেই অল্প-স্বল্প ভুগছিলেন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের গোড়ার দিকে বাড়ির জন্য দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় ও ক্রমাগত নিদ্রাহীন রাত্রি যাপন করে করে তাঁর এই রোগটা একটু বেশি রকম বেড়ে যায়। ১৩ই অক্টোবর রাত্রে কলকাতায় বেতার কেন্দ্র অফিসে কবি-সম্মেলনে স্ব-রচিত কবিতা পড়বার জন্য যখন গিয়েছিলেন, সেদিনও তখন তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন। বেতার কেন্দ্রে সেদিনের কবি-সম্মেলনে যোগদানকারী অন্যতম কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য জীবনানন্দের সেদিনকার কথা-প্রসঙ্গে লিখেছিলেন :

> অসুস্থ জীবনানন্দের সঙ্গে আমার আরেকটি বার দেখা হয়েছিল, আকাশবাণীর পুরনো বাড়িতে কবি সভায়। তখন তিনি কায়মনে অসুস্থ। কিন্তু সভায় গিয়েছিলেন, সম্ভবত শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্রেব সঙ্গে দেখা হবে বলে। তিনি কবি সভায় আহূত ছিলেন। কিন্তু জানি না, কি কারণে তিনি অনুপস্থিত। সে সভা ছিল প্রবীণ কবি করুণানিধান-কুমুদরঞ্জন-কালিদাস বায় থেকে ত্রিশের দশকের কবিদের কবিতা পাঠের আসর। সেই কবি সভায় আমিও যোগ দিয়েছিলাম। জীবনবাবু আব কাবো সঙ্গেই কথা বলছিলেন না। বাব বার শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন— প্রেমেন এলো না কেন? প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপব তেমন নির্ভরই জীবনানন্দ করতে চেযেছিলেন, আমার কাছে লেখা শেষ চিঠিতে তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর যেমনি করতে চেয়েছ্নে। ওটা বাড়ির ঝঞ্জাট মেটাবার জন্যে। আমি জীবনানন্দেব সেই উদ্‌ভ্রান্ত অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে আহত হয়েও ভাবতে পারিনি যে, তাঁর শেষ দিন আসন্ন। এই সাংঘাতিক অন্যমনস্কতাই তাঁর কাল হ'ল। বাড়ির সামনে তিনি ট্রাম চাপা পড়লেন।

বাড়ির ব্যাপারে তারাশংকরবাবুর উপর নির্ভরের কথা সঞ্জয়বাবুকে লিখলেও জীবনানন্দ কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারাশংকরবাবুর সঙ্গে দেখা করেননি। তার কারণ, তারাশংকরবাবুর সঙ্গে তাঁর তেমন পরিচয় ছিল না। জীবনানন্দ যখন বরিশালে বি. এম. কলেজের অধ্যাপক সেই সময় তারাশংকরবাবু একবার বরিশালে গেলে সেখানে জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর ক্ষণিকের পরিচয় হয়েছিল। তাছাড়া পরে এঁদের মধ্যে আর সাক্ষাৎ পরিচয় বা ঘনিষ্ঠতা কোনো দিনই হয়নি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র জীবনানন্দের শুধু পরিচিতই নন, বিশেষ বন্ধুস্থানীয়ও ছিলেন।

তাই তিনি এ ব্যাপারে প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপর বেশি নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দেখা করবার জন্যই সেদিন রাত্রে অসুস্থ শরীরেই তিনি বেতার কেন্দ্রে গিয়েছিলেন। না হলে তিনি যেতেনই না।

বাড়ির ব্যাপারে তারাশংকরবাবু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের উপর জীবনানন্দের এতটা নির্ভরের হেতু এই যে, তখন বাংলায় কংগ্রেসী রাজত্বে কংগ্রেসী মহলে তারাশংকরবাবু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছিল প্রবল প্রভাব। এঁরা নিজেদের প্রভাবে সরকারী সাহায্যে যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন, এই ভরসায় এঁদের উপর এতটা নির্ভরশীল হয়েছিলেন।

জীবনানন্দ যে তখন বাড়ি নিয়ে কিরূপ মহাবিপদে পড়েছিলেন, তা বোঝা যায় এই কাহিনীটা থেকেও। কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন :

> একদিন আমি যখন জীবনানন্দের বাড়ির নিকটেই রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেই সময় পথে হঠাৎ জীবনানন্দের সঙ্গে দেখা। দেখা হতেই তিনি আমাকে বললেন— আপনার পরিচিত কোন গুণ্ডা আছে? দিতে পারেন?
>
> আমি বললাম— গুণ্ডা দিয়ে কি হবে?
>
> — আমার ভাড়াটে সেই মেয়েটাকে গুণ্ডা দিয়েই তুলতে হবে। না হলে তোলা যাচ্ছে না।
>
> আমি বললাম— গুণ্ডা দিয়ে ভাড়াটে তুলবেন ; কিন্তু সেই গুণ্ডাই যখন শেষে আবার আপনাকেও হঠাতে চেষ্টা করবে, তখন কি করবেন?
>
> আমার এই কথায় জীবনানন্দ আর কোনো কথা না বলে যে দিকে যাচ্ছিলেন, সেই দিকে চলে গেলেন।
>
> আমি ভাবলাম— কথাটা ঠিক সহানুভূতির সঙ্গে বলা হয়নি বলেই হয়ত, তিনি আমার সঙ্গে আর কোনো কথা না বলে অমন করে চলে গেলেন।
>
> আমি খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে, আবার হাঁটতে শুরু করলাম।

জীবনানন্দের সেই ভাড়াটে মেয়েটিকে কি ভাবে তোলা যায়, সে সম্বন্ধে আলোচনা করবার জন্য আমি একদিন জীবনানন্দকে সঙ্গে নিয়ে আমার পরিচিত খ্যাতনামা এক উকিলের কাছে গিয়েছিলাম। উকিল ভদ্রলোক সেদিন বলেছিলেন— আইনত ওকে তোলা যাবে না। যদি পারেন পাড়ার ছেলেদের দিয়ে ভয় দেখিয়ে ওকে তোলার চেষ্টা করুন।

আমার মনে হয়, উকিলের কাছ থেকে আসার দু এক দিন পরেই বীরেনবাবুকে দেখে জীবনানন্দ ঐ কথা বলেছিলেন।

জীবনানন্দ তখন ঐ ভাড়াটে মেয়েটিকে নিয়ে এতই বিপদে পড়েছিলেন যে কারও কাছে গুণ্ডা চাইতেও এতটুকু ইতস্তত করেননি।

যাই হোক্, যে কথা বলছিলাম, অসুস্থ শরীর নিয়ে প্রতিদিনের মতই ১৪ই

অক্টোবর বিকালেও জীবনানন্দ বেড়াতে বেরুলেন। যখন বেড়াতে বেরুচ্ছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রী লাবণ্য দেবী তাঁকে বেরুতে নিষেধ করেছিলেন। লাবণ্য দেবী বলেন, তাঁর নিষেধ না শুনে জল দিয়ে মাথা ধুয়ে তিনি বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেন।

ঐ দিন জীবনানন্দ অধিকাংশ দিনের ন্যায় একাই বেড়াতে গিয়েছিলেন। তিনি তাঁর যথারীতি সূচী অনুযায়ী বেড়িয়ে ফেরার সময় বাড়ির অদূরে লেক মার্কেট হয়ে সেখান থেকে দুটো ডাব কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন।

হাঁটতে হাঁটতে জীবনানন্দ রাসবিহারী এভিনিউ ও ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগ স্থলের প্রায় কাছাকাছি এসে গেলেন। তিনি রাসবিহারী এভিনিউ-এর দক্ষিণ দিকের ফুটপাথ (এই পথেই লেক মার্কেট) ধরে পূর্ব মুখে আসছিলেন। সংযোগ স্থলের প্রায় কাছাকাছি এসে তিনি দক্ষিণ দিকের ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তা অতিক্রম করবার জন্য পথে নামলেন।

কলকাতার রাসবিহারী এভিনিউ পূর্ব পশ্চিমে লম্বাতে যেমন বেশ একটা বড় রাস্তা, এর চওড়াটাও তেমনি লক্ষ্য করার মতো। এই রাস্তার যে অংশে ট্রাম চলে তার অধিকাংশটাই ট্রাম যাতায়াতের জন্য রাস্তার মাঝখান দিয়ে দুটা ট্রাম লাইন পাতা এবং যাত্রীদের ওঠা নামার জন্যই দুপাশে বেশ খানিকটা করে জায়গা। ট্রাম লাইনের জমিটা সবুজ ঘাসে ভর্তি।

রাস্তার মাঝখানের এই ট্রাম লাইন বাদে ট্রাম লাইনের উত্তর দক্ষিণে দুপাশে মোটর, বাস, লরি প্রভৃতির একমুখো হয়ে যাতায়াতের জন্য বেশ চওড়া দুটা রাস্তা।

জীবনানন্দ রাসবিহারী এভিনিউ এর দক্ষিণ দিকের ফুটপাথ থেকে নেমে মোটর ইত্যাদি চলার রাস্তাটা পার হয়ে ট্রাম লাইনের কাছে এলেন। এসে বাঁদিকে তাকিযে দেখলেন, অদূরে একটা ট্রাম আসছে। ভাবলেন, ট্রামটা আসছে বটে, তবে আগে একটা স্টপেজও আছে। ওখানে ট্রামটা থেমে আসতে আসতে ততক্ষণে তিনি রাস্তা পার হযে যাবেন। এই ভেবে, তখনি একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে ট্রামলাইন পার হতে লাগলেন।

তখন সন্ধ্যা একটু আগেই পার হয়ে গেছে। ট্রামে লোক চলাচলও অনেকটা কমে এসেছে। তাই আগের স্টপেজে লোক না নামার বা ওঠার থাকায় ট্রামটা সেখানে না থেমে জোরেই চলে আসছিল। ছুটন্ত ট্রাম এসে জীবনানন্দকে প্রচণ্ড ধাক্কা দিল, জীবনানন্দ আর ট্রাম লাইন পার হতে পারলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই অচৈতন্য হয়ে ট্রাম লাইনের ঘাসের উপর পড়ে গেলেন এবং তাঁর দেহও ট্রামের ক্যাচারের ভিতর ঢুকে গেল।

রাসবিহারী এভিনিউ ও ল্যান্সডাউন রোডের সংযোগ স্থলের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একখানা বাড়ির পরেই রাসবিহারী এভিনিউ এর উপর তখন 'জলখাবার' নামে একটা মিষ্টির দোকান ছিল। ঐ দোকানের মালিক ছিলেন, পাড়ার বিশিষ্ট ব্যায়ামবিদ্ তরুণ যুবক চুনীলাল দে। মিষ্টির দোকান তুলে দিয়ে পরে ঐ ঘরে চুনীবাবু

'সেলী কাফে' নামে একটি রেষ্টুরেণ্ট খোলেন। জীবনানন্দের ট্রাম দুর্ঘটনার সময় এই চুনীবাবু শুধু প্রত্যক্ষদর্শীই ছিলেন না, তিনি ছুটে গিয়ে অনেক সাহায্যও করেছিলেন। জীবনানন্দের ঐ ট্রাম দুর্ঘটনার কথা চুনীবাবুকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি বলেছিলেন :

> তখন সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা হবে। আমি আমার দোকানের সামনে ফুটপাথে পাতা একটা চেয়ারে পশ্চিমদিকে মুখ করে বসে আছি। কত লোকই আমার সামনে দিয়ে যাচ্ছে আসছে, উদাস ভাবেই দেখছি। এমন সময় হঠাৎ চোখে পড়ল দুটো কচি ডাব হাতে ঝুলিয়ে জীবনানন্দবাবু এই ফুটপাথ ধরেই পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব মুখে আসছেন। আলাপ না থাকলেও আমি জীবনানন্দবাবুকে চিনতাম। কারণ, আমার দোকান থেকে প্রায়ই তাঁর বাড়িতে মিষ্টি যেত। হয় ওঁর চাকর, নয়ত কখনো কখনো ওঁর ছেলেও মিষ্টি কিনে নিয়ে যেত।
>
> জীবনানন্দবাবু, আসতে আসতে আমার দশ পনেরো হাত দূরে রাস্তা পার হবার জন্য ফুটপাথ থেকে নেমে রাস্তায় গেলেন। আমি যেমন উদাসভাবে পশ্চিম দিকে চেয়েছিলাম, তেমনি চেয়ে রইলাম। একটু পরেই হঠাৎ ট্রামের একটা বিকট শব্দ। সেই দিকে চেয়ে দেখি, বালিগঞ্জমুখো একটা চলন্ত ট্রাম কাকে যেন চাপা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই পথচারীদের ভয়ার্ত চিৎকারও কানে এল। ছুটে সেখানে চলে গেলাম। পথচারীদেরও অনেকেই এসে গেলেন। গিয়ে দেখি একজন লোক অচৈতন্য হয়ে ট্রামের ক্যাচারের মধ্যে পড়ে আছেন। সন্দেহ হ'ল জীবনানন্দবাবু নয় তো?
>
> ট্রাম দাঁড়িয়ে আছে। ট্রামের ড্রাইভার দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই ভিড়ের মাঝে গা ঢাকা দিয়ে সরে পড়েছে। যাই হোক, আমি তখনই ট্রামের তলায় ঢুকে আস্তে আস্তে খুব সাবধানে তাঁকে টেনে বার করলাম। দেখলাম, আমার সন্দেহ মিথ্যে নয়— জীবানন্দবাবুই। সমবেত জনতার মধ্যে থেকে দু-এক জনের কথা কানে এল। তাঁরা বলেছেন— ট্রাম লাইনের এই ঘাসের উপর দিয়ে ভদ্রলোক আপন মনেই আসছিলেন। ট্রামের ড্রাইভার ঘণ্টা বাজিয়েছে, দু-একজন রাস্তার লোক ট্রাম আসছে বলে চিৎকারও করেছে। কিন্তু ভদ্রলোক কিসের চিন্তায় এত বিভোর ছিলেন যে, কোনো কিছুই তাঁর কানে যায়নি। জীবানানন্দবাবু ট্রামের ধাক্কায় সঙ্গে সঙ্গেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। যখন তাঁকে টেনে বার করলাম, তখন তিনি অজ্ঞান। তাঁকে ট্রাম লাইনের ঐ ঘাসের উপর শুইয়ে একটা ট্যাক্সি খুঁজতে লাগলাম। দৈবক্রমে একটা খালি ট্যাক্সি ঐখান দিয়ে যাচ্ছিল। তাকে থামিয়ে দু-তিন জনে মিলে অচৈতন্য জীবনানন্দবাবুকে ধরাধরি করে ট্যাক্সিতে তুললাম। তারপর সিধা তাঁকে শম্ভুনাথ হাসপাতালে নিয়ে গেলাম। আমার সঙ্গে রাস্তার আর একজন দয়ালু ভদ্রলোকও গিয়েছিলেন। তাঁকে আমি চিনতাম না, তিনিও জীবনানন্দবাবুকে চিনতেন না।
>
> জীবানন্দবাবুকে হাসপাতালে দিয়ে এসে, তারপর তাঁর বাড়িতে খবর দিয়েছিলাম।

চুনীবাবু জীবনানন্দকে শম্ভুনাথ পণ্ডিত এমার্জেন্সী বা জরুরি বিভাগে দিয়ে এলে,

হাসপাতালের কর্মীরা তাঁকে সাধারণ রোগীদের মধ্যেই রেখে ছিলেন।

জীবনানন্দের ছোটভাই অশোকানন্দ, খুড়তুতো ভাই মেডিকেল কলেজের ডাক্তার অমলানন্দ দাশ— এঁরা পরে জীবনানন্দকে সাধারণ রোগীদের মধ্য থেকে সরিয়ে পৃথক ঘরে রাখবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু তখন তাঁর এমন অবস্থা হয়েছিল যে, তাঁকে কোনোরূপ নাড়াচাড়াই করা চলছিল না। ট্রামের ধাক্কায় জীবনানন্দের বুকের কয়েকটা পাঁজরা, কাঁধের হাড় এবং পায়ের হাড়ও ভেঙে গিয়েছিল।

জীবনানন্দকে দেখবার জন্য ডা. বিধানচন্দ্র রায় একদিন শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে গিয়েছিলেন। গিয়ে দেখে তিনি জীবনানন্দের আত্মীয়স্বজনদের বলে এসেছিলেন— বাঁচার আর কোনো আশা নেই।

তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে বলে এসেছিলেন— যতদিন বাঁচেন, যাতে একটু শান্তিতে থাকতে পারেন, তার ব্যবস্থা কোরো।

জীবনানন্দকে ১৪ই অক্টোবর রাত্রি ৮টা, ৯টা নাগাদ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁর হাড়গোড় ভেঙে আঘাত এতই গুরুতর হয়েছিল যে, বাঁচার কোনো লক্ষণই ছিল না। তিনি দিনে দিনে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে লাগলেন। শেষের দিকে মৃত্যুর কয়েক দিন আগে তাঁর শরীরে সেফ্‌টিক নিউমোনিয়াও দেখা দিল। তাঁর জীবনদীপ ক্রমশ ক্ষীণ হতে হতে যখন নির্বাপিত হ'ল— তখন শুক্রবার রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিট। সেদিনটা ছিল ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে অক্টোবর বা ১৩৬১ সালের ৫ই কার্তিক।

সবুজ ঘাস ছিল জীবনানন্দের অত্যন্ত প্রিয়। ট্রামের প্রচণ্ড ধাক্কায় ট্রাম লাইনের সেই সবুজ ঘাসের উপরেই জীবনানন্দ মরণাপন্নভাবে আহত হলেন।

জীবনানন্দ তাঁর অসংখ্য কবিতায় হেমন্তের ফসল, শিশির ও রাতের তারার কথা লিখে গেছেন। হেমন্ত ছিল তাঁর প্রিয় ঋতু। সেই জন্যও কি তিনি প্রথম হেমন্তে কার্তিকের ঐ ফসল ফলা, শিশির ঝরা ও তারাভরা রাতেই পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিলেন!

মরণোত্তর সম্মান

জীবনানন্দের মৃত্যু সংবাদ ২৩শে অক্টোবরের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হ'লে সকালে সে সংবাদ পড়ে তখনই বহু সাহিত্যিক জীবনানন্দের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য গিয়েছিলেন। জীবনানন্দের মৃতদেহ ২২শে তারিখে রাত্রেই হাসপাতাল থেকে তাঁর ছোটভাই অশোকানন্দের শ্বশুরালয় ১৭২/৩ রাসবিহারী এভিনিউয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তাই সাহিত্যিকরা রাসবিহারী এভিনিউ-এর ঐ ঠিকানায় গিয়েছিলেন। ঐ ঠিকানার কথা মৃত্যু সংবাদের সঙ্গেই কাগজে দেওয়া হয়েছিল।

সেদিন সমবেত সাহিত্যিকদের মধ্যে কিছুটা বিস্মিত হয়েই দেখেছি— সজনীকান্ত দাসও জীবনানন্দের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন।

২৩ শে অক্টোবরের *আনন্দবাজার, যুগান্তর* প্রভৃতি কাগজে জীবনানন্দের মৃত্যু সংবাদের কথা ছাড়াও, সকলেই সম্পাদকীয়তে তাঁর সম্বন্ধে সপ্রশংস আলোচনা করেছিলেন। এবং সকলেই জীবনানন্দকে রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।

দৈনিক পত্রিকাগুলি এইভাবে শুধু সংবাদে ও সম্পাদকীয়তেই নয়, রবিবাসরীয় সাহিত্য বিভাগেও তাঁর আলোকচিত্র সহ তাঁর উপর প্রবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন। আর শুধু দৈনিক পত্রিকাই নয়, সাপ্তাহিক ও মাসিক অনেক পত্রিকাই তখন জীবনানন্দ সম্বন্ধে প্রশংসাসূচক আলোচনা করেছিলেন। *কবিতা, উত্তর সূরী, ময়ূখ* প্রভৃতি কয়েকটা পত্রিকা বিশেষ জীবনানন্দ সংখ্যাও তখন বার করেছিলেন। এমন কি, জীবনানন্দ যে হাওড়া গার্লস কলেজে শেষ জীবনে অধ্যাপনা করছিলেন, সেই কলেজও একটি সুন্দর তথ্য সমৃদ্ধ *জীবনানন্দ সংখ্যা* প্রকাশ করেছিলেন।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর তখন অনেক কবিই তাঁর উপর কবিতা লিখেছিলেন। ঐ সব কবিতার কিছু নিয়ে তখন বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় *জীবনায়ন* নামে একটা গ্রন্থও প্রকাশ করেছিলেন। জীবনানন্দের কথা স্মরণ করে এক সময় কয়েকজন তরুণ কবি *জীবনানন্দ* নামে একটা পত্রিকাও বার করেছিলেন।

এই সঙ্গে *শনিবারের চিঠি*-র সম্মান প্রদর্শনের কথাটাও বলা প্রয়োজন মনে করি। জীবনানন্দের মৃত্যুর পর সজনীকান্ত লিখেছিলেন :

যতদূর মনে পড়ে, ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে জীবনানন্দের 'ঝরা পালক' প্রকাশিত হয়। তখনও

তিনি অবচেতনার গহনে সম্পূর্ণরূপে ডুব দেন নাই। সমগ্র কাব্য-গ্রন্থখানির ভাব ছিল দরদ-করুণ, ছন্দও ছিল সাধারণ পরিচিত ছন্দ এবং সে ছন্দে তাঁহার নৈপুণ্য ছিল অসাধারণ। মোহিতলাল ও নজরুল ইসলামের প্রভাব ছিল স্পষ্ট। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই পথে পদচারণা করিলে তাঁহার কাব্য 'ঝরা পালকের' মতই ভূতলাশ্রিত হইত, তিনি বড় জোর ভাল গুণীর ভাল শাগরেদ হিসাবে নাম করিতে পারিতেন। কিন্তু যিনি স্বয়ং ওস্তাদ গুণী, তিনি অনুসরণ অনুকরণের পথে বেশিদিন চলিতে পারেন না। অত্যল্পকাল মধ্যেই তিনি নিজের পথ অর্থাৎ নিজস্ব পথ আবিষ্কার করিয়া ফেলিলেন এবং সেই পথেই শেষ পর্যন্ত 'বনলতা সেনে'র আবির্ভাব হইল। তাঁহার এই কাব্য অভিযান কাহিনী আমরা যোগ্যতর ব্যক্তির নিকট শুনিব। ...দেশবন্ধুর তিরোধানের অব্যবহিত পরে তিনি দেশবন্ধু নামে যে কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহা আজিও আমাদের মনে গাঁথা আছে। তবু বলিব, সেই পুরাতন গতানুগতিক পন্থা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভালই করিয়াছিলেন।

এই হিংসা-হানাহানি-কলহ-বিদ্বেষ কণ্টকিত বর্তমান পৃথিবীতে এই উদার-হৃদয় প্রসন্ন-প্রেমিক কবিকে পদে পদে আমাদের মনে পড়িবে। সত্য বটে, দুঃখবাদই তাঁহার কাব্যের মূল সুর ছিল, কিন্তু তাঁহার মধ্যে কোনো নালিশ ছিল না। তাঁহার সমগ্র কাব্য স্নিগ্ধ ভালবাসায় ওতপ্রোত, কাহাকেও ফুলের আঘাত পর্যন্ত হানিতে তিনি অক্ষম ছিলেন। তাঁহার অন্তরের অভিলাষ 'কমলালেবু' কবিতায় যে ভাবে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই ছিল তাঁহার সত্যকার জীবনদর্শন, নিজের জীবনাহুতি দিয়াও পরিচিত মানুষের কল্যাণ সাধন :

একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?
আবার যেন ফিরে আসি
কোন্ এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলা লেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

কবি জীবনানন্দ জীবনাহুতি দিয়েছেন। এই ব্যাধিক্লিষ্ট মুমূর্ষু পৃথিবীর সাময়িক তৃপ্তি বিধান সম্পর্কিত তাঁহার আন্তরিক আবেদন, গ্রাহ্য হইবে কিনা জানি না।'
শনিবারের চিঠি-সংবাদ সাহিত্য-কার্তিক, ১৩৬১।

জীবনানন্দের মরণোত্তর সম্মানের কথা প্রসঙ্গে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর জন্য ঘোষিত ভারত সরকারের একাডেমি প্রাইজটার কথাও বলা দরকার। এ সম্বন্ধে একটু বিস্তৃতই বলছি।

কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর *কবি জীবনানন্দ দাশ* গ্রন্থে তাঁকে লেখা জীবনানন্দের ১৭. ৫. ৫৪ তারিখের একটা চিঠি ছেপেছেন। সেই চিঠির কিছুটা এই :

> আপনাবা কি কবির সাহেবকে আমাব কথা বলেছিলেন? বাড়ি নিয়েও বড় মুস্কিলে আছি। তাবাশংকরবাবুব সঙ্গে দেখা করব? এ সব বিষয নিযে আপনাদের সঙ্গে গিযে আলোচনা করতে পারি। কিংবা আপনি চিঠি লিখেও জানাতে পারেন। খুব জরুরি।

জীবনানন্দের এই চিঠির 'বাড়ি নিয়েও' কথাটা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি অন্য একটা কথার সঙ্গে প্রসঙ্গত বাড়ির কথাও বলেছিলেন। এখন এই অন্য কথাটা কবির সাহেব ও তারাশংকরবাবুকে নিয়ে কি হতে পারে? একাডেমি প্রাইজের কথা হওয়াই সম্ভব। কেন না, কবির সাহেব তখন কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা সচিব থাকায় একাডেমি প্রাইজের তিনিই সর্বেসর্বা ছিলেন। আর তারাশংকরবাবু ছিলেন তখনকার কংগ্রেসী রাজত্বে বাঙ্গলা কংগ্রেসের অন্যতম স্তম্ভ স্বরূপ।

জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থটি যখন বেরোয় সেই সময়েই ভারত সরকার প্রধান প্রধান প্রত্যেক ভারতীয় ভাষায় মনোনীত শ্রেষ্ঠ গ্রন্থকে পাঁচ হাজার টাকা করে একাডেমি প্রাইজ দেবেন বলে ঘোষণা করেন এবং এজন্য সাহিত্যিক ও প্রকাশকদের কাছ থেকে বই আহ্বান করেন। এতেই জীবনানন্দ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার বইটি তখন ভারত সরকারের মনোনয়নের জন্য পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য তিনি নিজে এ বিষয়ে কখনই উৎসাহী বা অগ্রণী হননি। তাঁর কবিতার কয়েকজন ভক্ত ও স্নেহ-ভাজন *ময়ূখ* পত্রিকার কর্মী এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়ে যা করার তা করেছিলেন।

এঁরা জানতেন হুমায়ুন কবির জীবনানন্দের বন্ধু স্থানীয়। তাই অন্তত কাকেও দিয়ে কবির সাহেবকে বলাবার জন্য এঁরা জীবনানন্দকে অনুরোধ করেছিলেন। আর তারাশংকরবাবুকেও বলবার জন্য এঁরা জীবনানন্দকে বলেছিলেন।

এঁদের অনুরোধেই জীবনানন্দ তখন সঞ্জয়বাবুকে পূর্বোক্ত চিঠিটি লিখেছিলেন।

জীবনানন্দ তারাশংকরবাবুর সঙ্গে দেখা করবেন কিনা— সঞ্জয়বাবুকে এ কথা লিখলেও শেষ পর্যন্ত দেখা করেননি। হয়ত তারাশংকরবাবু নিজেও ঐ পুরস্কারের একজন প্রার্থী ছিলেন জেনেই, জীবনানন্দ আর তারাশংকরবাবুর কাছে যাননি। শুধু তারাশংকরবাবুই নন, আরও কেউ কেউ ঐ পুরস্কারের প্রার্থী ছিলেন এবং এঁরা প্রত্যেকে নিজেরা অথবা এঁদের ভক্ত ও অনুগতরা তখন রীতিমতো তদ্বিরও করেছিলেন।

শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দের নামে (জীবনানন্দ যদিও তখন মৃত) একাডেমি প্রাইজ ঘোষিত হলে, তখন *ময়ূখ* পত্রিকার কর্মীরা তাঁদের কাগজে লিখেছিলেন :

> আমাদের একটা গোপন তৃপ্তি আছে, সে কথাটা ময়ূখের একান্ত বন্ধুদের কাছে জানাতে হয়। জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা ভারত রাষ্ট্রের পুরস্কার পেয়েছে। এ খবরটা সর্বজ্ঞাত হলেও অনেকে হয়ত জানেন না যে, এই পুস্তকখানা যাতে পুরস্কৃত না হয়, তার জন্য শক্তিশালী সৎ প্রচেষ্টা বাংলাদেশের অনেক গণ্যমান্য গুরু স্থানীয়রা করেছিলেন। তাঁর বিপক্ষে জনৈক আধুনিক কবিকেই শুনেছি, তাঁর প্রতিযোগী হিসাবে মনোনীত করেছিলেন। যাঁর নাম না জানানোই বাঞ্ছনীয়। এই সব প্রচ্ছন্ন গুরু ব্যক্তিদের নেপথ্য

লোক প্রয়োজনবোধে, এই সুধী চক্রীরা আর অবগুণ্ঠিত থাকবেন না হয়তো। তবুও যা হোক, সরকারী শিরোপা মানেই যখন পুরস্কৃত হবার যোগ্যতা প্রমাণিত করে না সাধারণত, তখন অন্তত এই একটা যথার্থই ন্যায়নিষ্ঠ কাজের জন্যে সরকারী প্রধানরা ধন্যবাদার্হ হবেন। . .ময়ূখের গোপন তৃপ্তিটা এই জন্যে যে, সে স্বাক্ষর সংবলিত পত্রাদি প্রেরণ করে এই ন্যায় সাফল্যের সাহায্যে কিঞ্চিৎ উদ্যোগী হয়েছিল।

ময়ূখ-এর কর্মীরা একাডেমি প্রাইজের অন্য প্রার্থীদের বিরুদ্ধে এমন চড়া কথা বললেও আমি কিন্তু এ বিষয়ে কারও ততটা ত্রুটি দেখি না। কেন না, নির্বাচনের ব্যাপার যেখানে, সেখানে সকলেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন এবং ক্যানভাস হিসাবে নিজের বইয়ের পক্ষে বলতে গিয়ে অপরের বইয়ের সম্বন্ধে কিছু বিরূপ মন্তব্যও মুখে কারও কাছে করতে পারেন।

যাই হোক, এ বিষয়ে তখন যেভাবে প্রার্থীদের প্রত্যেকের পক্ষ থেকে তদ্বির হয়েছিল, তাতে জীবনানন্দ বেঁচে থাকলে এ পুরস্কার কখনই পেতেন না। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে যে সব প্রশংসাসূচক উক্তি বেরিয়েছিল, তাতেই এ বিষয়ে অনেকটা কাজ হয়েছিল।

জীবনানন্দের বিরুদ্ধে জনৈক আধুনিক কবিকে দাঁড় করানো হয়েছিল বলে ময়ূখের কর্মীরা যাই বলুন না কেন, আমার কিন্তু ধারণা, জীবনানন্দের মৃত্যু না হলে সেবার এ পুরস্কার খুব সম্ভব তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ই পেতেন। তার কারণ, কংগ্রেস তথা সরকারী মহলে তাঁর তখন প্রবল প্রভাব। তিনি তখন একে একে সরকার মনোনীত এম. এল. সি. ; এম. পি. ইত্যাদি হচ্ছেন। একাডেমি প্রাইজের সদস্য হচ্ছেন এবং ভারত সরকারের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা মিশনের অন্যতম সদস্য হিসাবে বিদেশের কোনো কোনো দেশেও যাচ্ছেন। তাছাড়া কবির সাহেবও ছিলেন তারাশংকরবাবুর বিশিষ্ট বন্ধু।

সেই সময় তারাশংকরবাবুর জনৈক ভক্ত এজন্য কবির সাহেবকে বলেও ছিলেন। তখন উত্তরে কবির সাহেব তাঁকে বলেছিলেন— তারাশংকরবাবু তো পাবেনই তাতে কোনও সন্দেহই নেই। তবে এবারটা জীবনানন্দ দাশকে না দিলে আর কখনও দেওয়া যাবে না। মরণোত্তর সম্মান তো আর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে দেওয়া যায় না। তাই এ বছর জীবনানন্দ দাশের বইকেই দেওয়া স্থির করেছি, আগামী বছরে তারাশংকরবাবু নিশ্চয়ই পাবেন।

কবির সাহেবের কথা অনুযায়ী তারাশংকরবাবু পরের বছর ঐ প্রাইজ পেয়েছিলেন।

একাডেমি প্রাইজের ঐ টাকাটায়, জীবনানন্দ তখন মৃত হলেও, তাঁর স্ত্রী লাবণ্য দাশের কিছুটা উপকারে লেগেছিল। কেন না, ঐ টাকা নিয়ে কন্যা মঞ্জুশ্রীর বিয়ে দিতে পেরেছিলেন।

রূপসী বাংলা, বেলা অবেলা কালবেলা, কবিতার কথা ও অন্যান্য গ্রন্থ

জীবনানন্দের মৃত্যুর বছর তিনেক পরে সিগনেট প্রেস থেকে তাঁর *রূপসী বাংলা* কাব্য-গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়।

এই বইয়ের প্রথম সংস্করণে অশোকানন্দ দাশ যে ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন, তা এই :

> এই কাব্য-গ্রন্থে যে কবিতাগুলি সংকলিত হ'ল, তাব সবগুলিই কবির জীবিতকালে অপ্রকাশিত ছিল, তাঁর মৃত্যুব পরে কোনো কোনো কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায প্রকাশিত হযেছে।
>
> কবিতাগুলি প্রথম বাবে যেমন লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনিই পাণ্ডুলিপিবদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত ছিল ; সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত। পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাববেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এ-সব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যাযের শেষের দিকে ফসল।
>
> কবির কাছে 'এঁরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপর পক্ষে সার্বিক বোধে এক শরীরী ; গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশ প্রসৃতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পবিপূরকের মতো পরস্পর নির্ভর।...
>
> ৩১শে জুলাই, ১৯৫৭ — অশোকানন্দ দাশ

রূপসী বাংলার কবিতাগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে বলা হয়েছে, মার্চ ১৯৩২। একথা সম্পূর্ণ সত্য নয় বলে মনে হয়। কারণ :

১. যদিও এই বইয়ের কবিতাগুলি ভাবের ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে জীবনানন্দের অন্যান্য বহু কবিতার চেয়েই সহজ ও সরল, তবুও সন্দেহ হচ্ছে, মাত্র ১ মাসে এই ৬১টি কবিতাই কি তিনি লিখেছিলেন? জীবনানন্দ কি দ্রুত কবিতা লিখতেন? আর ঐ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের মার্চে তাঁর মানসিক অবস্থাও কি খুব শান্তিপূর্ণ ছিল? তখন তিনি বিবাহিত এবং একটি কন্যারও পিতা, অথচ তিনি প্রায় সম্পূর্ণ বেকার।

২. 'রূপসী বাংলা'র একটি কবিতা 'তুমি কেন বহু দূরে' শিরোনামে ১৩৬৪ সালের

৩২শে শ্রাবণ সংখ্যা সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। সেখানে এই কবিতার শেষে লেখা আছে— রচনাকাল ১৯৩৪ মার্চ।

জীবনানন্দ কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতার নীচে রচনার তারিখ দিতেন না। তাই রূপসী বাংলার কবিতাগুলির রচনাকালের কথা যে বলা হয়েছে, তা অশোকানন্দবাবুই নিজের হিসাব মতো বলেছেন, মনে হয়।

অশোকানন্দবাবু বলেছেন, এই গ্রন্থের কবিতাগুলি সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত অবস্থায় ছিল। তাই কি? তবে আমরা জানি—

জীবনানন্দ তাঁর কবিতাকে বার বার পরিমার্জিত করতেন। তাই *রূপসী বাংলা*-র কবিতাগুলি আজ যে-পরিমাণে আমাদের কাছে হৃদয়-গ্রাহী, সেগুলি নিঃসন্দেহেই আরও বেশি হৃদয়-গ্রাহী হ'ত, যদি সেগুলি কবি কর্তৃক পরিমার্জিত হবার সুযোগ পেত?

রূপসী বাংলা গ্রন্থটি উৎসর্গ পত্রে লেখা আছে, 'উৎসর্গ— আবহমান বাংলা, বাঙালী'।

এই উৎসর্গ পত্রটি করার মতো, বইটির নামকরণও মনে হয় অশোকানন্দবাবু ও প্রকাশক এঁরা মিলেই করেছেন। জীবনানন্দের এই বইয়ের একটি কবিতার একটা জায়গায় 'রূপসী বাংলা' কথাটা আছে। মনে হয়, ঐ 'রূপসী বাংলা' শব্দটা দেখেই এঁরা বইয়েরও নামকরণ করেছেন 'রূপসী বাংলা'। যে কবিতায় রূপসী বাংলা আছে, সেই কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম :

তোমার বুকের থেকে একদিন চ'লে যাবে তোমার সন্তান
বাংলার বুক ছেড়ে চ'লে যাবে ; যে ইঙ্গিতে নক্ষত্রও ঝরে,
আকাশের নীলাভ নরম বুক ছেড়ে দিয়ে হিমের ভিতরে
ডুবে যায়, — কুয়াশায় ঝরে পড়ে দিকে দিকে রূপশালী ধান
একদিন ; — হয়তো বা নিমপেঁচা অন্ধকারে গা'বে তার গান,
আমারে কুড়ায়ে নেবে মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে—
হৃদয়ে ক্ষুদের গন্ধ লেগে আছে আকাঙ্ক্ষার— তবুও তো চোখের উপরে
নীল মৃত্যু উজাগর— বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ—
কখন মরণ আসে কেবা জানে— কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে— ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ
জানি নাকো ;— তবু যেন মরি আমি এই মাঠ ঘাটের ভিতর ;
কৃষ্ণা-যমুনার নয়— যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে— রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে ; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।

কবি এই কবিতাটির কোনো নামকরণ করেননি। এই কবিতাটির ন্যায় 'রূপসী

বাংলা'র কোনো কবিতারই নাম নেই। এই বইয়ের প্রায় সব কবিতাই গ্রামবাংলার চিত্রের সঙ্গে কবির নিজের মনের কথা মিলিয়ে চিত্র আঁকা।

রূপসী বাংলা প্রকাশিত হওয়ার অনেক বছর পরে ১৯৫০-র ২৪শে ফেব্রুয়ারি কলকাতায় *প্রতিক্ষণ*-এর প্রকাশন বিভাগ থেকে *রূপসী বাংলা— প্রকাশিত অপ্রকাশিত* গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে প্রতি কবিতার সঙ্গে যেমন কবিতার পাণ্ডুলিপির প্রতিলিপি দেওয়া হয়েছে, তেমনি বইয়ে প্রকাশিত কবিতার পাঠান্তরও দেখানো হয়েছে।

জীবনানন্দের মৃত্যুর প্রায় সাড়ে ছ'বছর পরে ১৯৫০ সালের বৈশাখ মাসে অশোকানন্দ দাশ তাঁর নিউ স্ক্রিপ্ট নামক পুস্তক প্রকাশন প্রতিষ্ঠান থেকে জীবনানন্দের *বেলা অবেলা কালবেলা* নামে একটি কবিতার বই প্রকাশ করেন। এই বইয়ে জীবনানন্দের মোট ৩৯টি কবিতা আছে। এই কবিতাগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে অশোকানন্দবাবু বলেছেন, রচনাকাল ১৯৩৪-১৯৫০।

অশোকানন্দবাবু এই বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে বইয়ের প্রথমেই লিখেছেন, '*সাতটি তারার তিমির*-এর সমসাময়িক ও তার পরবর্তী পর্যায়ে কবিতার সংকলন এই কাব্যগ্রন্থ।' তিনি আরও বলেছেন :

> এই গ্রন্থের সমস্ত কবিতাই এর আগে প্রকাশিত হয়েছিল। বেশির ভাগ কবির জীবিতকালে, কয়েকটি তাঁর মৃত্যুর পরে। কবির জীবিতকালে প্রকাশিত প্রায় সব ক'টি কবিতাই পরে কবি-কর্তৃক কম-বেশি পরিমার্জিত হয়েছিল, সুতরাং প্রথম প্রকাশিত রূপের সঙ্গে বর্তমান রূপের অনেক প্রভেদ ঘটেছে। গ্রন্থাকারে প্রকাশ করবার জন্য কবি নিজেই কবিতাগুলি বাছাই করেছিলেন। এই কবিতা গ্রন্থের নামটি কবি কর্তৃক মনোনীত।

ধূসর পাণ্ডুলিপি ১ম সংস্করণে লেখকের জায়গায় 'জীবনানন্দ দাশ প্রণীত' থাকায় তিনি বলেছেন— ওর জন্য আমি দায়ী নই। 'প্রণীত' বুদ্ধদেব বসুর লেখা। এই *বেলা অবেলা কালবেলা* বইয়েও দেখি অশোকানন্দবাবু লিখেছেন, 'জীবনানন্দ দাশ প্রণীত'। এবারেও এ সম্বন্ধে কেউ তাঁকে কিছু বললে, তিনি নিশ্চয়ই বলতেন, 'ওর জন্যে আমি দায়ী নই'।

আর একটা কথা। যদিও সেটা প্রণীত লেখার মতো কিছুই নয়, তবুও চোখে পড়ার মতো এবং তাতে জীবনানন্দের চরিত্রের একটি বিশেষ দিকও লক্ষ্য করার মতো। সেটা এই :

জীবনানন্দ তাঁর সমস্ত বইয়েরই যে রচনাকাল বলেছেন, তা সবই বঙ্গাব্দের হিসাবে এবং যে সব বইয়ে ভূমিকা লিখেছেন, সেখানেও ভূমিকা লিখে বঙ্গাব্দের তারিখ দিয়েছেন। কি রচনাকালের উল্লেখ আর কি ভূমিকার তারিখে কোথাও তিনি খ্রীষ্টাব্দ ব্যবহার করেননি। অথচ জীবনানন্দের *রূপসী বাংলা* ও *বেলা অবেলা কালবেলা* গ্রন্থে অশোকানন্দবাবু ভূমিকায় তারিখে এবং কবিতার রচনাকালের উল্লেখে সর্বত্রই খ্রীষ্টাব্দ ব্যবহার করেছেন।

জীবনানন্দের *কবিতার কথা* বইটি তাঁর মৃত্যুর ৯ বছর ৪ মাস পরে অর্থাৎ ১৩৭০ সালের ফাল্গুন মাসে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বইটি প্রকাশ করেন সিগনেট প্রেস। এতে প্রবন্ধ আছে মোট ১৫টি। সেই ১৫টি প্রবন্ধের নাম যথাক্রমে এই :

১. কবিতাব কথা
২. রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা
৩. মাত্রা চেতনা
৪. উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য
৫. কবিতা প্রসঙ্গে
৬. কবিতার আত্মা ও শরীর
৭. কি হিসেবে শাশ্বত
৮. কবিতা পাঠ
৯. দেশ, কাল ও কবিতা
১০. সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা
১১. রুচি, বিচার ও অন্যান্য কথা
১২. কবিতার আলোচনা
১৩. আধুনিক কবিতা
১৪. বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ
১৫. অসমাপ্ত আলোচনা।

এই প্রবন্ধগুলির রচনাকাল সম্বন্ধে গ্রন্থে বলা হয়েছে, রচনাকাল ১৩৪৫ সাল থেকে ১৩৬০ সালের মধ্যে।

এই প্রবন্ধগুলির মধ্যে অনেকগুলি *পূর্বাশা* মাসিক পত্রিকায় প্রথমে প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, 'কবিতা, তার আলোচনা' (এই নামটি বইয়ে পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে— *কবিতার আলোচনা*) প্রবন্ধটি ১৩৫৬ সালের বৈশাখ মাসে, 'কবিতা পাঠ' ১৩৫৬-র আষাঢ়ে, 'দেশ, কাল ও কবিতা' ১৩৫৬-র আশ্বিনে, 'সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা' ১৩৫৬-র মাঘে, 'রুচি বিচার ও অন্যান্য কথা '১৩৫৬-র চৈত্রে প্রকাশিত হয়েছিল।

কবিতা পত্রিকাতেও এই বইয়ের প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন, 'কবিতার কথা' প্রবন্ধটি ১৩৪৫ সালের বিশেষ সংখ্যা বৈশাখের কবিতায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই প্রবন্ধটির নাম নিয়েই বইয়ের নাম হয়েছে, *কবিতার কথা*। 'কবিতার কথা' প্রবন্ধের আরম্ভটা এইরূপ :

> সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি ; কবি— কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকিরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে ; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে

না ; যাদের হৃদযে কল্পনা ও কল্পনার ভিতবে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সাববত্তা রয়েছে তাবাই সাহায্য প্রাপ্ত হয ; নানা বকম চরাচবের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি কববার অবসর পায়।

জীবনানন্দের চরিত্রের কয়েকটি দিক

আত্মসম্মান-বোধ

জীবনানন্দ তখন বরিশালের বি. এম. কলেজের অধ্যাপক। সেই সময় ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালে এস. ডি. ও. হয়ে এলেন অবনীমোহন কুশারী। অবনীবাবু শাসন বিভাগের লোক হলেও একজন উঁচুদরের কাব্য-রসিক। তিনি বরিশালে আসার আগে থেকেই জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে পরিচতি ছিলেন এবং জীবনানন্দের কবিতার একজন বড় ভক্তও ছিলেন। অবনীবাবু বরিশালে এসে বি. এম. কলেজের এক অধ্যাপক তাঁর বন্ধু হেরম্ব চক্রবর্তীর মারফৎ জীবনানন্দের সঙ্গে পরিচিত হলেন। এই পরিচয় ক্রমে তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। ঐ সময় অবনীবাবু একবার তাঁর সরকারী কাজে জলপথে দক্ষিণ বরিশাল যাওয়ার সময় হেরম্ববাবু ও জীবনানন্দকে সঙ্গে নিয়েছিলেন।

অবনীবাবুর সেবারের ভ্রমণ-সূচী ছিল সপ্তাহ খানেকের এবং তাঁরা যাত্রা করেছিলেন একটা সরকারী সুসজ্জিত বোটে করে। ঐ জলপথে ভ্রমণের সময় একদিন এক জায়গায় এমন একটা ঘটনা ঘটল, যাতে জীবনানন্দ অবনীবাবুর তুলনায় সম্মানে নিজে ছোট হয়ে গেলেন ভেবে, তৎক্ষণাৎ ঐ বোট ছেড়ে চলে এলেন।

সেবারের ঐ জলপথে ভ্রমণ প্রসঙ্গে হেরম্ববাবু যা লিখেছেন, এখানে তা উদ্ধৃত করে দিলাম :

> জীবনানন্দকে তাঁর পরিবেশ-বিচ্ছিন্নরূপে পাবার একটা সুযোগ হয়েছিল। জনৈক ডেপুটি বন্ধুর নির্বন্ধাতিশয্যে সুযোগটি জুটে গেল। শ্রীযুক্ত অবনীমোহন কুশারী নতুন ডেপুটি হয়ে বরিশালে এলেন। ইনি কাব্য-রসিক, সমঝদার ও স্ফূর্তিবাজ লোক। জীবনানন্দের কবিত্বে ইনি ঢাকায় থাকতেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। বরিশালে কবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগে কৃতার্থ হলেন। সরকারী কাজে বরিশালে দক্ষিণাঞ্চলে সফরে যাবেন। তাঁর সঙ্গী হবার জন্য ধরে পড়লেন কবিকে আর আমাকে। সাত আট দিন একটানা নৌকা ভ্রমণ, সরকারী 'বোটে' প্রচুর আরামের ব্যবস্থা, উন্মুক্ত প্রকৃতির উদার নির্জনতায় নিভৃত অভিসার। অনেক অনেক অনুরোধে কবিকে রাজি করানো হল।
>
> সেই যাত্রায় কবির সান্নিধ্যের স্মৃতি মনের ভাণ্ডারে অক্ষয় হয়ে আছে।

'দেখনি কি উড়ে গেল প্রান্তরের কাক'— কবির লেখা এই পংক্তিটি অবনীবাবু নানা কায়িক ও বাচিক ভঙ্গিতে আবৃত্তি করতে ভালবাসতেন। আমাদের বোটখানা ছাড়তেই প্রভাতী আলোয় অবনীবাবু আবৃত্তি করে চললেন পংক্তিটি। কবি বড় কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। আমি ফোঁড়ন কেটে বললাম, 'কোটরের নির্জন পেঁচা এবার প্রান্তরের উড্ডীয়মান কাক হয়ে পড়েছে।' এ মন্তব্যটার ফল হয়েছিল বড় খারাপ। আমরা আমাদের যাত্রায় কবিকে দিয়ে তাঁর একটি কবিতাও আবৃত্তি করাতে পারিনি। ইলয়ট, লরেন্সের কবিতার ব্যাখ্যা শোনাতেন, কাব্যে রোমান্টিকতার তাৎপর্য দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতেন ; কিন্তু নিজের কবিতার প্রসঙ্গ উঠলেই বোটের ছাদ থেকে নেমে নিজের কক্ষের দ্বার রুদ্ধ করতেন।... বোটের ছাদের উপর বসে কবি আগ্রহকুল দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকতেন হৈমন্তী পৃথিবীর দিকে। শর-কাশ-হোগলা-ঘেরা হলুদ নদীর তীর বেয়ে সন্ধ্যায় কাক তখন ঘরে ফিরত অথবা পড়ন্ত রোদে সোনালী চিলের চলমান ডানা নিথর হয়ে আসত। বর্ণসুষমায় ঘেরা পৃথিবীর দিকে চেয়ে কবি আড়ষ্ট, অভিভূত হয়ে যেতেন।...

আমাদের নৌকা যাত্রায় জীবনানন্দবাবু বেশি দিন থাকতে পারেননি। সরকারী কাজে মাঝে মাঝে বোটখানা গ্রামের পাশে থামত। রঙীন পান্‌শীর রূপে আকৃষ্ট কৌতূহলী জনতার ভিড় হ'ত। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট মেম্বাররা এসে সেলাম ঠুকতেন। ডেপুটিবাবু পরিচয় করিয়ে দিতেন দিগ্‌গজ অধ্যাপকদ্বয়কে, বিশেষ করে কবিকে। যিনি কেতাব লেখেন। সরকারের কৃপা-ভিখারী একজন প্রেসিডেন্ট সাহেব তো ডেপুটি হুজুরকে বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে তুলনা করে আরও সাতটি রত্নের সন্ধান জানতে চাইলেন। এই ঘটনা কবির কাছে অসহ্য হয়ে দাঁড়াল। কৌতুকের পরিবর্তে বিরক্তিতে কবির মন মেঘাচ্ছন্ন হয়ে রইল। পরদিন একটা স্টীমার স্টেশনের হদিশ পেয়ে কবি বরিশালগামী এক স্টীমারে চেপে বসলেন।

হেরম্ববাবুর এই লেখা থেকে দেখা যাচ্ছে— জীবনানন্দ হয়ত ভেবেছিলেন, সরকারের কৃপাপ্রার্থী ব্যক্তিরা নিজেদের প্রয়োজনে তোষামোদ করে এস. ডি. ও.-কে সব সময় উচ্চ সম্মান দেবেই, আর এস. ডি. ও.-র সঙ্গে থেকে তিনি ওদের চোখে এস. ডি. ও. অপেক্ষা সর্বদা ছোট হয়েই থাকবেন। অতএব আত্মসম্মান লাঘব করে এই রকম ভ্রমণে আর দরকার নেই— এই ভেবেই তিনি দল ত্যাগ করে চলে এসেছিলেন।

এই ব্যাপারে আরও একটা জিনিস লক্ষ্য করার এই যে, জীবনানন্দ এবং হেরম্ববাবু উভয়েই অধ্যাপক মানুষ হলেও, হেরম্ববাবু অপেক্ষা জীবনানন্দের অনুভূতি ও আত্মসম্মান বোধ প্রখর ছিল। তাই হেরম্ববাবু না এলেও তিনি ফিরে এসেছিলেন।

বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দ সম্বন্ধে লিখেছেন :

আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সব চেয়ে নির্জন, সব চেয়ে স্বতন্ত্র।

তিনি আরও বলেছেন :

তিনি যে আমাদের 'নির্জনতম' কবি, অত্যধিক পুনরুক্তিবশত এই কথাটার ধার ক্ষয়ে গেলেও যথার্থে আমি এখনও সন্দেহ করি না।

বুদ্ধদেববাবুর এই সব কথা পড়েই হয়ত জীবনানন্দ একদিন বড়িযা কলেজে তাঁর সহকর্মী অধ্যাপক নিরঞ্জন চৌধুরীর কাছে কথা-প্রসঙ্গে বলেছিলেন :

নির্জন কবি, নির্জন কবি বলে বলে বুদ্ধদেব বসু আমাব সম্বন্ধে একটা লিজেণ্ড খাড়া করেছেন, যেটা আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঠিক নয়।

জীবনানন্দ তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থের ভূমিকাতেও বুদ্ধদেববাবুর নাম না করলেও, প্রায় এই কথাই বলেছেন। তিনি লিখেছেন :

আমার কবিতাকে বা এ কাব্যেব কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে। কেউ বলেছেন, এ কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার...প্রায় সবই আংশিক ভাবে সত্য।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর ছোটবোন সুচরিতা দাশ লিখেছিলেন :

দাদার সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত। তিনি জীবন থেকে পালিয়েছেন। তিনি মানুষের সখ্য সহ্য করতে পাবেন না। তিনি নির্জন, তিনি নিরিবিলি। সব কোলাহল থেকে দূবে। এ সব বাক্য গঠনের সত্য-সত্যতা কতটুকু তা আমার বিবেচ্য নয়, যদিও এ সবের অনেকগুলোই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে হয়ত এতদিন। (কাছের জীবনানন্দ)

সুচরিতা দেবী তাঁর দাদার সম্বন্ধে এই কথাগুলো লিখবার সময় খুব সম্ভব 'কল্লোলযুগ' গ্রন্থে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর জীবনানন্দ সম্বন্ধে মন্তব্যগুলোও মনে করেছিলেন। কেন না অচিন্ত্যবাবু লিখেছেন :

সে যেন এই সংগ্রাম-সংকুল সংসারের জন্যে নয়, সে সংসার-পলাতক। ...যেখানে অনাহূত ধ্বনি ও অলিখিত রং জীবনানন্দের আড্ডা সেইখানে।

অনেক মানুষ আছেন, যাঁরা হৈ হুল্লোড় বা বেশি কথা বলা পছন্দ করেন না। এঁরা স্বভাবতই একটু শান্ত, গম্ভীর ও স্বল্পবাক্ প্রকৃতির মানুষ হন। জীবনানন্দ ছিলেন এই প্রকৃতির মানুষ। তাই বলে তিনি লোকের সঙ্গে না মিশে নির্জনে থাকতে ভালবাসতেন বা কারো সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা ও গল্পগুজব করতেন না, তা মোটেই নয়। জীবনানন্দের সঙ্গে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন তাঁদের কাছ থেকে শুনেছি এবং ঐরূপ কারও কারও লেখাতেও পড়েছি যে তিনি রীতিমতো গল্পগুজব এবং হাসি-ঠাট্টা সবই করতেন। বর্তমান গ্রন্থকারও তাঁর সঙ্গে প্রায় দুই বৎসর মিশে দেখেছেন যে, তিনি রীতিমতো সহজ, সরল, মিশুক ও গল্পপ্রিয় মানুষ ছিলেন।

তবে এটা ঠিক যে, জীবনানন্দের আত্মসম্মান বোধ প্রখর থাকায় তিনি সকলের

সঙ্গেই প্রাণ খুলে মিশতেন না, আর আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে ভেবে অনেকের কাছ থেকে দূরেও থাকতেন। তাই বাইরে থেকে দেখে অনেকেই তাঁকে অমিশুক ও নির্জনতম বলে মনে করতেন। কিন্তু আসলে তিনি তা ছিলেন না।

হাওড়া গার্লস কলেজে জীবনানন্দের সহকর্মী অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষও এইভাবে ভুল করে একদিন জীবনানন্দকে প্রশ্ন করেছিলেন। এ সম্বন্ধে অজিতবাবু লিখেছিলেন :

> কথায় কথায় একদিন জিজ্ঞাসা করেই বসলাম— কারও বাড়ি যান না কেন?
>
> — কেন যাই না? এই জন্যে যে যাদের বাড়ি যাব, তারা তো বিরক্ত বা বিব্রত হতে পারে।
>
> — কেন তারা তো আনন্দিতও হতে পারে?
>
> — আমোদ আর আনন্দ বুঝি এক জিনিস? ...আপনি কি করেন।
>
> — আমি সব জায়গায় যাই। আমার মাথা ছোট, সব দরজাতেই ঢোকে। কোথাও আটকে যায় না।
>
> — কিন্তু লৌহকপাট খোলা থাকলেই কি ঢুকতে পাবেন?
>
> — কেন পারব না?
>
> — সে খোলা দরজার সামনে যদি থাকে ছোট ছোট কাঁটা ছড়ানো উন্নাসিকতার, আভিজাত্যের, আত্মাভিমানের?...
>
> সদর দরজা অনেকেরই খোলা থাকে, কিন্তু তা ঘেরা থাকে অদৃশ্য উঁচু প্রাচীর দিয়ে কোথাও বা প্রাচীরটি অর্থের, কোথাও বা অহঙ্কারের। তাই তো আমি আমার অভ্যাসের প্রাচীর ভাঙতে পারি না।
>
> — (জীবনানন্দ প্রসঙ্গ, জীবন-নদীর তীরে)

জীবনানন্দ কেন যে তাঁর অনেক পরিচিত বন্ধুর বাড়িও যেতেন না এবং তাঁদের বা অপর অনেকের সঙ্গেও প্রাণ খুলে মিশতেন না, অজিতবাবুর কাছে জীবনানন্দের নিজের মুখে বলা এই কথা ক'টা থেকেই তা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে।

হাসি

জীবনানন্দ তাঁর সুখে ও দুঃখে, প্রশংসায় ও বিদ্রূপে, সচ্ছলতায় ও অসচ্ছলতায়— সকল অবস্থাতেই হাসির সামান্যতম সূত্র পেলেই প্রাণখোলা হাসি হাসতেন। এমন কি হাসির কোনো কথা না হলেও, আগের কোনো হাসির প্রসঙ্গ স্মরণ করে আপন মনেই কখনো কখনো জোরে হেসে উঠতেন। তাই সঞ্জয় ভট্টাচার্যও এক প্রবন্ধে লিখেছেন :

> পাশাপাশি গণেশ এভিনিউতে হেঁটে দেখেছি, একটি কথাও বলছেন না বা হঠাৎ কী মনে হওয়াতে জোরে হেসে উঠলেন হয তো। (কবি জীবনানন্দ দাশ)

জীবনানন্দের বেদনা ও আনন্দ— সকল সময়েরই তাঁর এই উচ্চ হাসিকে কেউ বলেছেন— উৎকট হাসি, কেউ বলেছেন, অট্টহাসি, কেউ বলেছেন, মেজাজী হাসি, কেউ বলেছেন, দেখবার মতো হাসি ইত্যাদি। জীবনানন্দের এই হাসিকে যিনি যে-নামেই অভিহিত করুন না কেন, একথা ঠিক যে, তাঁর মন যে কতখানি সরল, নির্মল ও নির্বিকার ছিল, তার প্রমাণ দেয়, তাঁর এই অনন্যসুলভ প্রাণখোলা হাসিও।

জীবনানন্দের এই হাসির কয়েকটা কাহিনী এখানে এখন বলছি,

বরিশালে বি. এম. কলেজে জীবনানন্দের কয়েকজন সহকর্মী অধ্যাপক তাঁর কবিতা নিয়ে তাঁকে বিদ্রূপ করতেন, তা আগেই বলেছি। এঁদের এই ব্যঙ্গ বিদ্রূপে জীবনানন্দ তখন যা করতেন, সে সম্বন্ধে অন্যতম বিদ্রূপকারী হেরম্ব চক্রবর্তী লিখেছেন :

> পরমুহূর্তে উৎকট হাস্যের একটা দমকা এসে উড়িযে নিযে গেল বিদ্রূপের ধূম্ররাশি। এই হেবম্ববাবুই জীবনানন্দের হাসি সম্বন্ধে আরও বলেছেন— তাঁকে দেখলেই মনে হ'ত একটা অগ্নিগর্ভ শান্ত সৌম্য পর্বত, হাসলে মনে হ'ত লাভা স্রোতের আকস্মিকতা।

বরিশালে বি. এম. কলেজে জীবনানন্দের ছাত্র আবুল কালাম শামসুদ্দীন জীবনানন্দের একবারের হাসি সম্বন্ধে লিখেছেন :

> কলেজে একদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় এক প্রগতিশীল ছাত্র কবি হঠাৎ কথার মাঝখানেই তাঁকে প্রশ্ন করলে— আপনি জনগণেব কবিতা লেখেন না কেন? জীবনানন্দবাবু এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কযেকবার তার এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আস্তে প্রশ্ন করলেন— তুমি এই প্রগতিশীল সাহিত্য আন্দোলনের মধ্যে আছ বুঝি?
>
> সে বললে— হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা এই সমাজ ব্যবস্থাকে বদলাতে চাই— কায়েম করতে চাই শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা। সেখানে কবি, সাহিত্যিকরাও আমাদের সঙ্গে আসবেন। তাঁদের বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি পরিত্যাগ করে মার্কস্‌বাদ যে নতুন পথ দেখিয়েছে...
>
> কথার মাঝখানেই জীবনানন্দবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন— তুমি কার্ল মার্কস্ পড়েছ? ডস্ ক্যাপিটাল?
>
> ছাত্র কবিটি থতমত খেয়ে বললে— না।
>
> জীবনানন্দবাবু একটু কাল তার দিকে তাকিয়ে হাসি গোপনের বহু চেষ্টা করেও অকস্মাৎ উচ্চ হাস্যে ফেটে পড়লেন। হঠাৎ সে হাসি। এমন অচম্বিতে বেরিয়ে আসা যে, অবাক হয়ে দেখতে হয় তাঁকে। সঙ্গে হাসা যায় না।

ছাত্রটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পালিয়ে বাঁচলো। (কবি জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে— ময়ূখ, জীবনানন্দ সংখ্যা।)

বি. এম. কলেজে জীবনানন্দের আর এক ছাত্র অরবিন্দ গুহ, তাঁর ইন্দ্রমিত্র এই ছদ্ম নামে, জীবনানন্দের হাসি প্রসঙ্গে এক প্রবন্ধে লিখেছেন—

ওঁর বাড়ি (কলকাতায়) গিয়েছি। দেখি শুয়ে আছেন।. .
বললেন— জ্বর হয়েছে।...
জীবনানন্দ খাট ছেড়ে জানালার কাছে গেলেন। তাক থেকে একটা ওষুধ ভর্তি শিশি এনে বললেন— ডাক্তার আমাকে এই ওষুধ খেতে দিয়েছে। ...কি খেয়াল হ'ল কে জানে, জীবনানন্দ শিশির ছিপি খুলে ওষুধের গন্ধ শুঁকলেন। বললেন— দারুচিনির গন্ধ।
তাবপব পথ্যেব প্রসঙ্গ। — আজ রাত্রে কি খাব?
আমি বললাম— রুটি খান।
— ঠিক। — জীবনানন্দ ডান হাতেব তর্জনি উঁচু কবে বললেন— ঠিক! ডাক্তাবও আমাকে রুটি খেতে বলেছেন।
হেসে উঠলেন। নিজস্ব হাসি। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠতেন, প্রচণ্ড শব্দে। অকস্মাৎ তিনি হাসি থামাতেন। যেন দুরন্ত হাস্য স্রোতকে ঠোঁটের ওপারে বন্দী করে ফেলতেন। বাঁধ ভেঙে হাসি যখন বেরিয়ে আসত, মনে হতো কী বিশাল আনন্দ ঐ হাসির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে।— (*আমি চলে যাব*— আনন্দবাজার পত্রিকা— সাহিত্য জগৎ, ১৮ই অগ্রহায়ণ ১৩৬১)।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে হাওড়া গার্লস কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী লিখেছিলেন :

আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশের সাহচর্য-সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি নাই। কিন্তু এই স্বল্প কালের মধ্যেই আমরা তাঁহার সহিত একটা নিবিড় প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারিয়া ছিলাম। জীবনানন্দের যে বিচিত্র মনোরম পরিচয় আমরা পাইয়াছি স্মৃতির ভাণ্ডারে তাহাব মূল্য অপরিমেয়। তিনি নিঃসঙ্গ নির্জনতার কবিরূপেই আখ্যাত হইয়াছেন ; কিন্তু তিনিও যে একজন সঙ্গ-লোভী সামাজিক মানুষ ছিলেন, আমাদের আনন্দ উৎসবের অন্যতম অংশভাগ ছিলেন, সে কথা আমরা ভুলি কি করিয়া? মাঝে মাঝে তাঁহার সেই শব্দহীন অট্টহাস্য সমগ্র সত্তার আত্ম বিকিরণ— এখনও চিত্তপটে অম্লান হইয়া আছে।

কেশববাবু লিখেছেন, শব্দহীন অট্টহাস্য। কথাটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কেন না, জীবনানন্দ উচ্চ হাসির সময় অট্টহাস্যর মতোই হাসতেন। তবে সাধারণে অট্টহাসির সময় যেমন হাসির চেয়ে শব্দ করে বেশি, জীবনানন্দের হাসি কিন্তু তা ছিল না।

শুধু হাসির প্রয়োজনে যেটুকু শব্দ হওয়া দরকার তাই হ'ত। সেখানে হাসিই ছিল প্রধান, শব্দ নগণ্য। এই জন্য কেশববাবু জীবনানন্দের ঐ উচ্চহাসিকে শব্দহীন অট্টহাস্য বলেছেন।

কেশববাবুর এই লেখাটি থেকে জীবনানন্দের শব্দহীন অট্টহাস্য ও সমগ্র সত্তার আত্ম-বিকিরণের কথাই শুধু নয়, জীবনানন্দ যে কিরূপ সঙ্গ-লোভী সামাজিক মানুষ ছিলেন এবং অপরের আনন্দ উৎসবের অন্যতম অংশভাগী ছিলেন, তারও পরিচয় পাই।

জীবনানন্দের ছোটভাই অশোকানন্দবাবু বলেন :

দাদার তখন চাকরি নেই। দাদা ও আমি একসঙ্গে ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে একত্রে থাকি। সেই সময় একদিন সকালে পিওন দাদাকে একটা চিঠি দিয়ে গেলে, সেই চিঠি পড়েই উচ্চস্বরে দাদার কি হাসি!

আমি কাছে গিয়ে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় দাদা বললেন— কলকাতার বাইরে একটা কলেজে একজন ইংরাজির অধ্যাপক নেবে বলে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল। সেই বিজ্ঞাপন দেখে একটা দরখাস্ত করেছিলাম। অমুক' এখন ওখানে একটা সরকারী উচ্চপদে আছে। তাই দরখাস্ত করার পর তাকে এ বিষয়ে একটু চেষ্টা করতে বলেছিলাম। উত্তরে সে লিখেছে— ঠাকুরের যদি ইচ্ছা হয় হবে। না হ'লে আমিই বা কে, আর তুমিই বা কে।

এই কথা বলেই দাদার আবার সে কি হাসি!

অশোকানন্দবাবুর বলা এই কাহিনীটিতে দেখা যাচ্ছে, জীবনানন্দ তাঁর অভাবের সময়েও সামান্য কারণেই তাঁর সেই নিজস্ব উচ্চ হাসিটা হাসতেন।

জীবনানন্দ হাসির সময় স্থান কালের কথাও ভুলে যেতেন। এখানে আমার দেখা তাঁর এইরূপ একটা হাসির কাহিনী বলছি :

জীবনানন্দের সঙ্গে যখন আমার পরিচয় হয়, তখন আমি *ভারতবর্ষ* মাসিক পত্রিকায় কাজ করতাম। ভারতবর্ষে আমার এক সহকর্মী ছিলেন বিশ্বনাথ চট্টোপাধ্যায়। জীবনানন্দের সঙ্গে আমার খুব পরিচয় আছে শুনে এই বিশ্বনাথবাবু একদিন বিকালে আমার সঙ্গে জীবনানন্দের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য তাঁকে দেখা ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করা। বিশ্বনাথবাবু নিজেও একজন সাহিত্যিক, তাই জীবনানন্দকে দেখা, ও তাঁর সঙ্গে আলাপ করায় তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ।

সেদিন আমরা জীবনানন্দের বাড়ি থেকে চলে আসবার সময় তিনি আমাদের খানিক দূর পর্যন্ত আগিয়ে দিতে এলেন। আমরা তাঁর বাড়ির উত্তর দিকে একটু দূরের বিপিন পাল রোড হয়ে আসব বলায়, তিনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে বিপিন পাল রোড পর্যন্তও এলেন।

বিপিন পাল রোডে এসে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা আবার কিছুক্ষণ কথা বলতে লাগলাম। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা এসে গেল। ঐ সময় কথায় কথায় কি একটা হাসির কথা উঠলে জীবনানন্দ সহসা এমন জোরে হেসে উঠলেন যে, আমরাও যে ঐ হাসির কথায় তাঁর সঙ্গে হাসব তা আর হ'ল না, উল্টে আমরা অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

তিনি হাসি থামালে, তাঁর মুখ থেকে চোখ ফিরিয়ে পথের দিকে চেয়ে দেখি, আশপাশের পথচারীরা অবাক বিস্ময়ে আমাদের দিকে, বিশেষ করে জীবনানন্দের দিকে চেয়ে আছেন। তাঁরা হঠাৎ ঐরূপ সরল ও অস্বাভাবিক উচ্চ হাসি শুনে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছেন এবং জীবনানন্দের ঐ হাসি দেখছিলেন। জীবনানন্দ হাসি থামালে পরে ঐ বিস্মিত ও হতবাক্ পথচারীরা যে যার পথে চলে গিয়েছিলেন।

ঐ হাসির ঘটনার পর আরও কিছুক্ষণ কথা বলে, আমরা তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিই। ফিরে আসবার সময় পথে বিশ্বনাথবাবু বললেন— জীবনানন্দবাবুর মনটা একেবারে শিশুর মতই সরল। না হলে, অমন করে প্রাণ খুলে অত জোরে কেউ কখনই হাসতে পারে না।

আমি বললাম— আর এই হাসির জন্য তিনি স্থান কালের কথাও ভুলে যান। সন্ধ্যায় পথে দাঁড়িয়ে অত জোরে হাসলে কে কি ভাববে তাও তিনি গ্রাহ্য করলেন না।

পরিহাস-প্রিয়তা

জীবনানন্দ নিজেই যে কেবল খুব হাসি হাসতেন তাই নয়, মজার মজার কথা বলে অপরকেও হাসাতে পারতেন। আর এই স্বভাব তাঁর ছেলেবেলা থেকেই ছিল। এ সম্বন্ধে দু-একটা কাহিনী এখানে বলছি।

জীবনানন্দ তখন কলকাতায় অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলে থেকে বি. এ. পড়ছেন। তাঁর ছোটভাই অশোকানন্দও তাঁর কাছে ঐ হস্টেলে থেকে কলকাতাতেই আই. এসসি. পড়ছেন। সেই সময়কারই একদিনের কথা-প্রসঙ্গে অশোকানন্দবাবু লিখেছেন :

> তখন কলেজে পড়ছি, অক্সফোর্ড মিশন হস্টেলে থাকি। দাদা বাইরে থেকে প্রায় দৌড়ে আমার ঘরে এসে একজন ধনী নামজাদা গম্ভীর প্রকৃতি অধ্যাপকের নাম করে বললেন যে, শীগ্‌গির দেখে যা, তিনি আমাদের হস্টেলের সামনে দিয়ে সাইকেলে চড়ে যাচ্ছেন। সেই অধ্যাপক সাইকেলে চড়ে যাবেন, তা এতই অবিশ্বাস্য যে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখবার জন্য বাইরে এসে দেখি যে, মলিন শার্ট গায়ে দিয়ে একজন ভদ্রলোক সত্যি সত্যিই যাচ্ছেন, উপরি উক্ত অধ্যাপকের সঙ্গে যাঁর অবয়বের অনেক সাদৃশ্য আছে।

এই কাহিনীটি বলতে গিয়েই অশোকানন্দবাবু লিখেছেন :

কলকাতার পার্কে, মাঠে, যেখানেই হিউমারের গন্ধ পেতেন দাঁড়িয়ে যেতেন। অদ্ভুত অস্বাভাবিক সব কিছুই তাঁর রসিকতা জ্ঞানকে সুড়সুড়ি দিত। অকুস্থান থেকে একটু দূরে গিয়ে হাওয়ার মতো হাসির ঝড় বইয়ে দিতেন।

এ সম্বন্ধে সুচরিতা দাশও লিখেছেন—

এত মজার কথা বলতে পারতেন যে, হেসে কুটিপাটি হয়ে যেতে হত। যে মানুষ অত গুরু গাম্ভীর্যের কবিতা লিখতেন, তিনি যে অমন চারিদিক উচ্চকিত করে প্রকম্পিত হাসি হাসতে পারতেন, বা অন্যকেও হাসিযে হাসিযে ক্লান্ত করে দিতে পারতেন, তা যেন না দেখলে বিশ্বাস করাই যায় না। ...পরিহাস ও কৌতুক-প্রিয়তা আমার মাতুল বংশের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বোধহয় লাভ করেছিলেন তিনি। আমার দাদামশায় ˚চন্দ্রনাথ দাশ খাঁটি পূর্ববঙ্গের ভাষায় বহু হাসির গান ও ছড়া রচনা করেছিলেন।

অল্প কথায় জীবনানন্দের পরিহাস করার দু-একটা ঘটনা এখানে বলছি— অশোকানন্দবাবু লিখেছেন :

১৯৫৩ সালে পুজোর সময় আমার দিল্লীর গৃহে অনেক আত্মীয় ও বন্ধুর সমাগম হয়েছিল। সকালবেলা আমাদের ঘরের পাশের বাথ্‌রুম হয়তো আটকা, দাদাকে জিজ্ঞেস করেছি আমার ঘর থেকেই— তোমার বাথ্‌রুম খালি আছে কি?— দাদা তক্ষুণি জবাব দিয়েছেন— দিল্লীর মসনদ কি কখনও খালি থাকে।

জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনাকালে একদিন কলেজ থেকেই সহকর্মী অধ্যাপক দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায়সহ কলেজের এক অধ্যাপক বন্ধুর বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঐ অধ্যাপক বন্ধুটি স্পষ্ট কথা বলতে এমন কি কড়া কথা বলতেও কখনও পিছপা হতেন না, এটা কলেজের অধ্যাপকরা সকলেই জানতেন।
ঐ বন্ধুর বাড়িতে সেদিনের যাওয়ার প্রসঙ্গে দুর্গাদাসবাবু লিখেছেন :

...বন্ধুবর চা জলখাবার ব্যবস্থা করলেন। চায়ের কাপে বার কয়েক চুমুক দিয়ে কবি (জীবনানন্দ) বললেন— দেখুন চা-টা যদি আপনার কথার মতো অন্তত কড়া হ'ত তাহলেও উপভোগ্য হ'ত।— সকলেই হেসে উঠলাম।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা। জীবনানন্দ তখন বরিশাল থেকে কলকাতায় চলে এসেছেন। তিনি কলকাতায় এসেছেন শুনে, তখন মুরারী সাহা নামে বরিশাল কলেজের তাঁর এক পুরাতন ছাত্র একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসেন। মুরারিবাবুর এই দেখা করতে আসার অবশ্য অন্য একটা উদ্দেশ্যও ছিল। তিনি তখন একটা সংকলন গ্রন্থ বার করার মতলব করেছিলেন এবং ঐ সংকলন গ্রন্থের জন্য জীবনানন্দের কাছে একটা কবিতা চাইতে এসেছিলেন।

এ সম্বন্ধে মুরারীবাবু লিখেছেন :

শতাব্দী নামে একটি সাহিত্য সংকলন বার করবার চেষ্টা করেছিলাম। জীবনানন্দের কাছে কবিতা চাইতে তিনি একটা ভাল কবিতা বেছে দিয়ে দিলেন। (যা অন্য কোনো ভাল কাগজের জন্য তিনি রেখে দিতে পারতেন)। আমি অতটা আশা করিনি। ...নানা বিপর্যয়ে শতাব্দী বার করতে অনেক দিন দেরি হ'ল। প্রায় ছমাস পরে তাঁর কবিতার প্রুফ নিয়ে দেখা করতে গেলাম। মৃদুহাস্যে বললেন— শতাব্দী বার করতে কি শতাব্দী লাগবে?— উত্তরসূরী, জীবনানন্দ সংখ্যা।

আবৃত্তি

জীবনানন্দ সভা-সমিতিতে বক্তা হিসাবে বড় একটা কোথাও যেতেন না। খুব সম্ভব কলেজের ক্লাসে পড়ানো ছাড়া সাধারণ সভায় তিনি তেমন বক্তৃতা দিতে পারতেন না বলেই হয়ত যেতেন না। তবে বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হলে একেবারই যে কোনো সভায় যেতেন না, তা নয়। স্বরচিত কবিতা পাঠের সভা থেকে বিশেষ অনুরোধ এলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন না। আর রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কীয় কোনো সভায় একান্ত বাধ্য হয়ে যোগদান করতে হলে, হয় তিনি লিখিত রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ পড়তেন,[২] নয়ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতেন।

স্বরচিতই হোক বা রবীন্দ্রনাথের কবিতাই হোক, তিনি কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন অতি চমৎকার। তাঁর উচ্চারণ ভঙ্গি ছিল যেমন নিখুঁত ও স্পষ্ট, তাঁর গলার স্বরও ছিল তেমনি ভারী ও মিষ্ট। আর তিনি নিজে পণ্ডিত ও কবি মানুষ ছিলেন বলে কবিতা পাঠে বা আবৃত্তিতে ছন্দ বা বিরামের তারতম্য, ভাবাবেগের প্রয়োগ, স্বরের উত্থান-পতন অর্থাৎ স্বর কখন উচ্চগ্রামে উঠবে, কখন মধ্যগ্রামে থাকবে, আর কখন বা নিম্নগ্রামে নামবে— এ সবই তিনি ভালভাবে জানতেন। তাই তাঁর কবিতা আবৃত্তি একটা শুনবার মতো জিনিস ছিল।

তাঁর স্বরচিত কবিতা পাঠের এবং রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তির দুটি ঘটনা এখানে বলছি—

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ও ২৯শে জানুয়ারি কলকাতায় সিনেট হলে এক কবি সম্মেলন হয়েছিল। এর প্রথম দিনে স্বরচিত কবিতা পাঠের জন্য আমন্ত্রিত হয়ে জীবনানন্দ সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি মনস্থ করেছিলেন— তাঁর *বনলতা সেন* কবিতার বই থেকে 'বনলতা সেন' ও অন্য আর একটি কবিতা পাঠ করবেন। তাই তিনি ঐ বইটি হাতে করেই সভায় গিয়েছিলেন।

সভায় যথা সময়ে তিনি তাঁর কবিতা আবৃত্তি শুরু করলেন। তাঁর কবিতা আবৃত্তি

শুনে শ্রোতারা সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। তিনি তাঁর স্থির করা কবিতা দুটি আবৃত্তি করে থামলে, শ্রোতাদের মধ্যে থেকে প্রচুর হাততালি এবং সমস্বরে তাঁদের মুহুর্মুহু 'আর একটা কবিতা পড়ুন' ধ্বনি উত্থিত হ'ল।

'বনলতা সেন' হাতে দণ্ডায়মান জীবনানন্দ শ্রোতাদের অনুরোধে আবার একটা কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন।

শেষ হ'লে আবার সেই হাততালি ও সেই অনুরোধ।

জীবনানন্দকে সেদিন শ্রোতাদের এইরূপ বার বার অনুরোধে অন্তত ৫/৬টি কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতে হয়েছিল।

আর একটা ঘটনা— জীবনানন্দ তখন হাওড়া গার্লস কলেজে অধ্যাপনা করছেন। সেই সময় কলেজের ছাত্রীরা একবার কলেজে ২২শে শ্রাবণ তারিখে রবীন্দ্রনাথের তিরোভাব দিবসের সভায় জীবনানন্দকে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করে। তিনি কিন্তু ছাত্রীদের এ অনুরোধ কোনো রকমে এড়িয়ে যান। শেষে স্বয়ং অধ্যক্ষ অনুরোধ করলে বাধ্য হয়েই তিনি সভায় যান। গিয়ে মুখে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে কিছু না বলে সকলের অনুমতি নিয়ে 'সঞ্চয়িতা' থেকে রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনান। তাঁর সেদিনকার ঐ আবৃত্তি সম্বন্ধে ঐ কলেজের তখনকার চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর এক ছাত্রী প্রীতি চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন :

> তিনি রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' ও 'তপোভঙ্গ' এই দুটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন। কি অনির্বচনীয় সে আবৃত্তি, হৃদয়ের সমস্ত মাধুর্য ঢেলে তিনি দিলেন আবৃত্তির মাঝে। ...মরমী কবি ছাড়া আর কেউ পারবে না এমন করে সুধা ছানিয়া নিতে আর সেই সুধা দিতে।

জীবনানন্দ রেডিওতে বহুবার স্বরচিত কবিতা পাঠ করেছেন। তাঁর সে কবিতা-পাঠ শুনেও সকলেই মুগ্ধ হয়েছেন।

জীবনানন্দ নিজে খুব ভাল আবৃত্তি করতেন ব'লে কেউ, বিশেষ করে মেয়েদের কেউ তাঁর কাছে আবৃত্তি শিখতে চাইলে, তাতে তিনি খুবই সংকোচ বোধ করতেন। সেরূপ একটা কাহিনী এখানে বলছি।

হাওড়া গার্লস কলেজে জীবনানন্দের সহকর্মী অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ গ্রন্থকারকে এই কাহিনীটি বলেছিলেন :

> একদিন অবসর সময়ে প্রফেসার্স রুমে জীবনানন্দবাবু ও আমি পাশাপাশি বসে আছি। এমন সময় দেখি— কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর জন কয়েক ছাত্রী ঘরে ঢুকে জীবনানন্দবাবুর কাছে এসে দাঁড়াল। তাদের মধ্যে একজন জীবনানন্দবাবুকে বললে— স্যার, বনলতা সেন কবিতাটি একবার আবৃত্তি করে আমাকে দেখিয়ে দেবেন, কেমন করে আবৃত্তি করব?

দেখলাম, হঠাৎ একটি ছাত্রীর মুখে এই ধরনের কথা শুনে জীবনানন্দবাবু একটু বিস্মিত হয়ে গেলেন। তারপর ছাত্রীটিকে কিছু না বলে সসংকোচে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমি জীবনানন্দবাবুকে বললাম— আবৃত্তি করে দেখিয়ে দিন না!

তিনি বললেন— আপনি বলেন কি! অধ্যাপক, অধ্যাপিকারা কি ভাবলেন? তাছাড়া বাইরেও ছাত্রীরা কেউ শুনে ফেললে কি ভাববে?

— কি আর ভাববে! কবি অনুরোধে পড়ে নিজের কবিতা আবৃত্তি করে দেখাচ্ছেন; এতে কার কি ভাববার আছে!

— না, তা কখনও হতে পারে না, অসম্ভব।

— তবে এক কাজ করুন, কলেজের গেটের ধারে সেই ফাঁকা ঘরটায় ওদের নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে আবৃত্তি করে ওদের শিখিয়ে দিয়ে আসুন।

আমার এই কথায় এবং ছাত্রীদেরও অনুরোধে জীবনানন্দবাবু শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে রাজি হলেন। তখন তিনি সসংকোচেই ছাত্রীদের নিয়ে সেই ঘরটায় গেলেন।

খানিক পরে ফিরে এসে বললেন— কবিতা না হয় কিছু লিখতেই পারি, তাই বলে আবার আবৃত্তি করে দেখানো, এই সব কি পোষায় মশায়। যাক, কোনো রকমে দেখিয়ে দিয়ে এসেছি। এখন বাঁচলাম।

ভ্রমণ

ছেলেবেলা থেকেই জীবনানন্দের পায়ে হেঁটে বেড়ানোর যে একটা প্রবল ঝোঁক ছিল, তা আগেই বলেছি। আর এই বেড়ানো শুধু যে বাইরেই তা নয়, বাড়ির ভিতরেও যদি বেড়ানোর সুযোগ থাকতো, তাহলে সেখানেও তিনি একটা সময় অন্তত প্রতিদিন নিয়মিত হেঁটে বেড়াতেন। তাই বরিশালে তাঁদের বাড়ির সবুজ প্রাঙ্গণে বিকালের বেড়ানো সম্বন্ধে বি. এম. কলেজের অধ্যাপক হেরম্ব চক্রবর্তী লিখছেন :

> 'সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভেরাণ্ডাঘেরা দূর্বাদলশ্যাম প্রাঙ্গণে আনতদৃষ্টিতে দ্রুত পরিক্রমা ছিল তাঁর নিত্যকর্ম।'

জীবনানন্দ কলকাতায় থাকার সময় নিয়মিত বিকালে লেকে বেড়াতে যেতেন। তিনি মাঝে মাঝে নানা উপলক্ষ্যে কলকাতার বাইরেও বেড়াতে যেতেন। একটা ঘটনা বলছি :

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারি থেকে ২৪শে জানুয়ারি পর্যন্ত এই ক'দিন নদীয়া জেলায় নব নির্মিত কল্যাণী শহরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ৫৯ তম অধিবেশন হয়। এই উপলক্ষে সেখানে সর্বোদয় ও শিল্প প্রদর্শনীর এক বিরাট ব্যবস্থা হয়েছিল।

এই সময় জীবনানন্দ একদিন হাওড়া গার্লস কলেজে তাঁর সহকর্মী ও কলকাতার প্রতিবেশী অধ্যাপক অতিজকুমার ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে কল্যাণীতে প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলেন।

অজিতবাবু বলেন :

> কল্যাণীতে গিয়ে প্রদর্শনী মণ্ডপে ঢুকে জীবনানন্দবাবু অত্যন্ত আগ্রহ ও কৌতূহল সহকাবে ঘুবে একটা একটা কবে সব দেখতে লাগলেন। আমিও তাঁব সঙ্গে সঙ্গে ঘুবে দেখতে লাগলাম।

জীবনানন্দের নিজের কর্মক্ষেত্র বরাবর একরূপ বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু তাঁর ছোট ভাই অশোকানন্দকে কার্য উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন স্থানে বদলি হয়ে বেড়াতে হয়েছে। অশোকানন্দবাবু যখন যেখানে বদলি হয়ে যেতেন, জীবনানন্দ তখনই ভাইয়ের সেখানে বেড়াতে যেতেন। সেখানে গিয়ে তিনি অশোকানন্দকে সঙ্গে নিয়ে চারিদিকে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন। এইভাবে তিনি পায়ে হেঁটে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছেন।

জীবনানন্দের এই ভ্রমণের সম্বন্ধে অশোকানন্দবাবু লিখেছেন :

> ছোটবেলা থেকেই আমাদের রক্তে বিশেষ কবে দাদার— হাঁটাব নেশা ছিল। গিরিডিতে উশ্রী নদী পাব হযে বালুব তটে, আমলকী বনে বহুদিন হেঁটেছি। কখনও হেঁটেছি এপারে ক্রিশ্চান হিলেব দিকে। .পুনা শহবে হেঁটে গেছি পার্বতী মন্দিরের চূড়ায়, যারবেদায পর্ণকুটীবের পাশ দিযে মুলা-মুথা নদীর সঙ্গমে, মালাবার হিলে, ওয়ার্লির সমুদ্র পাশে, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে বান্দায়, বান্দা থেকে সাণ্টাক্রুজে, সাণ্টাক্রুজ থেকে জুহুর সমুদ্রতটে হেঁটেছি। দিল্লীর সড়কে সড়কে...। জীবনানন্দ শেষ ঘুমের আগে পর্যন্ত বোজই হেঁটেছেন এক নেশায় আক্রান্ত হয়ে, কোনও সাথীর সঙ্গে অথবা সাথীহীন হয়েও।

জীবনানন্দের এই হাঁটার অভ্যাস ছিল বলেই তিনি তাঁর বহু কবিতায় হাঁটার কথা বলেছেন। এমন কি 'পথ হাঁটা' নামে (*বনলতা সেন* গ্রন্থে) কবিতাও লিখেছেন।

স্বাদেশিকতা

জীবনানন্দ তাঁর 'রামদাস' কবিতায় লিখেছেন :

যুগসন্ধিতে ভারত যখন সহসা তিমিরময়

...

মাতিয়া উঠিলে দশের লাগিয়া, দেশ দেবতার লাগি।

এখানে দেখা যাচ্ছে, জীবনানন্দ দেশকে দেবতা বলেছেন। আর দেশ বলতে আমাদের এই ভারতবর্ষই।

রামদাস ছিলেন, মারাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজীর গুরু। জীবনানন্দ এই দেশসেবক রামদাস সম্বন্ধে যেমন কবিতা লিখেছেন, তেমনি তাঁর সমসাময়িক কালের দেশনেতা মহাত্মা গান্ধী এবং দেশবন্ধুর সম্বন্ধেও কবিতা লিখেছেন।

জীবনানন্দ নিজে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে বা দেশের মুক্তি আন্দোলনে যোগদান না করলেও, মহাত্মা গান্ধীর উপর তাঁর একাধিক কবিতা এবং 'দেশবন্ধু' কবিতা থেকে বোঝা যায়, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁর কিরূপ আগ্রহ ও সমর্থন ছিল।

সকল দেশ-প্রেমিকের মতোই নিজের দেশ বা ভারতের জন্য জীবনানন্দেরও একটা গর্ব ছিল। তাই তিনি তাঁর *ভারতবর্ষ* কবিতায় লিখেছিলেন :

অর্পিয়াছে শান্তি স্বস্তি নিখিলের মনে
আমাদের কাব্য কলা— মোদের ভারতী।

প্রাচীন ভারতের জ্ঞান গরিমার জন্য জীবনানন্দ এই যেমন গর্ববোধ করতেন, তেমনি তাঁর আমলের ভারতে ইংরাজের শাসন ও শোষণের জন্যও ব্যথা বোধ করতেন। তিনি লিখেছেন :

মাঠের ফসলগুলো বার-বার ঘরে
তোলা হতে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে
পরিচ্ছন্নভাবে চলে গেছে।

— *নাবিকী*

ভারতে ইংরাজের এই শোষণ ও অত্যাচারের এবং সরকার সৃষ্ট বাঙ্গলায় ১৩৫০-এর মন্বন্তরের অনেক চিত্র পাই আমরা তাঁর *সাতটি তারার তিমির* কাব্য-গ্রন্থে। শাসক ইংরাজের কথা বাদেও ভারতের দুই প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান— এঁরা যখনই নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মত্ত হতেন, তখনই তিনি এতে ব্যথিত হতেন। তাই ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় যেমন তাঁকে ব্যথিত হয়ে কবিতা লিখতে দেখি, তেমনি ১৯৪৬-এও ভারতব্যাপী হিন্দু-মুসলমানের গৃহবিবাদে তাঁকে এ নিয়ে কবিতা লিখতে দেখি।

জীবনানন্দ দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় বা দুর্ভিক্ষে যেমন ব্যথিত হতেন, তেমনি দেশে বন্যা প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও দুর্গতদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হতেন। এ সম্বন্ধে একটা ছোট্ট ঘটনা, হাওড়া গার্লস কলেজে তাঁর এক ছাত্রী সবিতা পালের লেখা থেকে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। সবিতা দেবী লিখেছেন :

একদিন বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য পিপল্‌স রিলিফ কমিটির পক্ষ থেকে কুপন সেল করছিলাম। ওঁর কাছে যখন গেলাম, অন্যমনস্কভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, থিয়েটার হবে নাকি? কোথায়? কত দাম টিকিটের ইত্যাদি।

সমস্ত যখন শুনলেন, নিজের ভুলের জন্য হেসে উঠলেন, আর বললেন :

কুপনেব দাম মাত্র দু-আনা! তবে গোটা চাবেক দাও আমায়, বুঝলাম উনি দেশেব লোকেব প্রতি কম দবদী নন।' (হাওড়া গার্লস কলেজ পত্রিকা, জীবনানন্দ সংখ্যা)।

সমগ্রভাবে ভাবতবর্ষের প্রতি যেমন, তেমনি শুধু বাঙ্গলা দেশের প্রতিও জীবনানন্দের একটা গভীব ভালবাসা ছিল। তিনি প্রথম যৌবনে একবার কয়েক মাসের জন্য বাঙ্গলার বাইরে দিল্লীতে কাজ করলেও পরে আর কোনো দিনই কাজ নিয়ে বাঙ্গলার বাইরে যেতে চাননি, এমন কি অভাব সত্ত্বেও। কেন না আমরা জানি, ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বরিশাল থেকে কলকাতায় চলে এসে যখন দীর্ঘদিন ধরে কোনও স্থায়ী কাজকর্ম পাচ্ছিলেন না, তখন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজির প্রধান অধ্যাপক জীবনানন্দের পরিচিত বন্ধু অমলেন্দু বসু উত্তর প্রদেশের কোনো এক কলেজে জীবনানন্দের জন্য একটা চাকরি ঠিক করে দিয়েছিলেন। কিন্তু জীবনানন্দ বাঙ্গলা ছেড়ে কোথাও যেতে চাইলেন না।

জীবনানন্দ এই সময় জন্মভূমি বাঙ্গলার প্রতি একান্ত ভালবাসাবশত বাঙ্গলা ছেড়ে যে অন্য কোথাও যেতে চাইতেন না, তার পরিচয় পাই আমরা তাঁর ছোটবোন সুচরিতা দাশের লেখায়ও। সুচরিতা লিখেছেন :

ল্যান্সডাউনের বাড়ির বাবান্দায় ইজি চেয়ার নিয়ে বসতেন লিখতে। সামনেই ছিল একটা পত্রবহুল নিম গাছ। তার পাতার ঝালবের ফাঁক দিয়ে আলোর জলে মুছে নেওয়া ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন নীল আকাশ চোখে পড়ত। মুগ্ধ বিস্ময়ে কিছু না লিখে চুপচাপ বসে থেকে, হয়ত মনে মনে অনেক চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে থাকতে দেখেছি তাঁকে। যে কথাটা মোটেই বলাব মতো কিছু নয়, সে কথাটাই যে কতবার কত নতুন পরিবেশে তিনি বলেছেন আমাকে। ...বলতেন— কি সুন্দর এই গাছ আর আকাশ। জানিস্, এই বাঙ্গলা ছেড়ে কোথাও যাব না, কোথাও যেতে পারব না। এমন আকাশ আর গাছপালা আর কোথায় আছে বল্।

জীবনানন্দ বাঙ্গলা দেশকে যে কিরূপ ভালবাসতেন তার প্রচুর নিদর্শন পাই, তাঁর 'রূপসী বাংলা' গ্রন্থের কবিতাগুলিতে। তিনি একটি কবিতায় এমনও বলেছেন :

বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ;

শুধু এই নয়, তিনি একটি কবিতায় লিখেছেন, মৃত্যুর পরে পরজন্মে বাঙ্গলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালবেসে আবার এই বাঙ্গলাতেই ফিরে আসবেন। *রূপসী বাংলা* গ্রন্থের সেই কবিতাটি এই :

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে— এই বাংলায়

হয়তো মানুষ নয়— হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হ'ব— কিশোরীর ঘুঙুর রহিবে লাল পায়,
সারাদিন কেটে যাবে কলমীর গন্ধভরা জলে ভেসে ভেসে ;
আবার আসিব আমি বাংলার নদী মাঠ ক্ষেত ভালবেসে
জলাঙ্গীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলার এ সবুজ করুণ ডাঙায় ;
হয়তো দেখিবে চেয়ে সুদর্শন উড়িতেছে সন্ধ্যার বাতাসে ;
হয়তো শুনিবে এক লক্ষ্মীপেঁচা ডাকিতেছে শিমুলের ডালে,
হয়তো খইয়ের ধান ছড়াতেছে শিশু এক উঠানের ঘাসে ;
রূপ্‌সার ঘোলা জলে হয়তো কিশোর এক শাদা ছেঁড়া পালে
ডিঙা বায় ;— রাঙা মেঘ সাঁতরায়ে অন্ধকারে আসিতেছে নীড়ে
দেখিবে ধবল বক ; আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে।

জীবনানন্দের স্বাদেশিকতার আর একটা পরিচয় পাই, তাঁর ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ থেকেও। তিনি ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপক হয়েও সাহেবী পোশাক অর্থাৎ কোট, প্যাণ্ট ও নেকটাই কখনও পারেননি। তিনি বরাবরই আমাদের জাতীয় পোশাক, ধুতি-পাঞ্জাবী ও চাদরই ব্যবহার করতেন।

জীবনানন্দ একবার একটা অধ্যাপনার চাকরিতে সাহেবী পোশাক পরতে হবে বলেই শুধু সে চাকরিটা নিলেন না। অথচ তখন তাঁর যে কোনো একটা চাকরির খুব প্রয়োজন ছিল। জীবনানন্দের এই চাকরি না নেওয়ার কাহিনীটা আমি অশোকানন্দ দাশের কাছে শুনেছি। তিনি বলেছিলেন :

১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে আমার চাকরির সূত্রে আমি কলকাতা থেকে দিল্লীতে বদলি হয়ে যাই। দিল্লী যাওয়ার আগে দাদা ও আমি একত্রেই ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে ছিলাম। আমি দিল্লী গিয়ে দাদার তখন কোনো চাকরি ছিল না বলে, সেখানে একটা মিলিটারি ট্রেনিং কলেজে দাদার জন্যে একটা কাজ ঠিক করেছিলাম। কাজটা ছিল মিলিটারি ট্রেনিং শিক্ষানবীশদের ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া। কিন্তু দাদা তখন অভাব সত্ত্বেও সে কাজটা কিছুতেই নিলেন না। তার কারণ, সেই কলেজের শিক্ষকদের কোট, প্যাণ্ট, নেকটাই পরতে হয় শুনেই বললেন— ও সাহেবী পোশাক পরা আমার দ্বারা হবে না।
আমি বলেছিলাম— দিন কতক পরলেই অভ্যাস হয়ে যাবে।
তবুও দাদা বলেছিলেন— আমি কিছুতেই ও পোশাক পরব না। আমার চাকরির দরকার থাকলেও নেব না।
এছাড়া দাদার ঐ চাকরি না নেওয়ার আরও হয়ত একটা কারণ ছিল, তিনি ঐ সময় বাঙ্গলা দেশ ছেড়ে আর কোথাও কাজ নিয়ে যেতে চাইতেন না।

ঈশ্বরের অস্তিত্বে সংশয় (?)

অচিন্ত্যকুমাব সেনগুপ্ত তাঁর 'অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ' নামক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'জিগ্গেস কবেছিলাম কি মানো? ভেবেছিলাম, হয়ত বলবে, ঈশ্বর মানি। মৃদু হেসে বললে— মানুষের নীতিবোধ মানি।'

বাণী রায় তাঁর 'নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেছেন :

> একদিন ঈশ্ববেব অস্তিত্ব নিযে আলোচনা হ'ল এবং অবশেষে বেলা দুটো বেজে গেলে অগত্যা সভা ভঙ্গ কবতে আমবা বাধ্য হলাম। সেই 'মাইটি অ্যাটম' আমাদেব মানবিক যুক্তিতর্ক জালে ধবা দিলেন না।

এঁদের এই সব লেখা পড়ে মনে হয় জীবনানন্দ একেবাবেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু অশোকানন্দ দাশের লেখায় দেখছি, তিনি বলেছেন :

> দাদা ধর্মেব অনুষ্ঠান পববর্তী জীবনে পছন্দ কবতেন না, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মেব সাববস্তুতে বিশ্বাসবান ছিলেন।
>
> 'ভূমিকা', *জীবনস্মৃতি*

অশোকানন্দবাবুর এই কথা থেকে বলা যেতে পাবে, জীবনানন্দ পরবর্তী জীবনে পছন্দ না করলেও আগে ধর্মের অনুষ্ঠান পছন্দ করতেন। আর অশোকানন্দবাবু যে বলেছেন, ব্রাহ্মধর্মের সারবস্তুতে বিশ্বাসবান ছিলেন— ব্রাহ্মধর্মের সেই সারবস্তুও কি ঈশ্বরকে একেবারে বাদ দিয়ে হতে পারে?

যাই হোক, জীবনানন্দ পরবর্তী জীবনে ঈশ্বরে বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, আমরা কিন্তু তাঁর এই পরবর্তী কালেরই অসংখ্য কবিতায় ঈশ্বর, নানা দেব-দেবী, স্বর্গ, নরক প্রভৃতির যথেষ্ট উল্লেখ পাই। এবং ঈশ্বর নেই একথা তিনি কোথাও স্পষ্ট করে বলেননি। বরং তিনি যখন বলছেন :

> *..হৃদয়বিহীন ভাবে আজ*
> *মৈত্রেযী ভূমার চেযে অন্নলোভাতুর।*
>
> 'দীপ্তি', *সাতটি তাবাব তিমিব*

তখন বলতে হয়, তিনি 'ভূমার' অস্তিত্বেও বিশ্বাসবান।

জীবনানন্দের নিজের ধর্মবিশ্বাসের কথা ছেড়ে দিলেও, যেহেতু তিনি আজন্ম ব্রাহ্ম পরিবারে মানুষ, তাই উপনিষদের শিক্ষা এবং উপনিষদের কথা ও কাহিনী তাঁর মনের মধ্যে গাঁথা ছিল। তাই আমরা যম, নচিকেতা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির কথা তাঁর কবিতায় বারে বারে পাই। 'আগুন, বাতাস, জল— আদিম দেবতা'দের কথাও দেখি।

মুখে কারও কারও কাছে ঈশ্বরে অবিশ্বাসের কথা, অথচ লেখায় ঈশ্বর ও দেব-দেবীর কথা— এ থেকে মনে হয়, তিনি এ বিষয়ে কোনো একটা স্থির সিদ্ধান্তে না পৌঁছে, এ ব্যাপারে সংশয়বাদীই ছিলেন।

হাওড়া গার্লস কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক অজিতকুমার ঘোষ লিখেছেন :

> জীবনানন্দ কতদিন বলেছেন, বলতে পারেন, মৃত্যুর পর কি আছে? কি বলে আপনাদের দার্শনিকের দল?
>
> কখনও জিজ্ঞাসা করেছেন— মৃত্যুর আগে জন ষ্টুয়ার্ট মিলের উক্তিটি কেমন? তুমি যদি থাকো, তাহলে হে ভগবান, আমার আত্মার মঙ্গল কোরো। যদি অবশ্য আত্মা থাকে।

মিলের কথা উদ্ধৃত করে তিনি যখন বলতেন— তুমি যদি থাকো হে ভগবান— তখন তো তিনি ঈশ্বরে একেবারে অবিশ্বাসী ছিলেনই না, ছিলেন— সংশয়বাদী।

যেমন ঈশ্বর সম্বন্ধে তেমনি মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব সম্বন্ধেও বলা যেতে পারে, তিনি সংশয়বাদীই ছিলেন। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আত্মাও শেষ হয়ে যায়, একথা যদি তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, তাহলে তিনি কখনই অজিতবাবুকে প্রশ্ন করতেন না— কি বলে আপনাদের দার্শনিকের দল?

জীবনানন্দের মুখের কথার এই প্রশ্ন ছাড়াও আমরা কিন্তু বহু কবিতায় মৃত্যুর পরেও আত্মার অস্তিত্বে অর্থাৎ জন্মান্তরবাদে তাঁর বিশ্বাসের কথাই দেখতে পাই। এ সম্বন্ধে তাঁর *রূপসী বাংলা*-র 'আবার আসিব ফিরে...' কবিতাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বুদ্ধদেবের পূর্ব জন্মের কাহিনীতে যেমন আমরা পড়ি, তিনি মানুষ ছাড়া অন্য অন্য প্রাণী হিসাবেও জন্মেছিলেন, জীবনানন্দের এই কবিতাটিতে তেমনি দেখি, তিনি জন্মান্তরে বিশ্বাস তো করেছেনই, এমন কি পরজন্মে শঙ্খচিল, শালিক প্রভৃতিও হয়ে যে আসতে পারেন, তাও বলেছেন।

সব শেষে বলি, জীবনানন্দ কিন্তু তাঁর *ঝরা পালক* গ্রন্থের 'জীবন মরণ দুয়ারে আমার' কবিতায় এক জায়গায় প্রসঙ্গত পর পর দুবার বলেছেন, 'ভগবান, ভগবান'।

কয়েকটি কবিতা

এই অধ্যাযেব সব ক'টি কবিতাই আগে বিভিন্ন প্রসঙ্গে বইযে উল্লেখ কবা হযেছে।

ক্যাম্পে

এখানে বনেব কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিযাছি।
সাবাবাত দখিনা বাতাসে
আকাশেব চাঁদেব আলোয
এক ঘাইহবিণীব ডাক শুনি,—
কাহাবে সে ডাকে।

কোথাও হবিণ আজ হতেছে শিকাব ,
বনেব ভিতবে আজ শিকাবীবা আসিযাছে,
আমিও তাদেব ঘ্রাণ পাই যেন,
এইখানে বিছানায শুযে-শুযে
ঘুম আব আসে নাকো
বসন্তেব বাতে।

চাবিপাশে বনেব বিস্ময,
চৈত্রেব বাতাস,
জ্যোৎস্নাব শবীবেব স্বাদ যেন।
ঘাইমৃগী সাবাবাত ডাকে ,
কোথাও অনেক বনে— যেইখানে জ্যোৎস্না আব নাই
পুরুষ-হবিণ সব শুনিতেছে শব্দ তাব ,
তাহাবা পেতেছে টেব,
আসিতেছে তাব দিকে।
আজ এই বিস্ময়েব বাতে
তাহাদেব প্রেমেব সময় আসিযাছে,

তাহাদের হৃদয়ের বোন
বনের আড়াল থেকে তাহাদেব ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়,—
পিপাসার সান্ত্বনায়— আঘ্রাণে— আস্বাদে!
কোথাও বাঘের পাড়া বনে আজ নাই আর যেন!
মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট ভয় নাই,
সন্দেহের আবছায়া নাই কিছু;
কেবল পিপাসা আছে,
রোমহর্ষ আছে।
মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়!
লালসা-আকাঙ্ক্ষা-সাধ-প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হয়ে উঠিতেছে সব দিকে
আজ এই বসন্তের রাতে;
এইখানে আমার নক্‌টার্ন— ।

একে-একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে,
সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে
দাঁতের-নখের কথা ভুলে গিয়ে তাদের বোনের কাছে অই
সুন্দরী গাছের নিচে— জ্যোৎস্নায়।—
মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে
হরিণেরা আসিতেছে।

— তাদের পেতেছি আমি টের
অনেক পায়ের শব্দ শোনা যায়,
ঘাইমৃগী ডাকিতেছে জ্যোৎস্নায়।
ঘুমাতে পারি না আর;
শুয়ে-শুয়ে থেকে
বন্দুকের শব্দ শুনি;
তারপর বন্দুকের শব্দ শুনি।
চাঁদের আলোয় ঘাইহরিণী আবার ডাকে;
এইখানে প'ড়ে থেকে একা-একা
আমার হৃদয়ে এক অবসাদ জমে ওঠে
বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে
হরিণীর ডাক শুনে শুনে।

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া;
সকালে— আলোয় তারে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা প'ড়ে আছে।

মানুষেবা শিখাযে দিযেছে তাবে এই সব।
আমাব খাবাব ডিশে হবিণেব মাংসেব ঘ্রাণ আমি পাব,
মাংস-খাওযা হল তবু শেষ?
কেন শেষ হবে?
কেন এই মৃগদেব কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদেব মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তেব বাতে
জীবনেব কোনো এক বিস্মযেব বাতে
আমাবেও ডাকেনি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায— দখিনা বাতাসে
অই ঘাইহবিণীব মত?

আমাব হৃদয— এক পুরুষহবিণ—
পৃথিবীব সব হিংসা ভুলে গিযে
চিতাব চোখেব ভয— চমকেব কথা সব পিছে ফেলে বেখে
তোমাবে কি চায নাই ধবা দিতে?
আমাব বুকেব প্রেম ঐ মৃত মৃগদেব মত
যখন ধুলায বক্তে মিশে গেছে
এই হবিণীব মত তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনেব বিস্মযেব বাতে
কোনো এক বসন্তেব বাতে?

তুমিও কাহাব কাছে শিখেছিলে!
মৃত পশুদেব মত আমাদেব মাংস লযে আমবাও প'ড়ে থাকি,
বিযোগেব— বিযোগেব— মবণেব মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদেব মত— ।
প্রেমেব সাহস-সাধ-স্বপ্ন লযে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই,
পাই না কি?

দোনলাব শব্দ শুনি।
ঘাইমৃগী ডেকে যায।
আমাব হৃদযে ঘুম আসে নাকো
একা-একা শুযে থেকে,
বন্দুকেব শব্দ তবু চুপে-চুপে ভুলে যেতে হয।
ক্যাম্পেব বিছানায বাত তাব অন্য এক কথা বলে
যাহাদেব দোনলাব মুখে আজ হবিণেবা মবে যায

হরিণের মাংস হাড় স্বাদ তৃপ্তি নিয়ে এল যাহাদের ডিশে
তাহারাও তোমার মতন :—
ক্যাম্পের বিছানায় শুয়ে থেকে শুকাতেছে তাদেরো হৃদয়
কথা ভেবে— কথা ভেবে— ভেবে।
এই ব্যথা,— এই প্রেম সব দিকে রয়ে গেছে,— ।
কোথাও ফড়িঙে-কীটে,— মানুষের বুকের ভিতরে,
আমাদের সবের জীবনে।
বসন্তের জ্যোৎস্নায় অই মৃত মৃগদেব মত
আমরা সবাই।

আকাশলীনা

সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়ো নাকো তুমি,
বোলো নাকো কথা অই যুবকের সাথে ;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে ;

ফিরো এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে ;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার ;
দূর থেকে দূরে— আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়ো নাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে!
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ :
তার প্রেম ঘাস হ'য়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

ফিরে এসো

ফিরে এসো সমুদ্রের ধারে,
ফিরে এসো প্রান্তরের পথে ;
যেইখানে ট্রেন এসে থামে
আম নিম ঝাউয়ের জগতে
ফিরে এসো ; একদিন নীল ডিম করেছো বুনন ;
আজো তারা শিশিরে নীরব ;
পাখির ঝরনা হ'য়ে কবে
আমারে করিবে অনুভব !

ফুটপাথে

অনেক রাত হয়েছে— অনেক গভীর রাত হয়েছে ;
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে— ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো
এই-যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের বিষাক্ত বিস্বাদ স্পর্শ
অনুভব ক'রে হাঁটছি আমি।
গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে— কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;
কোন্ দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকির কথা মনে পড়ে আমার,—
তারা কোথায় ?
তারা কি হারিয়ে গেছে ?
পায়ের তলে লিকলিকে ট্রামের লাইন,— মাথার ওপরে
অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।
গুঁড়ি-গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে, কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস ;
এই ঠাণ্ডা বাতাসের মুখে এই কলকাতার শহরে এই গভীর রাতে
কোনো নীল শিরার বাসাকে কাঁপতে দেখবে না তুমি ;
জলপাইয়ের পল্লবে ঘুম ভেঙে গেল ব'লে কোনো ঘুঘু তার
কোমল নীলাভ ভাঙা ঘুমের আস্বাদ তোমাকে জানাতে আসবে না।
হলুদ পেঁপের পাতাকে একটা আচমকা পাখি ব'লে ভুল হবে না তোমার,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ নিবিড় হ'য়ে
উঠবে না তোমার !

প্যাঁচা তার ধূসর পাখা আমলকীর ডালে ঘষবে না এখানে,
আমলকীর শাখা থেকে নীল শিশির ঝ'রে পড়বে না,
তার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না এখানে,
রাত্রিকে নীলাভতম ক'রে তুলবে না !
সবুজ ঘাসের ভিতর অসংখ্য দেয়ালি পোকা ম'রে রয়েছে
দেখতে পাবে না তুমি এখানে,
পৃথিবীকে মৃত সবুজ সুন্দর কোমল একটি দেয়ালি পোকার মতো
মনে হবে না তোমার,
জীবনকে মৃত সবুজ সুন্দব শীতল একটি দেয়ালি পোকার মতো
মনে হবে না ;
প্যাঁচার সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না এখানে
শিশিরের সুর নক্ষত্রকে লঘু জোনাকির মতো খসিয়ে আনবে না,
সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে চোখ
নিবিড় হ'য়ে উঠবে না তোমার।

তার স্থির প্রেমিকের নিকট

বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই,— আমি বলি না তা।
কারো লাভ আছে ;— সকলেরই ;— হয়তো বা ঢের।
ভাদ্রের জ্বলন্ত রৌদ্রে তবু আমি দূরতর সমুদ্রের জলে
পেয়েছি ধবল শব্দ— বাতাসতাড়িত পাখিদের।
মোমের প্রদীপ বড় ধীরে জ্বলে— ধীলে জ্বলে আমার টেবিলে ;

মনীষার বইগুলো আরো স্থির,— শান্ত,— আরাধনাশীল ;
তবু তুমি রাস্তায় বার হলে,— ঘরেরও কিনারে ব'সে
টের পাবে না কি
দিকে দিকে নাচিতেছে কী ভীষণ উন্মত্ত সলিল।
তারি পাশে তোমারো রুধির কোনো বই— কোনো
প্রদীপের মতো আর নয়,
হয়তো শঙ্খের মতো সমুদ্রের পিতা হয়ে সৈকতের 'পরে
সেও সুর আপনার প্রতিভায়— নিসর্গের মতো ;
রূঢ়— প্রিয়— প্রিয়তম চেতনার মতো তারপরে।
তাই আমি ভীষণ ভিড়ের ক্ষোভে বিস্তীর্ণ হাওয়ার স্বাদ পাই ;

না হলে মনের বনে হরিণীকে জড়ায় ময়াল ;
দণ্ডী সত্যাগ্রহে আমি সে-রকম জীবনের করুণ আভাস
অনুভব করি, কোনো গ্লাসিয়ার-হিম স্তব্ধ কর্মোরেণ্ট পাল—
বুঝিবে আমার কথা ; জীবনের বিদ্যুৎ-কম্পাশ অবসানে
তুষার-ধূসর ঘুম খাবে তারা মেরুসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাদনে।

গোধূলি সন্ধির নৃত্য

দরদালানের ভিড়— পৃথিবীর শেষে
যেইখানে প'ড়ে আছে— শব্দহীন— ভাঙা—
সেইখানে উঁচু-উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল— রাঙা—

চুপে-চুপে ডুবে যায়— জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে ব'সে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দ্যাখে ; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রূপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরীতকী শাখাদের নিচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস :
নৃমুণ্ডের আবছায়া— নিস্তব্ধতা—
বাদামী পাতার ঘ্রাণ— মধুকুপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো :
পুরুষ তাদের : কৃতকর্ম নবীন ;
খোঁপার ভিতরে চুলে : নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হুঙকঙের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হ'য়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই ;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী ; দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা

যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই ; এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে বরুণে।

ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরীতকী বনে— জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হ'য়ে গেছে সব ; বিনুনিতে নবকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক— কর্কট— তুলা— মীন।

জীবনানন্দের একটি ইংরাজি প্রবন্ধ

জীবনানন্দের বাংলা উপন্যাস ও গল্প গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর প্রবন্ধ পুস্তক *কবিতার কথাও* প্রকাশিত হয়েছে। এই বইয়ে তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতা নিয়ে তাঁর একটি ছোট আলোচনাও দিয়েছি।

জীবনানন্দ *স্টেট্সম্যান, হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড* প্রভৃতি পত্রিকায় ইংরাজি প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর ইংরাজি প্রবন্ধগুলি বোধ করি আজও সংকলিত হয়নি। তাঁর একটি ইংরাজি প্রবন্ধ এখানে দিলাম :

BENGALI POETRY TODAY

The expression 'Modern Bengali Poetry' may be made to cover a long period. It may be allowed to take in its sweep all the poetry written since World War-I by Tagore and some of his followers and contemporaries. In the present article, however, I have narrowed my scope and used it to include the phase or phases of modern poetry in Bengal, which have, within certain limitations, developed and brought to perfection a variety of notes reasonably claimed to be distinct from Tagore's. That there is no figure, and presumably none likely in the near future to be of Tagore's eminence in our literature, goes without saying. Nevertheless, the most significant Post-Tagoreans—all of them are living, though some have ceased writing lately—have effected in our poetry a healthy change. The need for such a change was felt even when Tagore, more than a decade before his death, was writing with so such zeal.

The contemporaries of Tagore could hardly be included in the reckoning. His disciples, much younger than him, were spoon-fed on Tagore's message and philosophy, though one or two among them—Satyendranath Datta notably—perfected a poetic technique mostly based on early Indian and some foreign models. But the large measure of trivality of the content of his verses made even his technique suspect in the eyes of discerning readers. And we later realized that Datta's form more resonant than subtle, more clever than really critical or important, required far more chastening

before it could become the right medium for deep and suggestive poetry. Associated with these followers of Rabindranath were some other poets who, though mainly nursed on this, that, or the other credo of Tagore and earlier poets, nevertheless commenced evolving on their own individual lines But they did not make much progress and although all of them are living and one of them has not forgotten his vocation of turning out poems on a rather considerable scale even today, they seem to have lost their hold on the more sensible readers of poetry in Bengal Such readers seem to be increasing

It appears that there is in a relative way, such a thing as literature of permanent worth or poetry of enduring value. That value is to be found presumably in the classics of past ages, even of a very recent past. We get it, for instance, quite bountifully in the literature of Tagore. But that is no reason why the age of Tagore should not come to an end at a certain turning of the way where far-reaching social and political changes demand of the age a perspicuous confession of what it believes or not, a new literature, and what is not less important a new attitude to its literature. How far this new outlook in regard to literature—to poetry—on the part of about a whole generation of readers in modern Bengal has been organised and fostered by the impact of the poetry of the new group of more or less gifted poets (whom in this essay I do not name) and how much by the economic, social and political forces of the new age—would undoubtedly be an interesting study. It appears that both forces have been working concurrently so that in Bengal today the age of Tagore in poetry has been replaced by another age, which, unable as yet to take its name from any one poet, remains content bearning the impress of all the significant moderns.

These poets though they share certain common traits the special nature of their space-time has given them, have nevertheless, many important points of divergence. Some of them believe that they are purged of romantic trends and are rational, but instead of writing poetry in which reason and imagination, balanced well, is likely to operate a gentle effective persuasion upon the mind of the reader, these writers in some of their experiments are out to make a poetic success, or so they think, of dialectical materialism. They have, however, in more useful moments given us a string of remarkable social and political satires and other poems of a high order related to contemporary social consciousness.

Political and social awareness, when not made an obsession, has often successfully leavened the lump– especially in some of their love-lyrics—

and in many of the nature touches that very much redeem their poems avowedly concerned with socio political problems It is needless to add that these poets and their initiate readers do not look in poetry for religious satisfaction or mysticism That, I suppose, is due more to the temperament of the poet that to any other equally good reason, unless, of course, we presume that all nature's and man's secrets are known to us and now we can do nothing else than organise properly what we know

True, a man with artistic gifts who has all the same a reasonable and balanced mind starts with an advantage which a predominantly emotional poet or writer lacks. But should a poet's basic need for the fundamentals of science and reason induce him to make his literature for all essential purposes but the hand-made of science, a scientific habit of mind, whatever it may mean, or of a current rational philosophy, say the Marxist one? I find that many of the poems of the writers I have just referred to, instead of attempting to solve the dilemma in the right way seem to remain comfortable in it. The other important poets of modern Bengal are no less agreeable to the claims of reason in the theory and practice of their art than their contemporaries I have just mentioned. They appear to be more sensible in handling a creed however modern and scientific it may happen to be. All that the poet can do is to explore a creed and to be enlightened by it if that is possible, but never to allow it to turn into mere philosophical arguments his poems, which are to satisfy certain well-known demands, which a creed, a scientific creed too, if permitted to usurp, can only injure. This necessary lesson these poets fell in their bones, rating not too highly the diverse creeds and theories which a bewildering age like ours is apt periodically to disseminate.

It is difficult to pick one's way through the welter of economic, industrial, social and other dissertations issuing from the endless dubious clinics our age is cumbered with. A mature artist, however, does not propose to evade the riddles around him. He takes stock of the significant directions and purposes of his age and of their more clear and concrete embodiments in the men of his age. He arrives at his own philosophy and builds his own world, which is never a negation of the actual one, but is the same living world organized more truly and proportionately by the special reading of it by the special poet.

Some of the modern Bengali poets have a proper knowledge of all this and in their verses they have shown us that, though they take odd liberties at times, they are virtually aware of what constitues true poetry and how it is written. Some of them have produced. I believe poetry nearly

great. They are still writing and when the epock of these poets is finished, Bengali literature will have ended, it seems to me, a very unique age of exploration, trial and achievement. The poetic contribution of the age will it is expected be no less great (some hold greater) in its totality than what had been singly done by Tagore for the preceding one.

The Sunday Statesman, November, 6, 1949.

জীবনানন্দের কয়েকটি চিঠি

রবীন্দ্রনাথকে লেখা

কলিকাতা
(১৩৩৭?)

শ্রীচরণেষু,

আপনার স্নেহাশীষ লাভ ক'রে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আজকালকার বাংলাদেশেব নবীন লেখকদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে তাদের মাথার ওপরে স্পষ্ট সূর্যালোকের মতো আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকে তারা পেয়েছে। এত বড় দানের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে হোলে যতখানি গভীর নিষ্ঠার দরকার দেবতা পূজারীকে কখনও তার থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু এ দানকে ধারণ করতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন তার অভাব অনুভব করছি। অক্ষম হোলেও শক্তির পূজা করা এবং শক্তির আশীর্বাদ ভিক্ষা করা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা। আর আমার জীবনের আকিঞ্চন সেই আরাধ্য শক্তি ও সেই কল্যাণময় শক্তির উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ বক্ষা করা। আশা করি এর থেকে আমি বঞ্চিত হব না।

পত্রে আপনি যে কথা উল্লেখ করেছেন, সেই সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন মনে আসছে। অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন— পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা 'সিরিনিটি' জিনিষটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে, সে কাব্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের ডিভাইন কমেডির ভেতর কিম্বা শেলীর ভেতর 'সিরিনিটি' বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে ব'লে মনে হয় না। আমার মনে হয় বিভিন্ন রকমের বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানা সময় নানা রকম 'মুডস্' খেলা করে। সে 'মুড'গুলোর প্রভাবে মানুষ কখনও মৃত্যুকেই বঁধু বলে সম্বোধন করে, অন্ধকারের ভেতরেই মায়ের

চোখের ভালোবাসা খুঁজে পায়, অপচয়ের হতাশার ভেতরেই বীণার তার বাঁধবার ভরসা রাখে। যে জিনিস তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে অপরের চোখে হয়তো তা নিতান্তই নগণ্য। তবু তাতেই তার প্রাণে সুরের আগুন লাগে,— সে আগুন সবখানে ছেয়ে যায়। 'মুড'-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্বলে ওঠে, তাতে 'সিরিনিটি' অনেক সময়েই থাকে না— কিন্তু তাই বলেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছি না।

সকল বৈচিত্র্যের মত সুর-বৈচিত্র্যও আছে সৃষ্টির ভেতর। কোনো একটা বিশেষ ছন্দ বা সুর অন্য সমস্ত সুর বা ছন্দের চেয়ে বেশি করে স্থায়ী স্থান কি করে দাবী করতে পারে? আকাশের নীল রং, পৃথিবীর সবুজ রং, আলোর শ্বেত রং কিম্বা অন্ধকারের কালো রং— সমস্ত রংগুলিই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ আছে। একটিকে অন্যটির চেয়ে বেশি সুন্দর ও সুচির বলা চলে ব'লে মনে হচ্ছে না। এই অন্ধকার, এই আলো, আকাশের নীল, পৃথিবীর শ্যামলিমা— সবই তো সুচির— সুন্দর। সৌন্দর্য ও চিরত্বের বিচার তাই একটু অন্য ধরনের ব'লে মনে হয়। ঘুড়ির কাগজের সবুজ, নীল, শাদা বা কালো রং যখন পৃথিবী, আকাশ, প্রভাত বা রাত্রির বর্ণের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্বের দাবী ক'রে বসে, তখন আর কোনো প্রসঙ্গের প্রয়োজন থাকে না। আমার তাই মনে হয়, রচনার ভেতর যদি সত্যিকার সৃষ্টির মর্যাদা থাকে তা হোলে তার ভেতরকার বিশিষ্ট সুরের প্রশ্নটি হয়তো অবহেলাও করা যেতে পারে। শান্তি বা সিরিনিটির সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলে হয়তো তাও নিষ্ফল হয়ে যায়।

বীঠোফেনের কোনো কোনো সিমফনি বা সোনাটা-র ভেতর অশান্তি রয়েছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে,— কিন্তু আজো তো টিকে আছে— চিরকালই থাকবে টিকে, তাতে সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিল বলে।

আমার যা মনে হয়েছে, তাই আপনাকে জানিয়েছি। আপনার অন্তরলোকের আলোকপাতে আমার ত্রুটি ও অক্ষমতাকে আপনি মার্জিত করে নেবেন আশা করি। আপনার কুশল প্রার্থনীয়। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণতঃ
শ্রীজীবনানন্দ দাশ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তকে লেখা

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠিখানা পেয়ে খুব খুশী হলাম। আষাঢ় এসে ফিরে যাচ্ছে, কিন্তু বর্ষণের কোনো লক্ষণই দেখছিনে। মাঝে মাঝে নিতান্ত 'নীলোৎপল পত্রকান্তিভিঃ

ক্বচিৎ প্রভিন্নাঞ্জনরাশিসন্নিভৈঃ' মেঘমালা দূর দিগন্ত ভরে ফেলে চোখের চাতককে দু দণ্ডের তৃপ্তি দিয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার আকাশের 'সেরুলীন ভেকেন্সি', ডাক-পাখির চীৎকার, গাঙচিল-শালিখের পাখার ঝটপট, মৌমাছির গুঞ্জরণ— উদাস অলস নিরালা দুপুরটাকে আরো নিবিড়ভাবে জমিয়ে তুলছে।

চারিদিকে সবুজ বনশ্রী, মাথার উপর সফেদা মেঘের সারি, বাজপাখির চক্কর আর কান্না। মনে হচ্ছে যেন মরুভূমির সব্‌জিবাগের ভেতর বসে আছি, দূরে দূরে তাতার দস্যুর হুল্লোড়। আমার তুরাণী প্রিয়াকে কখন যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি! ...হঠাৎ কোত্থেকে কত কি তাগিদ এসে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় একেবারে বেসামাল বিশমাল্লার ভিড়ে। সারাটা দিন— অনেকখানি রাত— জোয়ার ভাটায় হাবুডুবু।

গেল ফাল্গুন মাসে সেই যে আপনার ছোট্ট চিঠিখানা পেয়েছিলুম, সেকথা প্রায়ই আমার মনে পড়ে। তখন থেকেই বুঝেছি বিধাতার[১] কৃপা আমার ওপর আছে। আমি সারাটা জীবন এমনতর জিনিষই চেয়েছিলুম। চট করে যে মিলে যাবে সে রকম ভরসা বড় একটা ছিল না। কিন্তু শুরুতেই পেয়ে গেলুম। ছাড়্‌চিনে, এ জিনিষটাকে স্মৃতির মণিমঞ্জুষার ভেতরেই আটকে রাখবার মত উদাসী আমি নই। বেদান্তের দেশে জন্মেও কায়াকে ছায়া বলা তো দূরের কথা, ছায়ার ভেতরেই আমি কায়াকে ফুটিয়ে তুলতে চাই।

স্পষ্ট হদিস্ পাচ্ছি, আমার এই টিমটিমে কবি জীবনটি দপ্ করেই নিবে যাবে। যাক্‌গে— আপসোস কিসের? আপনাদের নব নব সৃষ্টির রোশনায়ের ভেতর আলো খুঁজে পাব তো— আপনাদের সঙ্গে সঙ্গে চলবার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হব না তো। সেই তো সমস্ত। আমার হাতে যে বাঁশী ভেঙে যাচ্ছে— গেছে, বন্ধুর মুখে তা অনাহত বেজে চলেছে,— আমার মেহেরাবে বাতি নিবে গেল, বন্ধুর অনির্বাণ প্রদীপে পথ দেখে চললুম,— এর চেয়ে তৃপ্তির জিনিষ আর কি থাকতে পারে।

চারিদিকেই বে-দরদীর ভিড়। আমরা যে কটি সমান-ধর্মা আছি, একটা নিরেট অচ্ছেদ্য মিলন সূত্র দিয়ে আমাদের গ্রথিত করে রাখতে চাই।[২] আমাদের তেমন পয়সা কড়ি নেই বলে জীবনের 'ক্রিচার্ কমফর্টস' জিনিষটি হয়তো চিরদিনই আমাদের এড়িয়ে যাবে; কিন্তু এক সঙ্গে চলার আনন্দ থেকে অমরা যেন বঞ্চিত না হই— সে পথ যতই পর্ণমলিন, আতপক্লিষ্ট, বাত্যাহত হোক না কেন।

আরো নানা রকম আলাপ কলকাতায় গিয়ে হবে। কেমন পড়ছেন;[৩] ফার্স্ট ক্লাস নেওয়া চাই। কলকাতায় গিয়ে নতুন ঠিকানা আপনাকে সময়মত জানাব। আমার প্রীতি সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।[৪] ইতি—

আপনার

শ্রীজীবনানন্দ দাশগুপ্ত

নলিনী চক্রবর্তীকে[৫] লেখা

বরিশাল
৩১.১০.৪২

প্রীতিভাজনেষু,

যথাসময়ে আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি।....

আপনাকে তো আমি বলেছি কবিতা পাঠাব।[৬] নানা রকমের শারদীয় সংখ্যায় লেখা ছড়িয়ে এখন একটু বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আবার যখন লেখার দিকে টান ফিরে আসবে আপনাকে পাঠাব।....

বনলতা সেনও[৭] কবে বেরুবে এখনও ঠিক বলতে পারছি না। বুদ্ধদেবকে এখনও ম্যানাস্‌ক্রিপ্ট পাঠাতে পারিনি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নতুন এডিশন এখন বের করা সম্ভব হবে না। এ দেশের প্রকাশকেরা কেউ নিজের খরচে বড় একটা কবিতার বই ছাপাতে চান না। আমাদের পক্ষেও ছাপানো কঠিন। যা হোক, আমার ইচ্ছা আছে, পরিস্থিতির উন্নতি হলে এ সম্পর্কে একটা কিছু ব্যবস্থা করব।....

অধ্যাপনা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সে সবের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আপনি যা লিখেছেন ঠিকই। তবে অধ্যাপনা জিনিষটা কোনো দিনই আমার তেমন ভালো লাগেনি। যে সব জিনিষ যাদের কাছে যে রকম ভাবে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে, তাতে আমার বিশেষ আস্থা নেই। এ কাজে মন তেমন লাগে না, তবু সময় বিশেষে অন্য কোনো কোনো প্রেরণার চেয়ে বেশি লাগে তা স্বীকার করি।....

আমরা ভাল আছি। আপনাদের কুশল প্রার্থনীয়। প্রীতি নমস্কার।

ইতি—
জীবনানন্দ দাশ

বরিশাল
২৬.১২.৪৫

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি পেয়ে আনন্দিত হয়েছি। উত্তর দিতে খুবই দেরি হয়ে গেল। আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, হাতেও অনেক কাজ ছিল। ....কাজেই যথাসময়ে লিখতে পারিনি, ক্ষমা করবেন।

...কবিতা রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারা যায় এই ঃ যখনই 'ভাবাক্রান্ত' হই, সমস্ত ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোশাকে ততটা ভেবে নিতে পারি

না, যতটা অনুভব করি,— একই এবং বিভিন্ন সময়ে। অন্তঃপ্রেরণা আমি স্বীকার করি। কাব্য সম্পর্কে ইংরেজিতে 'ইমাজিনেশন' শব্দটি প্রচলিত আছে এর বাংলা কি?— যে কবির কল্পনা-প্রতিভা আছে সে ছাড়া আর কেউ কাব্য সৃষ্টি করবার মতো অন্তঃপ্রেরণার দাবি করতে পারে কি? এবং এ প্রেরণা ছাড়া শ্রেষ্ঠ কবিতা লেখা কি করে সম্ভব হতে পারে? যদিও কোনো কোনো কবি এর তাগিদ সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে চান, তবুও তাঁদের ভালো কবিতা প'ড়ে বোঝা যায় যে তাঁদের আত্মালোচনায় অসম্পূর্ণতা রয়েছে।

বুদ্ধিমান— এমন কি জ্ঞানী বিজ্ঞানী মানুষের পক্ষেও নিছক বিজ্ঞান বা জ্ঞানসত্তার বলে প্রায় 'মেকানিক্যালি' মহৎ কবিতা লেখা সম্ভব নয়। কিন্তু ভাব-প্রতিভাজাত এই অন্তঃপ্রেরণাও সব নয়, তাকে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত শুনতে হবে, এ জিনিষ ইতিহাস-চেতনায় সুগঠিত হওয়া চাই।

এই সব কারণেই— আমার পক্ষে অন্তত— ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার নয়, কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে সময় লাগে। কোনো কোনো সময় কাঠামোটি, এমন কি প্রায় সম্পূর্ণ কবিতাটি খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপর— প্রথম লিখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে— চারিদিককার প্রতিবেশ চেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে চায় পুনরায় ভাব প্রতিভার আশ্রয়ে। এ রকম অঙ্গাঙ্গিযোগে কবিতাটি পরিণতি লাভ করে। এর ফলে, আমার এক বন্ধু আমাকে যা লিখেছেন— 'কবিতার প্রত্যেকটি আঙ্গিক অন্য প্রত্যেকটি আঙ্গিককে স্পষ্ট ও সুসমঞ্জস করে তোলে। এতে করে কোনো একটি বিশেষ ছত্রের দাম হয়তো ক্ষুণ্ণ হয়, কিন্তু সমস্ত নক্সাটার উজ্জ্বলতা চোখে পড়ে বেশি।' কিন্তু এ রকম ঐকান্তিক কবিতা আমি বেশি লিখতে পারিনি। এর কারণ, ভাব প্রতিভা, তাকে বলয়িত ক'রে নেবার অবসর ও শক্তি এবং প্রজ্ঞাদৃষ্টির উপযুক্ত প্রভাব কোনো না কোনো কারণে কিছু শিথিল হয়ে গিয়েছিল।

(আমার কাব্য প্রেরণায় উৎস নিরবধি কাল ও ধূসর প্রকৃতির চেতনার ভিতর রয়েছে বলেই তো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সব সময়ই যে 'ধূসর' তা হয়তো নয়।)

(যাকে আপনি বলেছেন) মহাবিশ্বলোকের ইসারা থেকে উৎসারিত সময় চেতনা, 'কন্‌সাসনেস অফ্ টাইম অ্যাজ এ ইউনিভারস্যাল', তা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতি-সাধক অপরিহার্য সত্যের মত। কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ জিনিষটা আমি না গ্রহণ করে পারিনি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময়চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে।

আজ পর্যন্ত যে সব কবিতা আমি লিখেছি, সে সবে আবহমান মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভাভূমিকায় এক 'অনাদি' তৃতীয় বিশেষত্ব হিসেবে স্বীকার করে কেবল মাত্র তারই ভিতর থেকে উৎস-নিরুক্তি খুঁজে পাইনি, কেউ কি পায়?

পেলে লিরিক বৈশিষ্ট্যের একাগ্রতা ভেঙে কবিতা নাট্যপ্রাণ পবিত্রতায় মুক্ত হতে পারত। নাট্যকবির পক্ষে ওটা পাওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আজো আমি লিরিক কবি,— এই পথে রয়েছে আর এক রকম বিচিত্র শুদ্ধতা। ...সাহিত্যের বড় বাজারে আমার কবিতা কাটে বলে মনে হয় না, তবে যে বাজারে কাটে সেখানে গ্রহীতার সংখ্যা বরং কম। তাঁদের ভিতর থেকে দু-একজন যদি আমাকে জানান (যেমন আপনি জানিয়েছেন) যে, 'সেখানে আমরা দু-একজন থাকি অনেক বেশি দাম দিয়ে অনেক ক্ষতি স্বীকার করে, অনেক কাঁটায় ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে পাহাড়ের চূড়ায় চড়বার জন্য তৈরি হয়ে, কৃষ্ণনীল সময়ের ডানায় নিজেদের ভয়ে ভয়ে বেঁধে নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রের কোটি আলোক বৎসরের সমুদ্র পাড়ি দেবার জন্যে তৈরি হয়ে'— তাহলে স্পষ্ট আশ্বাস পাওয়া যায়।

কোনো কিছুকে চরমভাবে ভেবে সুস্থিরতা লাভ করবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই, রয়েছে হয়তো কবির ভাবনাপ্রসাদ, চরম ভেবে আঁকড়ে থাকার ভিতর নির্বাণ-অনির্বাণেরও সময়— স্বপ্নও আছে, শান্তি আছে, মাত্রাচেতনা আছে, উত্তেজনাও যে নেই, তা নয়, কিন্তু তা 'নিরিখে'র সান্ত্বনায় ফিরে আসে। আমিও সাময়িকভাবে কোনো কোনো জিনিষকে চরম মনে করে নিয়েছি জীবনের ও সাহিত্যের তাগিদে, মনকে চোখ ঠার দিয়ে মাঝে মাঝে— 'টেমপোরারি সাস্‌পেনশান অফ্ ডিস্‌বিলিফ্' হিসেবে। কিংবা কখনো কখনো মনকে এই বলে বুঝিয়েছি যে, যাকে আমি শেষ সত্য বলে মনে করতে পারছি না, তা তবুও আমাদের ইতিহাসের দিক্-নির্ণয়-সত্তা; আজকের প্রয়োজনে চরম ছাড়া হয়তো আর কিছু নয়। কিন্তু তবুও সময়-প্রকৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা করেছি, (অনেক দিন ধরেই পরিপ্রেক্ষিতের আবছায়া এত কঠিন যে) এর চেয়ে বেশি কিছু আয়ত্ত করে কবিদের পক্ষে পাওয়া অসম্ভব না হলেও কিছুটা সুদূর পরাহত....

আশা করি ভাল আছেন, প্রীতি নমস্কার।

ইতি—
জীবনানন্দ দাশ

সর্বানন্দ ভবন, বরিশাল
২১/১/৪৬

প্রীতিভাজনেষু,

আপনার চিঠি ও কবিতা পেয়ে খুশী হয়েছি। এবারও উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল। এ জন্য গতবার যে কারণ দেখিয়েছি, তা থেকে নিশ্চয়ই আপনার মোটামুটি ধারণা হয়েছে যে আমি আসলে অলস কিংবা ভালো চিঠি লিখিয়ে নই এবং এ

সব দোষ স্বীকার করবার মত গুণ নেই আমার। কাজেই বড় কথা পেড়ে ছোট জিনিষটাকে চেপে রাখি। এ ধারণা একেবারে অসত্য নয়। আমি যা লিখেছিলাম, তাও মিথ্যা নয়। সংসারের মোটা লেনদেনের থেকে যে চিঠি যত দূরে সে চিঠি তত— সৎ কি অসৎ বলব না— শুদ্ধতর চৈতন্যের জিনিষ। এ সব চিঠির উত্তর দিতে অল্প-বিস্তর দেরি হবেই।

আমার কবিতা সম্পর্কে আলোচনা আপনি সহজবোধেই শুরু করুন। আপনার সহজবোধ তো অরসিকের নয়, লিখতে লিখতেই জিনিষটা আপনার দৃষ্টিলোকে ক্রমায়ত ক'রে খুলে দেবে। পাণ্ডিত্য নয়, তার চেয়ে বড় জিনিস প্রজ্ঞা আপনাকে সাহায্য করবে। বই পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রজ্ঞা শেষ পর্যন্ত শুধু মাত্র ও-রকম বিদ্যা-সাপেক্ষ নয়। অন্য রকম জিনিষ; প্রবীণ চেতনায়ই বিচরণ করতে চায় বেশি। আপনি নবীন, কিন্তু আমার মনে হয়, আপনার সহজবোধের সেতু সার্থকতা হয়তো বা তার খোঁজ পেয়েছে।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রেমের কবিতা নিয়ে আরম্ভ করতে পারেন। এক একটি কবিতা ধরে রিচার্ডসীয় বিশ্লেষণপন্থা মন্দ নয়। সেই আপনার ভালো লাগে লিখেছেন। এ সব বিষয়ে নিজের আকাঙ্ক্ষিত পথে চলেই চৈতন্য জেগে ওঠে, দোটানায় আলোড়ন কাটিয়ে কথা ও ভাষা নির্মলভাবে কেলাসিত হয়ে উঠবার সুযোগ পায়। কাব্য বিচারের পক্ষে এ সব অপরিহার্য।

আপনি প্রকৃতিজ্ঞান ও সময়চেতনা সম্পর্কে যা লিখেছেন, আমারও ধারণা সে রকম প্রায়। প্রীতি নমস্কার।

ইতি—
জীবনানন্দ দাশ

বরিশাল
২/৭/৪৬

প্রীতিভাজেনেষু,

কলকাতার থেকে যে কার্ড লিখেছিলাম তা' পেয়েছেন আশা করি। আধুনিক বাংলা কবিতার ধারাবাহিক ইতিহাস লেখার কাজে হাত দিয়েছেন কি?

১. আমার কাব্যগ্রন্থগুলো আপনি চেয়েছেন। এ পর্যন্ত আমার চারটে কবিতার বই[৯] বেরিয়েছে, আমার পঞ্চম কবিতার বই[১০]— যার ভিতরে আমার শেষের দিকের অনেক রিপ্রেজেন্‌টেটিভ্ কবিতা থাকবে, তা এখনও গ্রন্থাকারে বেরয়নি, সে সবের পাণ্ডুলিপিও আমার কাছে নেই— প্রেসে আছে। বই বেরুতে বেশ কিছু দেরি হবে। আপনার চিঠি পেলে আমার দুখানা বই[১১] আপনাকে পাঠিয়ে দেব। প্রথম

কবিতারবইটি পাঠাব কিনা ভাবছি, সে বইয়ের বিশেষ কোনো ইম্‌পরটেন্স আছে বলে মনে হয় না। আর 'বনলতা সেন' বইটির সমস্ত কবিতাই 'মহাপৃথিবী'তে আছে।

২. কল্লোল, কালি-কলম প্রগতি ইত্যাদির কোনো সংখ্যা এখন আমার কাছে নেই। কলকাতায় কোনো কোনো প্রবীণ সাহিত্যিকের কাছে থাকতে পারে।

৩. আমার সংক্ষিপ্ত জীবনী ও পরিচয় চেয়েছেন। সম্প্রতি বড় ঝঞ্ঝাটের ভিতর আছি; লিখবার তাগিদ নেই। আপনি কি জানতে চাচ্ছেন তাও স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। ....আমার জন্ম হয়েছিল ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ফাল্গুন মাসে। পড়ে ছিলাম বি. এম. স্কুলে, বি. এম. কলেজে, প্রেসিডেন্সি কলেজে, ইউনিভারসিটি ও ল কলেজে। শেষ পর্যন্ত আইন পরীক্ষা দেওয়া হয়নি। অধ্যাপনা করেছি কলকাতায় সিটি কলেজে, দিল্লীর এক কলেজে, বরিশালে বি. এম. কলেজে। আরও দু চার রকম কাজ করেছি ফাঁকে ফাঁকে। এখনও অধ্যাপনাই করতে হচ্ছে। কিন্তু মনে হয় এ পথে আর বেশি দিন থাকা ভালো না। যে জিনিষ যাদের যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সবই অসারতার নামান্তর নয় কি? এইবার নতুন পটভূমি নেমে আসুক।

আমাদের পরিবার খুব বড়— কিন্তু সাহিত্যপ্রীতি ও রচনারীতির উৎকর্ষ লক্ষ্য করেছি বাবার জীবনে। তিনি অনেক ইংরেজি ও দেশী বই কিনতেন ও পড়তেন। ভাল লাইব্রেরি ছিল তাঁর। সংস্কৃতি ও সাহিত্য বিষয়ে উৎসাহী যুবা ও প্রৌঢ়দের আনাগোনা ছিল তাঁর গ্রন্থাগারে। বাবা মাঝে মাঝে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন তাঁদের বিদেশী ও দেশী সাহিত্য। নিজে বিশেষ কিছু লিখতেন না। যে ক'টি রচনা তাঁর পেয়েছি তাতে উচ্ছ্বাস কম— সংহতি বেশি। খুব তত্ত্বজ্ঞানী মানুষ ছিলেন। মা অনেক কবিতা লিখেছেন। সে সব কবিতার শাদা ঝর্ঝরে শব্দ নিক্কণ ও আশ্চর্য অর্থ-সঙ্গতি বরাবরই আমাকে প্রলুব্ধ করেছে, কিন্তু তবুও আমি প্রথম থেকেই অন্য পথ ধরে চলেছি। আমি খুব সম্ভবত জাত সাহিত্য প্রেমিক। যে আবহাওয়ায় ছিলাম তাতে উত্তরকালে ভালো সাহিত্যরসিক হয়েই মুক্তি লাভ করা যায় না, নিজের তরফ থেকে কিছু সৃষ্টি করবারও সাধ হয়। ছেলেবেলা থেকেই গল্প উপন্যাস— স্বদেশী ও বিদেশী নেহাত কম পড়িনি। ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচেনি। শ্রেষ্ঠ সমালোচনাও অবসরের অভাবে দানা বাঁধতে পারছে না। না পারছি মহৎ নাট্য সমালোচকের নেতিবাচক নিরাশা ভঙ্গ করে তেমন কিছু নাটক লিখতে। এই দারুণ সংগ্রাম কঠিন সময়ে নানারকম আধিজৈবিক দায়িত্ব মিটিয়ে যেটুকু সময় থাকে তাতে সাহিত্যের কোনো এক রকম অভিব্যক্তি (যেমন কবিতা) নিয়েই যতদূর সম্ভব পটভূমির প্রসার ও গভীরতা বাড়ানো যায়, সেই চেষ্টাই করা যেতে পারে। কিছু পরিমাণে এই জন্যই কবিতা লিখতে উৎসাহ পেয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রেরণা পেয়ে লিখেছি এই কারণে যে আমার যুক্তিধর্মী মানস আধুনিক সময়ের

সমস্ত সঙ্গ ও অহেতুকতার সংস্পর্শে এসে কবি মানসের দৃষ্টি উজ্জ্বলতায় রূপান্তরিত হতে চেয়েছে (হয়তো হয়েছে) ব'লে। এরপর বলতে হয় কবি মানস কী, কবিতা কাকে বলে? এ নিয়ে অন্যত্র আলোচনা করেছি, করব। আজ সময় নেই।

প্রথমেই 'কল্লোলে' কবিতা ছাপিয়েছি বললে ঠিক হবে না, কিন্তু কল্লোলেই প্রথম কবিতা ছাপিয়ে ভালো লেগেছিল। কল্লোলের যুগে আমি কলকাতায় থাকতাম। কল্লোলের শ্রেষ্ঠ লেখকদের সঙ্গে প্রায়ই দেখা কথাবার্তা হ'ত। কিছুকাল পরে 'কালি-কলম' বেরুল। কালি-কলমের দিক নিরূপক ছিলেন প্রেমেন্দ্র ও শৈলজানন্দ। মোহিতলাল কালি-কলমে কবিতা লিখতেন। 'কালি-কলম' অফিসেই নজরুল ইসলামকে প্রথম দেখেছি। ভালো না মন্দ, বড় বা ছোট কী এক যুগ ছিল সেটা? যাই না কেন স্কুলে পড়বার সময় যেমন প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন দত্ত, প্রভাত মুখুয্যে, ফরাসী ও রুশ গল্পের 'ছায়াবলম্বনে'র ওস্তাদ সূপকার চারুবাবু ও মণি গাঙ্গুলি— ও পরে অন্য গ্রামে শরৎ চাটুজ্যেকে অন্তর্জীবনে বিজড়িত ক'রে নিতে হয়েছে, কল্লোলের যুগে তেমনি সমালোচকদের পেয়েছি আর এক রকম ভাবে, অনেকটা নাগালের ভিতরে। মানস পরিধি থেকে পূর্বজেরা তখন সরে গিয়েছেন খানিক দূরে,— অনেক দূরে,— রবীন্দ্র, বঙ্কিম ও বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন ঐতিহ্যও ধূসরায়িত হয়ে গিয়েছিল বড় বড় বৈদেশিকদের উজ্জ্বল আলোর কাছে। বাংলা সাহিত্যে কল্লোল আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। সাহিত্য ও জীবনের ঘুরুনো সিঁড়ি দুয়ে মিলে এক হয়ে এক পরিপূর্ণ সমাজ-সার্থকতার দিকে চলেছে মনে হয়; কল্লোলের সাময়িকতা সেই সিঁড়ির একটা দরকারী বাঁক।

কল্লোল, কালি-কলম ক্রমেই বিস্রস্ত হয়ে যাচ্ছিল।

বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' এল নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। ব্যক্তিগতভাবে প্রগতি ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয়. . আমার কবিতার জন্য বেশ বড় স্থান দিয়েছিলেন তিনি প্রগতিতে এবং পরে কবিতার প্রথম দিক দিয়ে। তারপরে 'বনলতা সেন'-এর পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি ব'লে মনে করেন তিনি।

নিরুক্ত ও পূর্বাশার সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য মনে করেন আমার শেষের দিকের কবিতায় আমার পারিপার্শ্বিক-চেতনা প্রৌঢ় পরিণতি লাভ করেছে। এ পারিপার্শ্বিক অবশ্য সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে। কিন্তু আরো দু-চার রকম চেতনা আছে, আজো যাদের কবিতায় শুদ্ধ করে নিয়ে নির্ণয় করে দেখতে আমি ভালোবাসি। সমাজ যত বিশুদ্ধ, বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকৃত হোক না কেন, প্রেম, প্রকৃতি, সৃষ্টি-প্রপঞ্চ সম্পর্কে শেষ আত্মপ্রসাদ কোনো ঐকান্তিক কবি বা মনীষীর জীবনে ঘটে কি? ঘটেনি তো আমার জীবনে। সমাজ ও ইতিহাস সম্পর্কেও আমার কবিতা চেতনা হয়তো দেখিয়েছে,

আরো বড় চেতনায় উত্তর প্রবেশ চেয়েছে, কিন্তু সেই জ্ঞানদৃষ্টি কি পেয়েছে যা সমাজকে নতুন পথ দেখাতে পারে? কিন্তু কোন্ কবি তার কবিতায় সেই অমোঘ 'বিজ্ঞান দৃষ্টি'র প্রভাবে সমাজ ও পৃথিবীকে নতুন পথ দেখিয়েছে— কবি-লক্ষিত যেই পথ বেয়ে মানুষ তার প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত সমাজ পেয়েছে? প্রয়াণের প্রথম দিন থেকে শুরু করে আজো আমরা সে সমাজ পাইনি। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-দিব্যতা— যা নতুন শুদ্ধ সমাজ মানবকে দান করতে পারে— সেই দৃষ্টি দিব্যতার দিক থেকে তা হলে কি অতীতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই বিফল? কিংবা সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিই কি অল্পাধিক সার্থকতায় অবিচ্ছিন্ন সময়ের সমবেত চেষ্টায় বিজ্ঞানশুদ্ধ শুভ্র নিঃশ্রেয়স সমাজ গড়ছে? তা হয়তো গড়ছে (এ প্রয়াসের পথে কোনো শেষ কৈবল্যলোকও নেই হয়তো) যেমন সমস্ত শ্রেষ্ঠ মনীষী, অর্থশাস্ত্রী ও সঠিক বিষয়ালোকিত সেবক ও সাধকেরা গড়ছে। আধিদৈবিক উপায়ে এরা যেমন করে গড়ছে সমাজস্রষ্টা কবিতা সে সফলতার দাবি করতে পারে না হয়তো— কিন্তু অন্য এক শ্রেষ্ঠ সার্থকতা রয়েছে তার— যেখানে শুদ্ধ সমাজ সৃষ্টির শুভেচ্ছা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিরীতির শুদ্ধতা (যা ও-রকম সমাজ রচনা করছে, যদিও সে সমাজ আজো পাচ্ছি না আমরা) সবকিছু হয়েও আরো কিছুর অপেক্ষা রাখে যা বিষয় ও বিষয়-বিচারের উজ্জ্বলতাকে ভাব-প্রতিভার সাহায্যে কবিতার স্বতন্ত্র আভায় পরিণত করে।

আমার আধুনিক কবিতা এই সব ব্যাপারের থেকেই উৎসারিত হতে চাচ্ছে।

জীবনানন্দ দাশ

জীবনানন্দের সঙ্গে গ্রন্থকারের পরিচয়

তারিখটা, এমন কি মাসটাও আজ আর ঠিক মনে নেই। তবে যতদূর মনে হচ্ছে, ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি কি মার্চ মাস সেটা। সেই সময় একদিন আমার পরিচিত ডায়মণ্ড হারবার ফকিরচাঁদ কলেজের পরিচালক সমিতির সহকারী সম্পাদক রঞ্জিতাশ্ব মণ্ডলের[১] সঙ্গে কলকাতার এক পথে দেখা। দেখা হ'লে তিনি আমাকে বললেন— দাদা, আগামী রবিবার বিকাল চারটায় আমাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে একবার আসতে পারবেন?

আমি বললাম— কেন?

উত্তরে তিনি বললেন— রবিবারে আমাদের কলেজের জন্য একজন ইংরাজির প্রোফেসার সিলেক্ট করব। কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। অনেকগুলো দরখাস্ত এসেছে। তার মধ্যে থেকে বেছে কয়েকজনকে ইণ্টারভিউ-এর জন্য ডাকা হয়েছে। রবিবারে ঐ সময় আমাদের বাড়িতে ইণ্টারভিউ-এর ব্যবস্থা করেছি।

— কতজনকে ডেকেছেন? কারা সব দরখাস্ত করেছেন?

— তা কয়েকজনকে ডাকা হয়েছে। এঁদের মধ্যে একজন হলেন কবি জীবনানন্দ দাশ।

আমি বললাম— যদি নাও যেতাম, জীবনানন্দ দাশের নাম যখন শুনলাম, তখন নিশ্চয়ই যাব এবং তাঁরই যাতে চাকরিটা হয় গিয়ে বলব। তাঁর কবিতা আমি পড়েছি, খুব ভাল লাগে।

এরপর বললাম— সিকেলশান কমিটিতে কে কে থাকবেন?

— আমাদের সেক্রেটারী জগদীশবাবু এবং আমি তো থাকবই। আরও কমিটির কেউ কেউ থাকবেন।

সেক্রেটারী জগদীশ হালদারও আমার পরিচিত ছিলেন।

রবিবার বিকালে আমার বৌবাজারের বাড়ি থেকে রঞ্জিতবাবুদের বাড়িতে যেতে সামান্য একটু দেরি হয়ে যায়। আমি যখন যাই, গিয়ে দেখি— তখন আমারই এক বন্ধু কলকাতার উইমেন্স কলেজের অধ্যাপক প্রমথনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ইণ্টারভিউ হচ্ছে। আমি গেলে আমাকে দেখে প্রমথবাবু একটু খুশী হলেন এবং তাঁর ইণ্টারভিউ-এর শেষে তিনি আমাকে আলাদা ডেকে বললেন— ভাই দেখবেন এবং একটু বলে দেবেন, যাতে আমার চাকরিটা হয়।

প্রমথবাবুর এই কথার উত্তরে আমি তাঁকে পরিষ্কারই বললাম— এ চাকরিটা আপনার হবে না। হবে জীবনানন্দ দাশের। শুনেছি তিনিও একজন প্রার্থী আছেন। তাঁরই যাতে চাকরিটা হয়, সেই কথাই বলতে এসেছি। কমিটির এঁরা প্রায় সবাই আমার পরিচিত। শুধু পরিচিতই নয়, কেউ কেউ বন্ধুস্থানীয়ও। আমার এ বিশ্বাস আছে, আমি যা বলব, তাই হবে। তবে জীবনানন্দ দাশ যদি না আসেন, তাহলে আপনার কথা বলব।

প্রমথবাবু চলে গেলে রঞ্জিতবাবু আমার হাতে একটা কাগজ দিয়ে বললেন, এই দেখুন, আধঘণ্টা অন্তর অন্তর এঁদের ডাকা হচ্ছে।

কাগজটায় দেখলাম, প্রমথবাবুর পরই জনৈক বসুর ইণ্টারভিউতে আসার কথা।

প্রমথবাবু চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই দেখি, ধুতি পাঞ্জাবী পরা মাঝামাঝি উচ্চতার ও সাধারণ স্বাস্থ্যের এক ভদ্রলোক ঘরে এলেন। ভদ্রলোককে দেখলেই মনে হয় খুব শান্ত প্রকৃতির।

তিনি এলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— আপনি কি মি. বসু?

তিনি বললেন— না, আমি জীবনানন্দ দাশ।

এই শুনে আমি উৎফুল্ল হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে আবার স্বাগত জানিয়ে বললাম— দাদা আসুন, আসুন! আপনার জন্য আজ আমি এখানে এসেছি। যাতে আপনার চাকরিটা হয়, সেইজন্যই আমার আসা। এখানে যাঁরা আছেন এঁরা আমার বন্ধুস্থানীয়। এতক্ষণ আপনার কথাই আমি এঁদের বলছিলাম। সকলকেই মত করিয়েছি। আপনার চাকরি হয়ে গেছে।

ইণ্টারভিউ দিতে এসে কোনো প্রশ্ন বা সামান্য একটা কথারও সম্মুখীন না হয়ে, আমার মুখ থেকে একেবারে এই ধরনের কথা শুনে জীবনানন্দ কতকটা বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন।

এই সময় জগদীশবাবু তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন— আপনি এই কলকাতা থেকেই যাতায়াত করবেন? না ডায়মণ্ডহারবারে গিয়ে থাকবেন? এখান থেকে যাতায়াত করলে যেদিন সকালের দিকে ক্লাস থাকবে, সেদিন কিন্তু আপনাকে অনেক সকালে বেরুতে হবে। এর উপর ট্রেনের গোলমাল তো লেগেই আছে। তাই সেখানে কলেজের হস্টেলে থাকতে পারলেই ভাল হয়। যদি ফ্যামিলি নিয়ে যেতে চান, তাহলেও বাড়ি পাবেন।

এই কথায় জীবনানন্দ একটু ভেবে বললেন— আমি কাছেই থাকি। এ সম্বন্ধে ঠিক করে কাল পরশুর মধ্যে জানিয়ে যাব। তাহলে হবে কি?

জগদীশবাবু বললেন— তা হবে।

এবার আমি জীবনানন্দকে বললাম— চলুন দাদা, আমাদের কাজ হয়ে গেছে। এরপর যাঁরা ইণ্টারভিউ দিতে আসবেন, এঁরা তাঁদের সঙ্গে কথা বলবেন। চলুন, আপনার সঙ্গে গিয়ে আপনার বাড়িটা দেখে যাই। আপনি তো কাছেই থাকেন বললেন।

এই বলে আমরা দুজনে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উঠে পড়লাম।

পথে এসে আমি বললাম— আমি না এলে ওঁরা প্রমথ গাঙ্গুলী নামে এক ভদ্রলোককে নেওয়াই ঠিক করতেন। কারণ, তিনি ফার্স্ট ক্লাস এম. এ. এবং একজন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ অধ্যাপকও।

জীবনানন্দ আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি বললাম— আপনার সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ পরিচয় হ'ল, তখন পরে আমার সবই জানতে পারবেন। এখন শুধু এইটুকু জেনে রাখুন— আমিও একটু আধটু লিখি। কাজ করি ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায়। আর আপনার কবিতার একজন ভক্ত।

ল্যান্সডাউন রোড ধরে দক্ষিণে খানিকটা হেঁটে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে এলে তিনি বললেন— এইখানে আমি থাকি। এই বলে পশ্চিম দিকে ফুটপাথে গিয়ে গলির মতো একটু ভিতরে ঢুকে একটা বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বাড়িটা তিন তলা। ঐ বাড়ির একতলায় তিনি থাকতেন তিনখানা ঘর নিয়ে একটা ফ্ল্যাটে। দুতলায় ও তিনতলায় উঠবার সিঁড়ি বাইরে। একতলার ঘরগুলো দক্ষিণ মুখো। সঙ্গে বারান্দা। বারান্দার সামনে একটু উঠান। উঠানের পাশ দিয়ে একটা বড় ঝাঁকড়া নিম গাছ, একটা নারকেল গাছ এবং আরও কয়েকটা মাঝারি আকারের গাছ উঠে গেছে। ফলে সমস্ত উঠানটায় এবং ঘরের বারান্দারও অনেকটায় গাছের পাতার বেশ ছায়া পড়েছে দেখলাম। খুব নির্জন ও সুন্দর পরিবেশ।

ঐ তিনখানা ঘরের একেবারে পশ্চিম দিকের ঘরটায় নিয়ে গিয়ে আমাকে বসালেন। সেখানে একটা সিঙ্গল খাট, চেয়ার, টেবিল ও কিছু বই দেখলাম।

আমায় বসিয়েই বললেন— চা খান।

বললাম— আমি চা খাই না। তাছাড়া কিছুই খাব না। খাবার দরকার হ'লে পরে এসে একদিন খেয়ে যাব। আপনার বাড়িটা দেখতেই শুধু এসেছিলাম।— এই বলে অল্প সময় তাঁর ঘরে বসে এবং তাঁর সংগৃহীত বইপত্রগুলো একটু দেখে উঠে পড়লাম।

জীবনানন্দ আমার ঠিকানা নিয়ে বাইরে রাস্তা পর্যন্ত আমায় আগিয়ে দিয়ে গেলেন।

বাসে উঠে মনে মনে ভাবলাম— এই সেই 'বনলতা সেনে'র কবি। চালচলনে অতি সাদাসিধে এবং অত্যন্ত শান্ত প্রকৃতির মানুষ। কথা বলেন খুবই কম। আর মুখে প্রায় সব সময়েই হাসি।

এরপর দু তিন দিন কেটে গেছে। ঐ সময় একদিন বিকালে জীবনানন্দ ফকির চাঁদ কলেজের কর্তৃপক্ষকে কি জানালেন, তা জানবার জন্য তাঁর বাড়িতে গেলাম। আমি যেতেই তিনি বললেন— ভাই, ওখানে চাকরিটা হল না।

— তার মানে? কেন? কি হল?

— এখন দেখছি, এখান থেকে ডেলি প্যাসেঞ্জারী করে অতদূর যাওয়া-আসায় বেশ অসুবিধাই হবে। ওখানে গিয়ে হস্টেলে থাকাও সম্ভব নয়। কারণ, প্রথমত—

আমার ফ্যামিলি এখানে রেখে সেখানে গিয়ে আমার থাকা চলবে না। দ্বিতীয়ত— যে টিউশনিটা করছি, সে ছাত্রও ছাড়তে চাইছে না।

— তা হলে কি করবেন? শুধু ঐ টিউশনিই?

— কাগজে মাঝে মাঝে কিছু লিখি। এই যেমন সম্প্রতি দেশ ও স্টেটসম্যানে শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটা প্রবন্ধ লিখেছি।

— ওতে আর কি হবে? ক'টাকা পাওয়া যাবে?

— আপনি ডায়মণ্ডহারবার কলেজে যেমন আমার চাকরিটা করে দিয়েছিলেন, ঐ ভাবে আর কোথাও একটা জোগাড় করে দিন না!

— আবার একটা প্রোফেসারি পাওয়া কি অত সহজ হবে দাদা! জানাশোনা কোনো কলেজে যদি খালি থাকে, তবেই তো কাউকে বলতে বা ধরাধরি করতে পারব? না হলে কি করব?

— আপনি একটু চেষ্টা করুন না। আপনি চেষ্টা করলেই হবে। কাগজের অফিসে কাজ করেন যখন, তখন তো অনেক লোকের সঙ্গেই আপনার পরিচয় আছে।

— আচ্ছা দেখি, বলে সেদিন তখন চলে এসেছিলাম।

এরপর আমি যেখানে যেখানে আমার পরিচিত বন্ধু-বান্ধব অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ যাঁরা ছিলেন, তাঁদের কাছে খোঁজ নিতে থাকি, তাঁদের কলেজে ইংরাজির কোনো অধ্যাপকের পদ খালি আছে কিনা?

এইভাবে খোঁজ নিতে নিতে হাওড়া গার্লস কলেজ ও হাওড়ার শিবপুর দীনবন্ধু কলেজ— এই দুই কলেজেরই প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যকে একদিন জিজ্ঞাসা করলাম।

বিজয়দা আমার বিশেষ পরিচিত। পরিচয়ের হেতু, প্রথমত— আমি তখন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহে হাওড়ার বাজেশিবপুর ও শিবপুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি এবং বিজয়দার শিবপুরের বাড়িতেও কয়েকবার যাতায়াত করেছি। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেসের যখন সভাপতি ছিলেন, তখন ইনিও হাওড়া জেলা কংগ্রেসের একজন প্রথম শ্রেণির নেতা ছিলেন। দ্বিতীয়ত— আমিও একজন হাওড়া জেলার অধিবাসী হিসাবে এই সময় হাওড়া জেলা লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশন ক'রে, আমরা হাওড়ায় যে গ্রন্থাগার আন্দোলন করছিলাম, ঐ অ্যাসোসিয়েশনের সহঃ সভাপতি ছিলেন বিজয়দা এবং আমি ছিলাম— সহকারী সম্পাদক।

একদিন হাওড়ার ডিউক লাইব্রেরিতে লাইব্রেরি অ্যাসোসিয়েশনের সভায় আমি বিজয়দাকে জিজ্ঞাসা করি— আপনার কোনো কলেজে ইংরাজির অধ্যাপকের পদ খালি আছে কি?

তিনি বললেন— গার্লস কলেজে হয়ত একজন ইংরাজির অধ্যাপক নেব। তবে এখনও কিছু ঠিক নেই।

এই কথা শুনে আর কোনো কথা বললাম না। পরদিন সকালেই জীবনানন্দের

কাছে গেলাম। গিয়ে বললাম— দাদা, *দেশ* আর *স্টেট্সম্যান* কাগজের যে যে সংখ্যায় আপনার শিক্ষা বিষয়ক লেখাগুলো বেরিয়েছে, সেই কাগজগুলো দিন তো দেখি, যদি আপনার একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে পারি। আপনার শুধু কবি পরিচয় দিয়ে হয়ত সুবিধা করতে পারব না। এই বলে *দেশ* ও *স্টেট্সম্যান* কাগজগুলো নিয়ে এলাম।

ঐগুলো নিয়ে পরের দিন বিজয়দার বাড়িতে গেলাম। গিয়ে ঐ সব কাগজে জীবনানন্দের লেখাগুলো তাঁকে দেখিয়ে বললাম— ইনি শুধু একজন নামকরা কবিই নন, শিক্ষা বিষয়ে একজন চিন্তাশীল ব্যক্তিও। এই বলে জীবনানন্দের একটু বড় করেই পরিচয় দিলাম।

তিনি লেখাগুলো একটু একটু করে পড়ে বললেন— ঠিক আছে। ওঁকে একদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।

আচ্ছা— বলে কাগজগুলো নিয়ে উঠে পড়লাম। উঠে সিধা একেবারে জীবনানন্দের কাছে গেলাম। গিয়ে তাঁকে সমস্ত বললাম।

শুনে জীবনানন্দ বললেন— দেখছি, উনি তো আপনার খুবই পরিচিত। আমাকে আবার যেতে হবে? আপনিই সব ঠিক্‌ঠাক করুন। তারপরে ইণ্টারভিউ-এর সময়েই একেবারে যাব।

পরের দিন সকালে আবার বিজয়দার কাছে গিয়ে বললাম— দাদা, আমি জীবনানন্দবাবুর একটা দরখাস্ত এনে দিই। আপনি ইণ্টারভিউ-এর ব্যবস্থা করুন। তখন আসবেন।

উত্তরে তিনি বললেন— আচ্ছা, তোমার অত গরজ কেন বলত? যাঁর চাকরি হবে তাঁর দেখা নেই, মাঝখান থেকে তুমি ছুটোছুটি করে মরছ! তিনি যদি চাকরি করতে চান তো তাঁকে একদিন আমার এখানে আসতে বোলো। ইণ্টারভিউ আর পৃথকভাবে নাও হতে পারে। আমি যা করব তাই হবে। নেবার আগে মেম্বারদের শুধু জানাব।

পরের দিন সকালে জীবনানন্দের বাড়িতে গিয়ে বিজয়দা আমাকে যা বলেছিলেন, সবই তাঁকে বললাম। এবং বিজয়দার বাড়ির ও তাঁর কলেজের ঠিকানা দিয়ে বললাম— সকালে হ'লে বাড়িতে আর তা না হলে দুপুরে কলেজে গিয়ে যত শীঘ্র সম্ভব একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করুন। আপনি শুধু দেখাটা করে কথাবার্তা বলে আসুন, তারপর আবার যা বলবার সে আমি বলব।

দুতিন দিন পরে বিজয়দার সঙ্গে দেখা হ'লে জীবনানন্দ তাঁর সঙ্গে দেখা করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে তিনি বললেন— হ্যাঁ এসেছিলেন। কথাবার্তা হয়েছে। একটা দরখাস্ত পাঠিয়ে দিতে বলেছি। শীঘ্রই তাঁকে নেওয়া হবে বলে দিয়েছি।

একথা শুনেও জীবনানন্দের ঐ চাকরির জন্য তাঁকে আর একবার অনুরোধ করলাম।

জীবনানন্দকে হাওড়া গার্লস কলেজে চাকরি দেওয়ার জন্য বিজয়দাকে যে অনুরোধ করেছিলাম, তিনি তা রেখেছিলেন। তিনি তাঁর কলেজে জীবনানন্দকে শুধু ইংরাজির একজন অধ্যাপকই নয়, ঐ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক হিসাবেই নিয়োগ করেছিলেন। তখন ঐ কলেজে ইংরাজির অধ্যাপক ছিলেন ৪।৫ জন এবং একজন বিভাগীয় প্রধান হিসাবেও কাজ করছিলেন। বিজয়দা তাঁকে সে পদ থেকে নামিয়ে (যদিও এতে ঐ অধ্যাপক তখন একটু মনঃক্ষুণ্ণই হয়েছিলেন) বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ অধ্যাপক হিসাবে জীবনানন্দকেই বিভাগীয় প্রধান করেছিলেন।

জীবনানন্দের কোনো কিছু খবর বা তাঁর পড়ানো ইত্যাদি না দেখেশুনেই আমার অনুরোধে এবং সরল মানুষ জীবনানন্দের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে মুগ্ধ হয়েই বিজয়দা তাঁকে একেবারে ঐ পদে নিয়োগ করেছিলেন।[২]

আর শুধু এই নয়, তখন ঐ কলেজে বিভাগীয় প্রধান হিসাবে কোনো বিভাগের প্রধান অধ্যাপকই কোনো অ্যালাউয়েন্স পেতেন না। কিন্তু বিজয়দা জীবনানন্দকে ইংরাজি বিভাগের প্রধান করে পৃথকভাবে তাঁর পঞ্চাশ টাকা অ্যালাউয়েন্সের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। এবং ঐ সময় তিনি জীবনানন্দকে বলেছিলেন— আপনি যাতে এখানে স্থায়ীভাবে থাকেন, সেইজন্যই এই ব্যবস্থা করলাম। ধরে নিন্, এখনই আপনাকে পার্মানেণ্ট হিসাবেই নিয়োগ করলাম।

জীবনানন্দ হাওড়া গার্লস কলেজে ঢুকেই সর্বসমেত মাহিনা পেতেন— মাহিনা ১৫০ টাকা, তৎকালীন কলেজ ডি. এ. ৫০ টাকা, আর ঐ বিভাগীয় প্রধানের অ্যালাউয়েন্স ৫০ টাকা অর্থাৎ মোট ২৫০ টাকা। সে সময়কার হিসাবে এই মাহিনা খুবই ভাল ছিল।

হাওড়া গার্লস কলেজ হাওড়া শহরে হলেও কলেজটি প্রায় কলকাতার গায়েই। কারণ, হাওড়া রেল স্টেশনের পশ্চিমে যে বাক্ল্যাণ্ড ব্রীজ আছে, সেই ব্রীজ থেকে নেমে মিনিট দুই হেঁটে ডানদিকের পথে গেলেই কলেজ। মাঝখানে একটা পুকুর এবং চারিদিকে বড় বড় গাছে ঘেরা এক বাগান বাড়ির মধ্যে কলেজটি অবস্থিত। কলেজের পাশেই হাওড়া ময়দানের ফাঁকা মাঠ।

জীবনানন্দ এই কলেজে কাজ পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলেন। কারণ, এক তো কলেজের সুন্দর ও মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ ; দ্বিতীয়ত, এখানকার অধ্যক্ষ, অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ ও ছাত্রীদের ব্যবহার তাঁর বেশ ভাল লাগত। কলকাতায় তাঁর বাড়ির কাছ থেকেই আর একজন অধ্যাপক তখন এই কলেজে যেতেন। তিনি প্রায়ই যাওয়া আসার পথে জীবনানন্দের সঙ্গী হতেন।

সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮১, ১৮৮৩ ও ১৮৮৬ সালে ৩ বার হাওড়া কোর্টের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। এই হাওড়া কোর্ট একরূপ বাকল্যাণ্ড ব্রীজের গায়েই। স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণে এই বাকল্যাণ্ড ব্রীজের নাম এখন হয়েছে বঙ্কিম সেতু।

হাওড়া গার্লস কলেজে জীবনানন্দের চাকরি হয়ে গেছে। কলেজেও যাতায়াত করছেন। ঐ সময় একদিন তাঁর বাড়িতে দেখা করতে গেলাম। মনে আছে, সেদিন তাঁর বাড়িতে আম ছিল, আমাকে আম খাওয়ালেন।

কলেজে সকলে তাঁর কবি পরিচয় পেয়েছেন কিনা, এখান থেকে হাওড়ায় যাতায়াতে কষ্ট হচ্ছে কি না, এইরূপ কয়েকটি কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারপর কিছুক্ষণ গল্প করে চলে আসি।

এরপর থেকে মাঝে মাঝে অনেক দিন ছাড়াছাড়া তাঁর বাড়িতে যেতাম। তাঁর বাড়িতে যাতায়াতের সময়কার কয়েক দিনের কথা বা ঘটনা যা মনে আছে এখানে বলছি।

একদিন সকালে গেছি। গেলে ঘরে বসিয়ে বললেন— আমার *বনলতা সেন* কবিতার বইটা সিগনেট প্রেস বার করেছে।— এই বলে তিনি আমার হাতে একখানা *বনলতা সেন* দিয়ে বললেন— কাগজ, ছাপা, বাঁধাই সবই ভাল, কিন্তু কভারের ছবিটা আমার আদৌ পছন্দ হয়নি।

আমি বইটা খুলে দেখছি। সেই সময় তিনি আর একটা *বনলতা সেন* নিয়ে তাতে আমার নাম লিখে আমার হাতে দিলেন।

আমি বই হাতে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম— দাদা, বনলতা সেন কে? আপনি তো লিখেছেন— 'নাটোরের বনলতা সেন'। এই নামে সত্যিই আপনার পরিচিতা কেউ ছিল নাকি?

আমার কথা শুনে মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন। কোনো উত্তর দিলেন না।

আমি আবার বললাম— দাদা, এই রকম আর একটা কবিতা লিখুন। পারবেন না?

এবারও তিনি তেমনি হাসতে লাগলেন। কোনো কথা বললেন না।

একদিন বিকালের দিকে জীবনানন্দের বাড়িতে গেছি। গেলে বললেন— কাল নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। নগদ একশো এক টাকা দিয়েছে, আর কিছু জিনিস উপহার দিয়েছে। এই বলে উপহারের জিনিসগুলো দেখালেন।

দেখলাম— একটা নতুন কুলোর মত পাত্রে আপেল, বেদানা, একটা নারকেল, পাকা পেঁপে প্রভৃতি নানা ফলও তাঁরা উপহার দিয়েছেন।

জীবনানন্দ ওর মধ্যে থেকে একটা আপেল নিয়ে ধুয়ে আমাকে খেতে দিলেন।

আমি আনন্দের সহিতই খেলাম।

একদিন গিয়ে বলি— দাদা, মূলত ভারতবর্ষ পত্রিকার লেখক-লেখিকাদের নিয়ে আমরা একটা সাহিত্যিক-সংস্থা গঠন করেছি। ঐ সংস্থার নাম 'সাহিত্য বাসর'। আমি ওর সম্পাদক। মাঝে মাঝে বন্ধু-বান্ধবদের আমন্ত্রণে এক এক জায়গায় ঐ সাহিত্য বাসরের অধিবেশন হয়। সেখানে সাহিত্যিকদের রচনা পাঠ ও সাহিত্য বিষয়ে আলোচনা হয়; এমন কি নাচ গানেরও ব্যবস্থা থাকে। সভায় কোনো বিখ্যাত সাহিত্যিক

সভাপতিত্ব করেন। তাছাড়া কখন কখন উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি হিসাবে কোনো কোনো সাহিত্যিক থাকেন। এইবার কলকাতায় জানবাজারের বিখ্যাত রাণী রাসমণির বাড়িতে তাঁর জামাতা মথুরবাবুর এক বংশধরের আমন্ত্রণে সেখানে সভা ডাকা স্থির করেছি। আপনাকে এবার আমাদের ঐ সভায় সভাপতিত্ব করতে যেতে হবে।

সব শুনে তিনি বললেন— কলেজে পড়ানো ছাড়া আমি তো ভাই সভায় বক্তৃতা দিতে পারি না। এই জন্যই আমি কোনো সভাতেই যাই না।

— কিন্তু আমার যে খুব ইচ্ছা, আপনি সভায় সভাপতি হন।

— আপনার সভায় যেতে পারলে, আমি নিজেও খুবই খুশী হতাম। কিন্তু আমি যে সভায় বক্তৃতা দিতে পারি না!

— বক্তৃতা আপনাকে দিতে হবে না। আপনি গিয়ে বসে থাকবেন, তাহলেই আমাদের হবে।

— সভাপতি হয়ে যাব, অথচ সভায় কোনো কথা বলব না, তা কখন হয়! তার চেয়ে আপনি বরং এক কাজ করুন— আমার বদলে বুদ্ধদেব বসুকে নিয়ে যান। আমি তাঁকে একটা চিঠি লিখে দিচ্ছি। সেটা নিয়ে গিয়ে তাঁকে দিন। দিলে তিনি আমার অনুরোধে আপনাদের সভায় যাবেনই।

তখন বললাম— কি আর করব, তাই দিন।

এরপর তাঁর চিঠি নিয়ে বুদ্ধদেববাবুকে দিলে তিনি আসবেন বলে মত দিলেন।

তখন আমি বুদ্ধদেববাবুকে বললাম— দাদা, তাহলে আপনি সভাপতি আর বৌদি প্রধান অতিথি— এইভাবে আপনাদের নাম দিয়ে চিঠি ছাপাতে দিই।

— তা দিন। কিন্তু যাব কি ভাবে?

— বড়লোকের বাড়িতে সভা হবে। তাঁদের অনেক গাড়ি আছে। আমি না এলে অন্য কেউ গাড়িতে করে আপনাদের নিয়ে যাবেন। আর সভার শেষে বাড়িতে পৌঁছিয়েও দিয়ে যাবেন।

পরে নির্দিষ্ট দিনে ২.১১.১৯৫৩ তারিখে যথা সময়ে রাণী রাসমণির বাড়িতে সাহিত্য বাসরের অধিবেশন হয়েছিল। ঐ সভায় সাহিত্য আলোচনা ছাড়া 'গম্ভীরা পরিষদ্' অর্থাৎ তারাপদ লাহিড়ী ও তাঁর সম্প্রদায় গম্ভীরা গান করেছিলেন এবং কবি কৃষ্ণ মিত্রের দুই কন্যা কুমারী শিপ্রা ও কুমারী স্বপ্না নেচে ছিলেন। বড় লোকের বাড়িতে সভা, তাই সভান্তে সকলের জন্য প্রচুর ভূরি-ভোজেরও ব্যবস্থা ছিল।

১৯৯২ সালে *জীবনস্মৃতি* বইটি লেখার সময় আমার পুরাতন কাগজপত্রের মধ্যে রাণী রাসমণির বাড়িতে সাহিত্য বাসরের ঐ দিনের সভার চিঠিটি পেয়ে যাই। তাতে দেখি— সেদিনের সভার সভাপতি, প্রধান অতিথি নিয়ে একটু অন্য কথা আছে। এখানে সেই চিঠিটি উদ্ধৃত করছি :

সাহিত্য বাসব

২৬ মদন বড়াল লেন
বৌবাজার, কলকাতা

প্রিয়বন্ধু,

আগামী ২বা নভেম্বর রবিবার অপবাহ্ণ ৩ টায় শ্রীঅমিয়গোপাল হাজরাব আমন্ত্রণে ১৩ রাণী রাসমণি রোডে (প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী রাসমণি ভবনে) সাহিত্য বাসরের এক প্রীতি সম্মেলন হবে। এই অনুষ্ঠানে বিখ্যাত সাহিত্যিক-দম্পতি শ্রীপ্রতিভা বসু ও শ্রীবুদ্ধদেব বসু যথাক্রমে সভানেত্রী ও প্রধান অতিথিব আসন অলঙ্কৃত কবেবেন। সভায় 'গম্ভীবা পবিষদে'র লোকসংগীত এবং কুমাবী রত্না ও স্বপ্না মিত্রেব নৃত্য পবিবেশনেব ব্যবস্থা আছে। আপনাব সানুগ্রহ উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

বিনীত

২৮.১০ ১৯৫৩ শ্রীগোপালচন্দ্র বায

জীবনানন্দ বইয়ের ১ম সংস্করণে 'জীবনানন্দের সঙ্গে গ্রন্থকারের পরিচয়' অধ্যায়ে পুরানো স্মৃতি থেকে লিখতে গিয়ে° লিখেছিলাম, ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি কি মার্চ মাসে জীবনানন্দের সঙ্গে গ্রন্থকারের প্রথম পরিচয় হয়। এখন সাহিত্য বাসরের সে দিনের ঐ মুদ্রিত চিঠিটি পেয়ে দেখছি, জীবনানন্দের সঙ্গে গ্রন্থকারের প্রথম পরিচয় হয় ১৯৫৩ ফেব্রুয়ারি অথবা মার্চেই।

জীবনানন্দকে দেখেছি— খাঁটি জাত কবি বলেই হয়ত তিনি অনেক সময় উদাসীন ও আত্মভোলা হয়েও কাজ করতেন। এখানে তাঁর ঐ রকমের দু-একটা ঘটনা বলছি।

আমার বৌবাজারের বাড়িতে একদিন সন্ধ্যায় তাঁর বেড়াতে আসার কথা। আসবেন, একথা তিনি নিজেই দিন ঠিক করে আমাকে চিঠি লিখে জানিযে ছিলেন।

সেই সময় কলকাতার একটি বালিকা বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষিকা তাঁদের একটা স্কুল পাঠ্য বই লেখা নিয়ে আমার পরামর্শ ও সাহায্য নিতে আমার কাছে আসতেন। আমার তখনকার লেখা দুটি গল্পের বইয়ের প্রকাশক এবং এঁদের ঐ স্কুলপাঠ্য বইয়ের প্রকাশক একই ব্যক্তি ছিলেন। তাই এঁরা নতুন লেখিকা বলে ঐ প্রকাশকই আমার কাছে এঁদের পাঠিয়েছিলেন। তাছাড়া এঁদের একজনের দাদা ছিলেন আমার বিশেষ পরিচিত।

এই শিক্ষিকাদের একজনের নাম ছিল— বনলতা।

জীবনানন্দ আসার আগের দিন এঁরা আমার কাছে এলে এঁদের বলি— কবি জীবনানন্দ দাশ কাল আমার এখানে আসছেন, আলাপ করবেন নাকি?

এই কথা শুনে বনলতা বললেন— নিশ্চয়ই আলাপ করব। কাল সন্ধ্যায় আমরা

আসবই। দেখুন, যদিও আমার পদবী সেন নয়, তবুও ওঁর বনলতা সেন কবিতার জন্য পাড়ার যুবক মহলে আমার তো নামই হয়ে গেছে— বনলতা সেন।

পরের দিন সন্ধ্যায় যথা সময়ে বনলতারা দুই বান্ধবীতে আমার বাড়িতে এলেন। কিন্তু জীবনানন্দের আর দেখা নেই। বনলতারা কবি জীবনানন্দকে দেখবার আশায় রাত্রি প্রায় ৯টা পর্যন্ত আমার বাড়িতে বসে রইলেন, কিন্তু তিনি আর এলেন না।

তখন বললাম— হয় কোনো কাজে আটকে পড়েছেন, না হয় অসুখ বিসুখ করেছে, তাই আসতে পারলেন না।

যদিও এই কথা বললাম, মনে মনে কিন্তু আবার এও ভাবলাম— এঁরা আমার সম্বন্ধে অন্য কিছু ভাবছে না তো?

যাই হোক, এঁরা শেষ পর্যন্ত হতাশ হয়েই চলে গেলেন। আমিও এঁদের কাছে যেন একটু ছোট হয়ে গেলাম।

এঁরা চলে গেলে প্রায় ঘণ্টা খানেক পরে দেখি জীবনানন্দ আমার বাড়িতে এসে হাজির। তাঁকে দেখে আমি বললাম— কি দাদা, এই কি আপনার সন্ধে বেলা?

— ভাই, একেবারে ভুলেই গিয়েছিলাম যে আজ এখানে আমার আসার কথা। কি একটা করতে গিয়ে হঠাৎ মনে পড়ে গেল। তখন অনেকটা রাত হয়ে গেছে। তবুও তখনি বেরিয়ে পড়লাম।

— তা তো হ'ল, কিন্তু আপনার বনলতা সেন যে আপনাকে দেখবেন বলে আমার বাড়িতে এতক্ষণ বসেছিলেন।

— তার মানে?

— দুটি তরুণী একজন এম. এ. বি. এল. আর একজন এম. এ. বি. টি. আপনাকে দেখবার জন্য প্রায় ৩ ঘণ্টা ধরে আমার এখানে অপেক্ষা করে বসেছিলেন। ওঁদের মধ্যে একজনের নাম বনলতা। তিনি বলেন— তাঁর পদবী সেন না হওয়া সত্ত্বেও আপনার বনলতা সেন কবিতার জন্যই তিনি তাঁর পাড়ার যুবক মহলে বনলতা সেন নামেই প্রসিদ্ধা।

— সত্যি? বলেই জীবনানন্দ তাঁর সেই নিজস্ব হাসিটি হাসতে লাগলেন।

আর একটি ঘটনা। তিনি তখন হাওড়া গার্লস কলেজে কিছুদিন হল কাজ করছেন। সেই সময় একদিন কলেজের অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার দেখা। আমাকে দেখেই বিজয়দা বলে উঠলেন— তুমি বেশ লোক দিয়েছ!

— কার কথা বলছেন বিজয়দা? জীবনানন্দ দাশের কথা?

— হ্যাঁ।

— কেন, কি হয়েছে?

— আরে ভাই, তুমি তো জান, আমার কলেজ এখনও তেমন বড় কলেজ নয়। কোনো সাব্জেক্টে অতিরিক্ত অধ্যাপক নেই। সেদিন জীবনানন্দবাবু করেছেন কি জান? থার্ড ইয়ারের ছাত্রীরা ক্লাসে বসে আছে, জীবনানন্দবাবু ক্লাস নেবেন বলে।

কিন্তু জীবনানন্দবাবুর আর দেখা নেই। তিনি কাকেও কিছু না বলেই কখন চলে গেছেন। তারপর ঐ যে গেলেন, একেবারে তিন দিন আর দেখা নেই। তিনদিন পরে যখন এলেন, জিজ্ঞাসা করলাম— কোথায় ছিলেন মশায়?— বললেন— আমি একবার দিল্লী গিয়েছিলাম।

বললাম— দিল্লী গেলেন তা বলে যাবেন তো! জানেন আমার কলেজে ক্লাস নেবার মতো অতিরিক্ত অধ্যাপক নেই।

এই কথা বলায় চুপ করে রইলেন, আর কোনো কথা বললেন না। দেখা হলে তুমি একটু বলে দিও তো ভাই। ভদ্রলোক পড়ান ভালই। আমি ভাবছি— ওঁকে কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল করব। কিন্তু ঐভাবে খাম খেয়ালী করলে কি করে চলবে বল তো?

আমি বললাম— আচ্ছা কালই দেখা করে বলব।

পরের দিন দেখা করে জীবনানন্দকে ঐকথা বললে তিনি বললেন— বলবেন, আর ও রকম হবে না।

এই বলে তিনি যেমন হাসতেন, তেমনি হাসতে লাগলেন।

জীবনানন্দকে যা দেখেছি, তাতে সচরাচর বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে আড্ডা দিতে বা কোথাও গল্পগুজব করতে যেতেন না, বলেই মনে হয়। কারণ, ছুটির দিনেই হোক, আর যেদিনেই হোক আমি যখনই তাঁর বাড়িতে গেছি, তাঁর দেখা পেয়েছি। তিনি বাড়িতে নেই— এমন কথা শুনে কোনোদিনই ফিরে আসতে হয়নি।

আমি তাঁর বাড়ির সামনে দরজার কাছে গিয়ে ডাক দিতাম— দাদা আছেন?

তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এসে, আসুন ব'লে তাঁর বসবার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাতেন।

জীবনানন্দের সংসারে দেখতাম— তাঁর স্ত্রী, এক কন্যা ও এক পুত্র। মনে হচ্ছে, একদিন যেন তিনি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন— আমার মেয়েটি বি. এ. পড়ে এবং ছেলে পড়ে ক্লাস টেনে।

আমরা যখন কথাবার্তা বলতাম, তখন তাঁর ছেলে মাঝে মাঝে ঐ ঘরে হয় বই নিতে, না হয় অন্য কোনো প্রয়োজনে এক এক বার আসত।

আমি জীবনানন্দ ছাড়া তাঁর বাড়ির কারও সঙ্গেই কথা বলতাম না। বলার প্রয়োজনও হত না।

তিন খানা ঘর নিয়ে তাঁর যে ফ্ল্যাট, ঐ ফ্ল্যাটের একেবারে পূর্ব দিকের ঘরটায় একজন মহিলাকে দেখতাম। তাঁকে দেখেও আমার কোন কৌতূহল হ'ত না যে উনি কে? আমি ভাবতাম, উনি হয়ত কবির সংসারেরই কেউ হবেন।

আমি যাই আসি। কিছুদিন পরে একদিন তিনি আমাকে বললেন— গোপালবাবু, আমি একটা বড় বিপদের মধ্যে আছি। কিছু উপকার করতে পারবেন? কলকাতার কত লোকের সঙ্গেই তো আপনার পরিচয়, দেখুন না যদি কিছু করতে পারেন।

— কি বিপদ দাদা?

— তবে খুলে সবই বলি শুনুন। আমার চাকরি-বাকরি নেই, অথচ এই রকম জায়গায় তিনখানা ঘরের একটা ফ্ল্যাট নিয়ে আছি, এই দেখে আমার এক ছাত্র একদিন আমায় বললে— 'স্যার, এখন তো আপনার তেমন আয় নেই, আর তিনখানা ঘর না হ'লেও আপনার চলে। তাই আপনি একখানা ঘর এক ভদ্রমহিলাকে ভাড়া দেবেন? তাঁর সঙ্গে আর কেউ থাকবে না, তিনি শুধু একা থাকবেন।' আমি ভাবলাম— একা একটি মেয়ে যদি থাকে, তাহলে তো কোনো ঝামেলাই থাকবে না। অথচ কিছু আর্থিক সাশ্রয়ও হবে, এই ভেবে ঐ পুবের দিকের ঘরটা তাঁকে ভাড়া দিলাম। উনি একাই থাকেন বটে, কিন্তু ওঁর কাছে সব সময়েই এত লোক আসে যায় যে সে এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। আর সব চেয়ে আপত্তিকর, রাত্রে ঐ ঘরে লোকজন নিয়ে গান বাজনা, হাসি-হল্লা ইত্যাদির কাণ্ড একেবারে অসহ্য। আমি মেয়েটিকে ঘর ছেড়ে দিয়ে চলে যেতে বলছি, তা উনি কিছুতেই যাচ্ছেন না। ওঁকে কি করে তোলা যায় বলতে পারেন?

— মহিলাটি কিছু কাজকর্ম করেন কী?

— শুনেছি, হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর একজন এজেণ্ট।

— আইনের সাহায্যে কোনো প্রকারে ওঁকে তোলা যায় কিনা আগে দেখা দরকার। আগমী রবিবার দিন সকালে আমি আপনার এখানে আসব। এসে আপনাকে নিয়ে আমার পরিচিত চাঁদমোহন চক্রবর্তী নামে এক প্রবীণ ও ভাল উকিলের কাছে নিয়ে যাব। চাঁদমোহনবাবু নিজেও একজন সাহিত্যিক মানুষ। তাঁর গল্পের বইটইও আছে। আশা করি, একজন কবির বিপদের কথা শুনে তিনি তাঁর যথাসাধ্য করবেন।

রবিবার সকালে জীবনানন্দকে সঙ্গে নিয়ে রসা রোড (পরে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড) ও প্রতাপাদিত্য রোডের সংযোগ স্থলের কাছে চাঁদমোহনবাবুর বাড়িতে গেলাম। তিনি সব কথা শুনে জীবনানন্দকে বললেন— আপনি সাবলেট করেছেন, আর ও যখন আপনাকে ভাড়া দেয়, তখন ওকে তোলা মুস্কিল। আপনি ওর কাছ থেকে ভাড়া না নিলে ও মণি অর্ডার করবে। আপনি মণি অর্ডারের টাকা না নিলে ও রেণ্ট কন্‌ট্রোলে জমা দেবে। তাই ও নিজে থেকে না ছেড়ে চলে গেলে ওকে তোলা দায়। তবে পাড়ার লোকজন দিয়ে ভয় দেখিয়ে যদি তুলতে পারেন। তা না হ'লে তোলা মুস্কিল।

ফিরে আসবার সময় ট্রামে উঠে জীবনানন্দ আমাকে বললেন— পাড়ায় তো কারও সঙ্গে আমার তেমন আলাপ নেই, আর থাকলেও তারা আমার হয়ে বলতেই বা যাবে কেন? আপনার তো বহু লোকের সঙ্গে আলাপ, এভাবে কি কিছু করতে পারবেন?

আমি বললাম— দাদা, আমি থাকি বৌবাজারে। আপনার পাড়ার দু এক জনের সঙ্গে ছাড়া কারও সঙ্গেই আমার তো আলাপ নেই। আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন। যেদিন কলেজে আপনার দেরিতে ক্লাস থাকবে, সেদিন কলেজ যাওয়ার পথে আমাদের

ভারতবর্ষ পত্রিকা অফিসে একবার আসুন। আমাদের কাগজের সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় একজন কংগ্রেসের এম. এল. এ.। কংগ্রেসেরই তো রাজত্ব! তাঁকে একবার বলে দেখি। পুলিশের সাহায্যে বা অন্য কোনো ভাবে যদি কিছু করতে পারেন।

— আমি কালই এগারোটা নাগাদ যাব।

রসা রোড ও রাসবিহারী এভিনিউ-এর মোড়ে ট্রাম এসে গেলে তিনি নেমে গেলেন। আমি আমার বাড়ির দিকে ফিরে এলাম।

পরের দিন ঠিক সময়েই জীবনানন্দ ভারতবর্ষ অফিসে এলেন। আমি ফণিদার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলাম। ফণিদা সব শুনে বললেন— চাঁদমোহনবাবু ঠিকই বলেছেন। ওকে তোলা যাবে বলে তো মনে হয় না। আর পুলিশও সহজে এ ব্যাপারে হাত দেবে না।

ফণিদার মুখেও এই কথা শুনে তিনি বেশ দমে গেলেন। আমাকে বললেন— তাহলে কি করা যায় গোপালবাবু? আমি বললাম— আচ্ছা, সাবিত্রীদাকে একবার বলে দেখি। সাবিত্রীদা অর্থাৎ কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় হিন্দুস্থান ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর পাব্‌লিসিটি অফিসার। ঐ মেয়েটিও তো ঐ অফিসের একজন এজেন্ট। সাবিত্রীদা যদি তাঁদের অফিসের উপরওয়ালাদের বলে আপোষে মেয়েটির চলে যাবার একটা ব্যবস্থা করতে পারেন।

— তাই বলুন, বলে তিনি চলে গেলেন।

চলে যাবার আগে তাঁর কাছ থেকে তাঁর ভাড়াটে মেয়েটির নামটা কেবল জেনে নিলাম।

এরপর একদিন সাবিত্রীদার সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সব কথা বললাম।

শুনে তিনি বললেন— ও মেয়েটাকে আমি চিনি। কিন্তু আমাদের অফিসের প্রায় সকল উপরওয়ালার সঙ্গেই ওর খুব খাতির। তাই ওর বিরুদ্ধে কিছু বললে, তাঁরা শুনবেনই না।

সাবিত্রীদার কাছ থেকেও কোনো সাহায্য পেলাম না।

একদিন গিয়ে জীবনানন্দকে সাবিত্রীদার কথাটা জানিয়ে এলাম। সেদিন তিনি আরও দমে গিয়ে বললেন— তাই তো, কি করি! বড় বিপদেই পড়েছি!

আমি বললাম— ওকে তুলবার জন্য আর কাকে ধরা যায় বা কি করা যায়, আবার একটু চিন্তা করে দেখি।

সাবিত্রীদার অক্ষমতার কথা বলে আসবার পর জীবনানন্দের বাড়ি অনেক দিন আর যেতে পারিনি। এই সময় একদিন, সেটা ছিল ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর (১৩৬১ সালের ৬ই কার্তিক) শনিবার। সকালে বাড়িতে খবরের কাগজ পড়বার সময় দেখি, ভিতরের পাতার এক জায়গায় জীবনানন্দের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। লেখা আছে, গত বৃহস্পতিবার দেশপ্রিয় পার্কের নিকটে ট্রামের ধাক্কায় তিনি গুরুতর ভাবে আহত হয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন এবং

শুক্রবার রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিটের সময় তাঁর মৃত্যু হয়।

খবর পড়েই আত্মীয় বিচ্ছেদের ন্যায় শোকাভিভূত হলাম। তখনই জীবনানন্দের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাবার জন্য বেরিয়ে পড়লাম।

জীবনানন্দের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে সেখানে তাঁর আত্মীয়দের মুখে শুনলাম— কাগজে আমি যে বৃহস্পতিবার আহত হওয়ার কথা পড়েছি, সেটা ২১শে অক্টোবর নয়, তার আগের বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ১৪ই অক্টোবর।

আমি যে-কাগজে জীবনানন্দের মৃত্যু সংবাদ পড়ি সেটা সবচেয়ে বিখ্যাত বাঙ্গলা দৈনিক পত্রিকা। জীবনানন্দের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশের আগে, তাঁর ট্রাম দুর্ঘটনার কোনো কথাই ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। দুর্ঘটনায় তাঁর পাঁজরা, কাঁধ ও উরুর হাড় ভেঙ্গে গিয়েছিল। ১৪ই অক্টোবর থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি মৃত্যুর সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে যে কদিন বেঁচেছিলেন, তারও কোনো সংবাদ ঐ কাগজে প্রকাশিত হয়নি। আমি তখন ঐ কাগজটাই শুধু পড়তাম। তাই জীবনানন্দের বাড়িতে ঐ সময় না যাওয়ায় তাঁর ঐ সময়কার কোনো সংবাদই জানতে পারিনি। যদি জানতে পারতাম, তাহলে নিশ্চয়ই হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যেতাম।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পরদিন সংবাদপত্র সমূহে তাঁর যে মৃত্যু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল, সে সবই ভিতরের পাতায়। আর বড় করেও তা প্রকাশিত হয়নি। তাঁর ঐ মৃত্যু সংবাদের সঙ্গে সেদিন তাঁর কোনো ফটোও কোনো কাগজে প্রকাশিত হয়নি। এমন কি সব কাগজেই তাঁর সম্বন্ধে কিছু কিছু ভুল সংবাদও তখন প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন— মৃত্যুকালে তিনি হাওড়ায় নরসিংহ দত্ত কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তিনি স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান এক কন্যা রেখে গেছেন।

এই কথাগুলো এখানে আমার বলার হেতু এই যে, আজ জীবনানন্দের যে খ্যাতি, কেন জানি না, তাঁর মৃত্যুর শুধু আগেই নয়, মৃত্যুর ক'দিন পর পর্যন্তও তাঁর কবি খ্যাতি দেশে তেমন প্রচারিত ছিল না।

তাঁর মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পর থেকে প্রকৃত পক্ষে তাঁর কবি-খ্যাতি যে কোনো কারণেই হোক ব্যাপকভাবে দেশে ছড়িয়ে পড়ে। এর আগে তাঁর খ্যাতি শুধু মুষ্টিমেয় আধুনিক কবি ও আধুনিক কবিতার সমর্থকদের গণ্ডী ছাড়িয়ে বেশি দূর এগোতে পারেনি। অর্থাৎ তখন তাঁর কবিতার পাঠক-পাঠিকার সংখ্যা ছিল নিতান্তই নগণ্য। তাঁর মৃত্যুর কদিন পর থেকে তাঁর অনুরাগীরা তো বটেই, এমন কি তাঁর কবিতার প্রতি যাঁরা বিরূপ ছিলেন, তাঁরাও তাঁর কবিতার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। যেমন, যে সজনীকান্ত দাস তাঁর *শনিবারের চিঠি*-তে দীর্ঘদিন ধরে জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করেছেন, তিনিও জীবনানন্দের মৃত্যুর পর *শনিবারের চিঠি*-তে লিখেছিলেন :

...এ কথা আজ স্বীকার করা কর্তব্য মনে করেতেছি যে রবীন্দ্রোত্তর কাব্য-সাহিত্যের তিনি অন্যতম গৌরব ছিলেন।....

উপসংহারে আর একটা কথা। জীবনানন্দের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে তাঁর সঙ্গে মিশে দেখেছি— তিনি একদিকে যেমন ছিলেন ধীর, স্থির, শান্ত ও স্বল্পবাক্, অপর দিকে তেমনি ছিলেন ব্যবহারে, আচার আচরণে ও মিষ্টভাষণে অতি ভদ্র। তাঁর আরও একটা বড় গুণ লক্ষ্য করেছিলাম যে, কেউ যদি তাঁর সামান্যও উপকার বা সাহায্য করতেন, তাহলে তিনি মুক্তকণ্ঠে তা স্বীকার করতেন।

আমার প্রসঙ্গেই বলি— হাওড়া গার্লস কলেজে তাঁর একটা কাজের জন্য আমি যখন ঘোরাঘুরি করছিলাম, সেই সময় জীবনানন্দ একদিন *একক* সম্পাদক কবি শুদ্ধসত্ত্ব বসুর কাছে বলেছিলেন— গোপাল রায় হাওড়া গার্লস কলেজে আমার একটা কাজের জন্য খুব চেষ্টা করছেন।[৪]

কে তাঁর কাজের জন্য কোথায় সামান্য একটু চেষ্টা করছে, এ কথা শুদ্ধসত্ত্ববাবুকে যেচে বলার কোনও প্রয়োজনই ছিল না। কিন্তু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাঁর যে স্বভাব, তাতে তিনি একথা বলবেনই। এইজন্যই বোধ করি, পরে তিনি আমাকেই একদিন বলেছিলেন— গোপালবাবু, আমি যখন আমার আত্মজীবনী লিখব[৫] তখন তাতে আপনার কথা বড় করে লিখব।

ঐ কথা শুনে আমি সেদিন বলেছিলাম— আমি আপনার জন্য কি আর এমন করেছি বা করছি দাদা, যে তার জন্য আমার কথা লিখতে হবে?

তিনি বলেছিলেন— সে আমি বুঝ্‌ব।

জীবনানন্দের হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তিনি তাঁর আত্মজীবনী আর লিখে যেতে পারেননি। আমিই এখন যা পেরেছি, তাঁর জীবনী লিখলাম এবং তাতে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের এই কাহিনীটিও দিলাম।[৬]

প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ

'প্রকৃতি'-এই শব্দটার ভিন্ন ভিন্ন নানা অর্থ আছে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর 'বাঙ্গলা অভিধান'-এ প্রকৃতি শব্দের ঊনত্রিশ রকমের অর্থ দিয়েছেন। যেমন— মেজাজ, মায়া, অবিদ্যা, দেবী, নারী, পূজা, ধাতু বা শব্দ মূল, সংস্কৃত ছন্দ বিশেষ, ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত, আত্মা, যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থ বা নিসর্গ প্রভৃতি।

কোনো কবিকে আমরা যখন 'প্রকৃতির কবি' বলে আখ্যা দিতে যাই, তখন এই 'প্রকৃতি' শব্দের যে আভিধানিক অর্থটা গ্রহণ করি, তা হল— ঈশ্বর সৃষ্ট সমুদয় পদার্থ বা নিসর্গ।

ঈশ্বর সৃষ্ট সমুদয় পদার্থ এই অর্থটা গ্রহণ করলেও আমরা কিন্তু প্রকৃতির কবি বলার সময়, 'প্রকৃতি' বলতে সাধারণত যা বুঝে থাকি তা হচ্ছে— এই পৃথিবীর ফুল ফল সমেত সমস্ত বৃক্ষ-লতা-তৃণ, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত, আলো, অন্ধকার, দিনরাত্রি, হাওয়া, আবহাওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য, পশুপাখি, কীট-পতঙ্গ ইত্যাদি। আর এই পৃথিবীর বাইরের সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, মেঘ, আকাশ, মহাকাশ প্রভৃতি।

প্রকৃতির কবি বলতে এই যে অর্থে প্রকৃতিকে আমরা বুঝে থাকি, প্রায় সকল কবিই তাঁদের কাব্যে এই প্রকৃতি সম্বন্ধে কম-বেশি কিছু না কিছু লিখেই থাকেন। তবে যে সব কবি তাঁদের কাব্যে সামাজিক কাহিনী এবং ঈশ্বর, ধর্ম, মোক্ষ, দর্শন ইত্যাদির কথা অপেক্ষা বহুল পরিমাণে প্রকৃতির কথাই, তা প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা প্রসঙ্গক্রমেই হোক লিখে থাকেন, আমরা তাঁদেরই বলি প্রকৃতির কবি।

আমাদের কবি জীবনানন্দ দাশও সেই হিসাবে বাংলা সাহিত্যের একজন প্রকৃত ও শ্রেষ্ঠ প্রকৃতির কবি। জীবনানন্দের কবিতায়— ঈশ্বর, ধর্ম, মোক্ষ ইত্যাদির কথা তেমন না থাকলেও, মানুষের প্রেম ভালবাসা, সুখ দুঃখ ও তাদের সমাজের কথা অনেক আছে। তবুও প্রকৃতির কথাই তাঁর কবিতায় বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই প্রকৃতির কথা কেবল তিনি নিছক প্রকৃতির সম্বন্ধে বলতে গিয়েই বলেননি, তিনি মানুষের প্রেম ভালবাসা, সুখ দুঃখ প্রভৃতির কথা বলতে গিয়েই বরং কখন 'প্রকৃতি' দিয়ে পরিবেশ সৃষ্টি করে, কখন বা 'প্রকৃতি' থেকে উপমা ইত্যাদি এনে তাঁর কবিতায় লিখে গেছেন।

উদ্ভিদ, আকাশ, বাতাস, নদী, সমুদ্র, পর্বত, মেঘ, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি প্রকৃতির এইসব অঙ্গ বা উপাদানকে জীবনানন্দ তাঁর কাব্যে কোথায় কিভাবে ব্যবহার

করেছেন, এখন তারই সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক—

প্রকৃতির বর্ণনায় জীবনানন্দের একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে, তিনি প্রসঙ্গতই হোক বা সাধারণভাবের বর্ণনাতেই হোক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছবি আঁকার মতো করে উপমা দিয়ে দিয়ে বর্ণনা করে গেছেন। আর তাঁর নিজস্ব বক্তব্য ও প্রকাশ ভঙ্গির জন্য সে সব বর্ণনা অভিনব এবং অনবদ্যও হয়ে উঠেছে।

প্রকৃতির একটা বড় অঙ্গ বা বিশেষ উপাদান হল উদ্ভিদ। উদ্ভিদ বলতে সাধারণত বড় বড় গাছকে বোঝালেও বিভিন্ন লতা এবং তৃণও উদ্ভিদেরই অন্তর্গত। জীবনানন্দ কত প্রসঙ্গে কত বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ, লতা ও তৃণের কথা যে তাঁর কবিতায় এনেছেন, তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। জীবনানন্দের কবিতায় ব্যবহৃত বা বর্ণিত বৃক্ষ, লতা ও তৃণের একটা তালিকা এখানে দিলাম :

> অশ্বত্থ, অর্জুন, আকন্দ, আতা, আঞ্জির, আম, আমলকী, আশশ্যাওড়া, উলুবন, কদম, করমচা, কলমী, কাশ, কাঁটাবাহার, কাঁঠাল, কৃষ্ণচূড়া, করবী, খেজুর, ক্ষিরপাই, গাব, গোধূম, ঘাস, চালতা, চাঁপা, চিনিচাঁপা, জাম, জামির, জামরুল, জারুল, জলপাই, পল্লব, ডুমুর, তাল, তমাল, তেঁতুল, তিত্তিরাজ, তুঁতের পল্লব, ধান, ধুন্দুল লতা, নাটা, নোনা, নিম, মহানিম, নাগেশ্বর, নারকেল, পাট, পিয়াশাল, পেঁপে, পরথুপী, ঘাস, পান, পিয়াল, পাম গাছ, পিপুল, ফলসা, ফণি মনসা, বট, বঁইচি, বাঁশ, বাবলা, বেলগাছ, বাসক লতা, বেত, বাতাবী, মাকাল লতা, মাদার, মুথো ঘাস, মধুকুপী ঘাস, শাল, সুপুরি, শ্যাওড়া, শটিবন, শেয়ালকাঁটা, শশালতা, শিরীষ, শিউলি, সুন্দরী, সজনে, হিঁজল, হেলেঞ্চা, হরীতকী গাছ, হোগলা— ইত্যাদি।

এগুলির মধ্যে হিজল, ঝাউ, বট, অশ্বত্থ, আমলকী প্রভৃতি কয়েকটা গাছের কথা তাঁর কবিতায় বেশি করে দেখা যায়।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালক*-এর 'চাঁদনী' কবিতায় সরো, মেহগিনি, টার্পিন তল, অলিভকুঞ্জ, মার্টিন লতা, উইলোর বন ও ইউতরু শাখা— এই কথাগুলোর উল্লেখ পাই। ইউতরু সম্ভবত ইউক্যালিপটাস, আর সরো মনে হয় সরল গাছ বা দেবদারু গাছ। জীবনানন্দের *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থে দীপ্তি কবিতায় 'গ্রীসের অলিভ বন' এর উল্লেখ আছে।

ঝরা পালক-এর কয়েকটি কবিতায়— কদম, খেজুর, ঝাউ, শিরীষ, আমলকী, পিয়াল প্রভৃতি গাছের কথা আছে, কিন্তু হিজল বট ও অশ্বত্থের উল্লেখ নেই, বেত-এরও কথা নেই। দারুচিনির উল্লেখ এক জায়গায় আছে। চাঁদনী কবিতায় এলাচি বনের কথা আছে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি গ্রন্থে তেমন গাছপালার কথা নেই। এই গ্রন্থের 'শকুন' কবিতায় পাম, 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় অশ্বত্থ, হিজল, বট ও সুপারি এবং 'ক্যাম্পে' কবিতায় সুন্দরী গাছের কথা আছে।

রূপসী বাংলা গ্রন্থে নানা গাছপালার কথা আছে প্রচুর।

রূপসী বাংলা-র পরেই *বনলতা সেন* গ্রন্থে অনেক গাছের কথা আছে। যেমন—*বনলতা সেন* গ্রন্থের 'আমাকে তুমি' কবিতায় :

ঝাউ হরীতকী শাল, নিভন্ত সূর্যে
পিয়াশাল, পিয়াল, আমলকী, দেবদারু—
বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহ, জীবনের ফেনা;

বনলতা সেন গ্রন্থে 'শিরীষের ডালপালা' নামে একটি কবিতাও আছে। এই বইয়ের 'অবশেষে' কবিতার এক জায়গায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু উঁচু গাছ।

জীবনানন্দ এখানে পৃথকভাবে কোনো গাছের নাম করেননি বটে, তবে একসঙ্গে কয়েকটা বড় বড় গাছের কথা বলেছেন। আর গাছগুলি যে মানুষ বা পশুপাখির মতো প্রশান্ত মনে খেলা করছে (সম্ভবত বাতাসে দুলে) তাও বলেছেন।

ড: সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন :

লক্ষ্য করিতে হইবে যে জীবনানন্দের কবিতায় ফুল নেই।

সুকুমারবাবু এই কথা বলে এ প্রসঙ্গে পাদটীকায় লিখেছেন :

ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরে মাঝে মাঝে কবি চিত্তের কুয়াশা কাটিবার উপক্রম হইয়াছিল। এই সময়ের দৈবাৎ কোনো কবিতায় ফুল দেখা দিয়াছে। যেমন, সবচেয়ে আকাশ নক্ষত্র ঘাস চন্দ্রমল্লিকার রাত্রি ভালো—

'সুদর্শনা', *বনলতা সেন*

সুকুমারবাবুর একথা সত্য নয়। কেন না, তিনি তাঁর গ্রন্থে যেখানে একথা লিখেছেন, তার দুপাতা আগেই জীবনানন্দের প্রথম যুগের কবিতা বলে *প্রবাসী*-তে প্রকাশিত 'পলাতক' নামক যে কবিতাটি উদ্ধৃত করেছেন, সেই কবিতাতেই তো এক জায়গায় জবা ফুলের কথা আছে, (সুকুমারবাবু এখানে ভুল করে 'পলাতক' বলেছেন, কবিতাটির নাম পলাতকা)।

জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি-র* আগের গ্রন্থ *ঝরা পালক*-এ তো অনেক রকম ফুলের উল্লেখ আছে। যেমন :

অতসী, অশোক, আমের কুঁড়ি, করবী, কাশ, কামিনী, কেয়া, চাঁপা, চন্দ্রমল্লিকা, গোলাপ, পলাশ, মাধবী, মধুমালতী, মোতিয়া, নার্গিশ, লালা, শেফালী প্রভৃতি। এছাড়া আছে আপেল ফুল ও ডালিম ফুল। আর আছে বাবলা ফুল ও বনফুল।

ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে আছে সাদাপদ্ম, নারকেল ফুল, ক্যানা ফুল ও শেফালী ফুলের কথা। আর কয়েক জায়গায় কোনো ফুলের নাম উল্লেখ নেই, শুধু আছে, ঝরা ফুল, রাতের ফুল, ঘুমন্ত ফুল, ফুলে ফুলের আঘাত।

বনলতা সেন-এ আছে, চন্দ্রমল্লিকা, নীলচে ঘাসের ফুল। *মহাপৃথিবী*-র 'পরিচায়ক' কবিতায় আছে— কেয়া ফুল। *রূপসী বাংলা*-য় আছে, চালতা ফুল, দ্রোণ ফুল, সুপারি ফুল, ভেরেণ্ডা ফুল ইত্যাদি।

জীবনানন্দের 'রজনীগন্ধা' নামে একটি কবিতা আছে। এ ছাড়া তাঁর 'কোনো ব্যথিতাকে' কবিতায় রজনীগন্ধার কথা আছে। এই কবিতা দুটি যথাক্রমে ১৩৬৫ সালের চৈত্র সংখ্যা *কবিতা* পত্রিকায় এবং ১৩৬৪ সালের ২৫শে মাঘ তারিখের *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

১৩৬২ সালের চৈত্র সংখ্যা *কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত শিরোনামহীন একটি কবিতায় এবং ১৩৬১ সালের শারদীয় *উষা* পত্রিকায় প্রকাশিত 'জর্নাল-১৩৪২' কবিতায় শেফালী ফুলের কথা আছে। এই জর্নাল-১৩৪২ কবিতাতেই 'পদ্ম'র উল্লেখ আছে। *ময়ূখ* জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যায় (১৩৬১-৬২) প্রকাশিত একটি নামহীন কবিতায় কমলার ফুল, ১৩৬২ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যা *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় প্রকাশিত সুন্দরবনের গল্প কবিতায় কাঞ্চনফুল, ১৩৬২ সালের চৈত্র সংখ্যা *কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত নামহীন একটি কবিতায় পেঁপে ফুল, ১৩৬৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা *কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত 'নির্জন হাঁসের ছবি' কবিতায় লেবু ফুলের, আর ১৩৫৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা *দিগন্ত* পত্রিকায় প্রকাশিত 'রাত্রি ও ভোর' কবিতায় 'যূথিকা' ফুলের উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৩৬৪ সালের আষাঢ় মাসের *কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত 'চিঠি এল' কবিতায় গোলাপের বাগানের কথা আছে।

যাই হোক্, তবে একথা ঠিক যে জীবনানন্দের কবিতায় ফুলের কথা কিছুটা কমই আছে, জীবনানন্দের *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থে ফুল একরূপ নেইই। এই গ্রন্থের ৩৫টি কবিতার মধ্যে 'বিভিন্ন কোরাস' কবিতায় একবার একটা পংক্তিতে রোদের কথা বলতে গিয়ে পারুলের কথা বলেছেন। সেখানে লিখেছেন :

ওরা এলে সহসা রোদের পথে অনন্ত পারুলে

এই গ্রন্থের 'ভাষিত' কবিতায় একবার 'আকাশ কুসুম' কথাটা আছে। আর 'জনান্তিকে' কবিতায় শুধু 'বকুলের বনে' কথাটা আছে কিন্তু বকুল ফুলের কথা নেই।

জীবনানন্দের *শ্রেষ্ঠ কবিতা* গ্রন্থে তাঁর আগের প্রকাশিত গ্রন্থগুলি থেকে নির্বাচিত কবিতা ছাড়া, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত তাঁর কিছু কবিতা স্থান পেয়েছে। এই পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতাগুলিতে তেমন ফুলের কথা নেই। 'মনোকণিকা' কবিতায় করবী ফুলের এবং 'এই সব দিনরাত্রি' কবিতায় রজনীগন্ধার উল্লেখ পাওয়া যায়।

জীবনানন্দের *বেলা অবেলা কালবেলা* গ্রন্থে দেখেছি 'নারী সবিতা' কবিতাটিতে মৃণাল কাঁটা ও সাদা রঙের সরোজিনীর কথা আছে। এছাড়া এই বই-এর 'মহিলা' কবিতায় কোনো ফুলের নাম নেই বটে, শুধু আছে— চুলের ভিতরে উঁচু পাহাড়ের কুসুম বাতাস।

জীবনানন্দের কবিতায় যে পরিমাণে গাছপালা ও জীবজন্তুর কথা আছে, সে তুলনায় ফুলের উল্লেখ কিছু কমই।

আর একটা কথা, জীবনানন্দের কবিতায় ফুল নিয়ে যদিও বা কিছু আছে, সে তুলনায় ফল নিয়ে তেমন বেশি উল্লেখ নেই। যা আছে, তা হ'ল— দ্রাক্ষা, নাসপাতি, নোনা, নাটাফল, জামরুল, কয়েত, সিঙ্গাড়া ফল, জলপাই, ঝাউফল, বটফল, বেতের ফল, হরীতকী, আমলকী, তরমুজ, বাতাবী লেবু, কমলালেবু, দাড়িম্ব এই ধরনের মাত্র কিছু ফলের উল্লেখ।

প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ তাঁর বহু কবিতায় নানা প্রসঙ্গেই নানাভাবে বৃক্ষ, লতা ও তৃণের কথা বললেও, ঘাস এই তৃণর কথা যেন তিনি বিশেষভাবে লিখে গেছেন। ঘাস নামে তিনি একাধিক কবিতাও লিখেছেন। নানা নামের ঘাস আর ঘাসের কথা নিয়ে কত ভাবেই না কত কথা লিখেছেন, এখানে তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি।

১. *পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে;*

'রূপসী বাংলা'

২. *একদিন এই দেহ ঘাস থেকে ধানের আঘ্রাণ থেকে এই বাংলায় জন্মেছিল;*

ঐ

৩. *ঘাসের বুকের থেকে কবে আমি পেয়েছি যে আমার শরীর*

ঐ

৪. *এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে— সব চেয়ে সুন্দর করুণ*
সেখানে সবুজ ডাঙা ভরে আছে মধুকূপী ঘাসে অবিরল।

ঐ

৫. *...এ জীবন কবে যেন মাঠে মাঠে ঘাস হয়ে রবে*
নীল আকাশের নিচে অঘ্রাণের ভোরে এক

'এই শান্তি', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*

৬. *এই ঘাসের শরীর ছানি— চোখে ঘষি*

'ঘাসের পাখনায় আমার পালক'

ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোন এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরে সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

'ঘাস', *বনলতা সেন*

৭. *রয়েছি সবুজ মাঠে— ঘাসে*

আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে

'নির্জন স্বাক্ষর', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*

৮. জীবনানন্দ তাঁর একটি প্রেমের কবিতায় লিখেছেন :

তোমাকে ভাল বাসিয়াছি, তাই অন্ধকারে আমি
ঘাসের গন্ধ পাই।

৯. আর জীবনানন্দ তাঁর *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থের 'আকাশলীনা' কবিতায় লিখেছেন :

তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।
সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :

বন্য পশু, পাখি এবং কীট-পতঙ্গ, যাদের আমরা প্রকৃতির মধ্যে ধরে থাকি, তারাও জীবনানন্দের কাব্যে, অনেক ক্ষেত্রেই জীবনানন্দীয় পদ্ধতিতেই দেখা দিয়েছে। জীবনানন্দের কবিতায় ব্যবহৃত পশু, পাখি, ও কীট-পতঙ্গের একটা করে তালিকা এখানে দিলাম।

কয়েকটি পশু :

বাঘ, বাঘিনী, চিতা, চিতা বাঘিনী, সিংহ, সজারু, হরিণ, বাদামী হরিণ, হরিণী, চিতল হরিণী, ঘাই হরিণী, শম্বর মৃগ, হাতি, বানর, বানরী, বেড়াল, ছাগল, কুকুর, শূকর, শূকরী, গাভী, নীলগাই, শেয়াল, ঘোড়া, কুকুর প্রভৃতি।

জীবনানন্দের কবিতায় বহু রকমের পাখির উল্লেখ দেখা যায় :

কাক, দাঁড়কাক, পেঁচা, লক্ষ্মী পেঁচা, নিম পেঁচা, নিম পাখি, হলুদ পাখি, চিল, শঙ্খচিল, সোনালী চিল, সমুদ্রচিল, চকোর, চকোরী, মরাল, মরালী, শ্যামা, খঞ্জনা, ফিঙ্গা, শালিখ, গাঙ শালিখ, ঘুঘু, বউ কথা কও, কোরাল, কোরালি, বাদুড়, ময়ূর, কোকিল, টিয়া, কাকাতুয়া, পায়রা, বক, মনিয়া, মাছরাঙা, হাঁস, বুনোহাঁস, রাজহাঁস, চড়ুই, শকুন, হরিয়াল, ভোরাই, সিন্ধু সারস, সুদর্শন, সুপর্ণ, দোয়েল, নীলকণ্ঠ, জলপিপি, বাদুড়, চামচিকা, গৃধিনী প্রভৃতি।

এইরূপ অসংখ্য দেশীয় বা দেশজ পাখির কথা আমরা যেমন তাঁর কবিতায় পাই, তেমনি কে, ডো ডো, মুনিয়া প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী পাখির নামও আমরা তাঁর কবিতায় পাই। আবার মেরু সাগরের পাখি, সাগরের বড় সাদা পাখি, সিন্ধু পাখি বলে কয়েকটি নাম-না-জানা পাখিরও উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির মধ্যে পাখি ও পাখিরা নামে দুটি কবিতাও আছে। এছাড়া পাখির নাম নিয়ে হাঁস, সিন্ধুসারস ও শকুন নামেও আর ৩টি কবিতা আছে। বুনোহাঁস, পায়রা, দোয়েল, সমুদ্র পায়রা নামেও কবিতা আছে। আর আছে 'হায় চিল' কবিতা।

জীবনানন্দের কবিতায় উল্লেখিত কীট-পতঙ্গগুলিরও একটা তালিকা দেওয়া যেতে পারে। সেগুলি হল .

মাছি, মৌমাছি, প্রজাপতি, জোনাকি, পঙ্গপাল, কীটপোকা, দেযালী পোকা, শ্যামা পোকা, ফড়িং, গঙ্গা ফড়িং, ঘাস ফড়িং, বোলতা, ঝিঁ ঝিঁ পোকা, বৃশ্চিক, চামচিকা, আবশোলা, মাকড়সা ইত্যাদি।

আমাদের দেশের প্রকৃতিতে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত ও বসন্ত— এই ছটি ঋতু থাকলেও আমাদের কবিরা বেশি লিখেছেন বোধ করি বর্ষা নিয়েই। ভারতের দুই শ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস ও রবীন্দ্রনাথ অনেকের কাছে বর্ষার কবি বলেও খ্যাত। বর্ষা, মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কত সব সুন্দর ও সার্থক কবিতা রচনা করেছেন। কালিদাস আষাঢ়ের মেঘ নিয়ে তাঁর বিশ্ব-বিখ্যাত বিরহ-কাব্য *মেঘদূত* রচনা করেছেন। বিখ্যাত বৈষ্ণব-কবি বিদ্যাপতি 'এ ভরা বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর' বলে বিরহের অপূর্ব পদ রচনা করে গেছেন।

প্রকৃতির এই ঋতু নিয়ে লিখতে গিয়ে জীবনানন্দ অন্য কবিদের পথে না গিয়ে তাঁদের উপেক্ষিত হেমন্ত ও শীত ঋতুর, বিশেষ করে হেমন্তের কথাই বেশি করে বলেছেন। এজন্য তিনি অনেকের কাছে হেমন্তের কবি নামেই খ্যাত।

জীবনানন্দের কবিতায় হেমন্ত বা হেমন্তের মাস কার্তিক-অগ্রহায়ণের কথা বেশি থাকলেও, তিনি খুব কম হলেও মাঝে মাঝে অন্য ঋতু এবং ঋতুর মাসের কথাও তাঁর কোনো কোনো কবিতায় বলেছেন। যেমন, তিনি তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতায় বসন্তের রাতে, বসন্তের জ্যোৎস্নায়, চৈত্রের বাতাস, এ কথাগুলো বলেছেন।

জীবনানন্দের *বনলতা সেন* গ্রন্থে 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' নামে একটি কবিতা আছে। এই গ্রন্থের 'দুজন' কবিতায়, *মহাপৃথিবী*-র 'জার্নাল— ১৩৪২' কবিতায় অন্যত্র 'প্রথম এ পৃথিবীর' কবিতায় 'অঘ্রাণ প্রান্তরে'র কথা আছে। এছাড়া তাঁর 'কার্তিকের কুয়াশায়', 'কার্তিক-অঘ্রাণ' নামে কবিতাও আছে। কার্তিক-অঘ্রাণের ন্যায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ বা অন্য ঋতুর কোনো মাসের নাম নিয়ে তাঁর কোনো কবিতা নেই।

জীবনানন্দ তাঁর *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থের 'স্বভাব' কবিতায় লিখেছেন :

এতদিন পরে সেই সব ফিরে পেতে
সময়ের কাছে যদি করি সুপারিশ
তাহলে সে স্মৃতি দেবে সহিষ্ণু আলোয়
দু-একটি হেমন্তের রাত্রির প্রথম প্রহরে;

হেমন্তের প্রতি জীবনানন্দের বিশেষ টান ছিল বলেই, তিনি এ ধরনের কথা লিখেছেন।

ধূসর পাণ্ডুলিপি গ্রন্থের 'এই ক্রান্তি' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

....এ জীবন কবে যেন মাঠে মাঠে ঘাস হয়ে রবে
নীল আকাশের নীচে অঘ্রাণের ভোরে এক।

এখানেও জীবনানন্দের সেই ঘাস ও অঘ্রাণ বা হেমন্ত-এর প্রতি টান।

কার্তিক ও অগ্রহায়ণ এই দু মাস নিয়ে হেমন্ত ঋতু। মানুষের প্রধান প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং বহু মনুষ্যেতর জীবজন্তুরও খাদ্য যে ধান বা চাল, তার বেশি অংশটাই উৎপন্ন হয়, এই হেমন্তে। ধান ছাড়া নানা শীতকালীন তরিতরকারী, ফুল, ফলও উৎপন্ন হতে আরম্ভ করে এই হেমন্তেই অর্থাৎ শীতের শুরুতেই।

ধানের দেবী লক্ষ্মী এবং লক্ষ্মীর বাহন হল পেঁচা। জীবনানন্দের বহু কবিতায় লক্ষ্মী, বিশেষ করে তাঁর বাহন পেঁচার কথা আছে। হেমন্তে ধানের কথার স্মরণে লক্ষ্মী এবং তাঁর বাহন পেঁচার কথা জীবনানন্দের মনে আসা স্বাভাবিক। এই ধানের কথাতেই সম্ভবত আর একটা তুচ্ছ প্রাণীর কথা তাঁর মনে এসেছিল। সে প্রাণীটি হল— ইঁদুর। ইঁদুর ক্ষেতের পাকা ধানের শীষ কেটে নিয়ে সেই মাঠেই নিজ গর্তে কিভাবে সঞ্চয় করে চাষীরা তা ভালভাবেই জানেন। সম্ভবত জীবনানন্দও তা জানতেন।

জীবনানন্দের অসংখ্য কবিতায় যে শিশির ও কুয়াশার কথা আছে, সেই শিশির ও কুয়াশার শুরু এই হেমন্তেই।

প্রধান ও বহু ফসলের ঋতু এই হেমন্তে ধান ও অন্যান্য ফসল কিরূপ ফলে, আর তখন সে সব দেখে সকলের মতো জীবনানন্দেরও চোখের ক্ষুধা কিরূপ মেটে, কান স্নিগ্ধ হয় এবং আরও কত ভাল লাগে, তিনি তা তাঁর *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থের 'অবসরের গান' কবিতায় অতি সুন্দরভাবে বর্ণনা করে গেছেন। এখানে ঐ কবিতা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

চারি দিকে নুয়ে প'ড়ে ফলেছে ফসল
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল!
প্রচুর শস্যের গন্ধ থেকে থেকে আসিতেছে ভেসে
পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণে ভরা আমাদের ভাঁড়ারের দেশে।

চারিদিকে ছায়া— রোদ— ক্ষুদ— কুঁড়া— কার্তিকের ভিড়;
চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ!

হেমন্তে যেমন আমাদের প্রধান ফসল ধান পাকে, তেমনি এই হেমন্তেই বহু ক্ষেতের ধানও কাটা হয়ে যায়। তাই হেমন্তের কবি জীবনানন্দের অনেক কবিতায় ধানকাটা মাঠের কথাও দেখা যায়।

একটা কথা, জীবনানন্দের কবিতায় এই যে ধানকাটা মাঠ, শিশির, ইঁদুর প্রভৃতির কথা বলছি, জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় কোথাও নিছক হেমন্তের কথা বলতে গিয়ে

এ সবের উল্লেখ করেননি। তিনি বিভিন্ন ক্ষেত্রে, কখন হেমন্তের প্রসঙ্গে, কখনও অমনিও এ সবের উল্লেখ করেছেন। আবার কার্তিক-অঘ্রাণ, অঘ্রাণ, হেমন্ত, ধানকাটা হয়ে গেছে প্রভৃতি নামে তিনি যেসব কবিতা লিখেছেন, সেইসব ক্ষেত্রেও তিনি শুধু হেমন্তের কথা না বলে, কবিতার শিরোনাম ছেড়ে কবিতার মধ্যে অন্য প্রসঙ্গেও চলে গেছেন।

জীবনানন্দ তাঁর অসংখ্য কবিতায় একদিকে যেমন নানা প্রকারের বৃক্ষ, লতা, তৃণ, পশু, পাখির কথা লিখেছেন, তেমনি আবার প্রকৃতির সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, রৌদ্র, আলো, অন্ধকার, আকাশ, বাতাস, নদী, সমুদ্র, পর্বত প্রভৃতির কথাও কখন উপমায়, কখন বা স্বাভাবিক বর্ণনায় কত ভাবেই না তাঁর নিজস্ব বক্তব্যের ভঙ্গিমায় বলে গেছেন। এখানে তার কিছু কিছু উদাহরণ দিচ্ছি :

১. *সোনার বলের মতো সূর্য আর*
রুপোর ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ

২. *নীল আকাশের খই ক্ষেতের অজস্র ফুলের অজস্র তারা*

৩. *বার বার রোদ তার চিকণ সোনালী চুল*
কাঁঠাল জামের বুকে নিঙড়ায়—

৪. *হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিতেছে খেলা*

৫. *লালচে হলদে পাতা অনুষঙ্গে জাম বট অশ্বত্থের শাখার ভিতরে*
অন্ধকার নড়ে চড়ে ঘাসের উপর ঝরে পড়ে।

৬. *জ্যোৎস্না রাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার*
শালের মতো ঝলমল করছিল বিশাল আকাশ

৭. *সান্ত্বনার মত এসে বাতাসের হাত*
অশ্বত্থের বুক থেকে নিভিয়ে ফেলেছে খাড়া সূর্যের আঘাত।

৮. *দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী*
ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার,

৯. *...নক্ষত্রেব তলে*
অনেক চলার পথ, সমুদ্রের জলে
গানের অনেক সুর— গানের অনেক সুর বাজে;

১০. *নীল দারুচিনি বাঘিনী*
অন্ধকার রাত্রি ঘিরে
নিরাকুল সমুদ্রের মত
পাহাড়ের গুহায় গুহায় আবেগে স্ফীত হয়ে উঠছে।

১১. *ছেঁড়া ছেঁড়া শাদা মেঘ ভয় পেয়ে গেছে সব চলে*
তরাসে ছেলের মত।

জীবনানন্দ তাঁর অসংখ্য কবিতায় এই সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, মেঘ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা ভাবে কথা লিখে গেছেন। এদের এক একটা প্রসঙ্গেও আবার কত কথা লিখেছেন। যেমন, মেঘ নিয়ে লেখা :

১. ভোরের মেঘের ঢেউয়ে মুছে দিয়ে রাতের মেঘের কালো রেখা,
অনেক আকাশ

২. ভিজে হয়ে আসে মেঘ এ দুপুরে
রূপসী বাংলা

৩. কামরাঙা লাল মেঘ
ঐ

৪. শিয়রে বৈশাখ মেঘ
ঐ

৫ মৌশুমী মেঘ
মানুষ চারিয়ে

৬. স্নিগ্ধ একখানা মেঘ
নবহরিতের গান

৭. আষাঢ়ের দুপ্রহরে বাদলের কোলাহলে মেঘের ছায়া
রূপসী বাংলা

৮. ইন্দ্রধনুক নিবিড় মেঘের কূলে
বেদিয়া

৯. জলভরা নত মেঘ
মরুতৃণোজ্জ্বল

জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি হয়েও, প্রকৃতির সবটাই নিখুঁত ও নিছক ভাল, তা কিন্তু তিনি কখনোই বলেননি। প্রকৃতির মধ্যে যে কখন কখন কিছু আবিলতা দেখা দেয়, সেকথা তিনি তাঁর 'এইখানে সূর্যের' নামক কবিতায় বলে গেছেন। তিনি লিখেছেন :

প্রকৃতির আবিল কিছু, তবু মানুষের
প্রয়োজন মতো তাতে নির্মলতা আছে।

আবিল প্রকৃতি বা প্রকৃতির মধ্যেকার আবিলতাকে উদাহরণ হিসাবে খরা, বন্যা, প্লাবন, ভূমিকম্প ইত্যাদি বলা যেতে পারে। কিন্তু জীবনানন্দ বলেছেন, 'প্রকৃতির মধ্যে এই সাময়িক কিছু আবিলতা থাকলেও মানুষের প্রয়োজন মতো নির্মলতা অর্থাৎ মানুষের প্রয়োজনীয় উপাদানও আছে।'

প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ মানুষকে প্রকৃতি-মুখী করার জন্য লিখেছেন :

ঐখানে সারাদিন উঁচু ঝাউবন খেলা করে
হলদে সবুজ নীল রং তার বুকে:
পাখি মেঘ রৌদ্রের
তবু আজো হৃদয়ের গভীর অসুখে
মানবেরা পড়ে আছে কেন?

ময়ূখ, জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৬১-৬২

তিনি বলতে চেয়েছেন— মানুষ তার হৃদয়ের অশান্তি বা হৃদয়ের গভীর অসুখ দূর করতে পারে প্রকৃতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েই বা প্রকৃতিকে ভালবেসেই। তিনি আরও বলেছেন— মানুষ প্রকৃতিকে ভালবাসলে তার শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও অন্য এক শান্তি পাবে।

জীবনানন্দ তাঁর 'আলোপৃথিবী' কবিতায় তাই লিখেছেন :

আমাদের পৃথিবীর বনঝিরি জলঝিরি নদী
হিজল বাতাবী নিম বাবলায় সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন; হৃদয়কে সেখানে করে না অবহেলা
ফেনিল বুদ্ধির দৌড় ;— আজকের মানবের নিঃসঙ্গতা যদি

সে সব শ্যামল নীল বিস্তারিত পথে
হ'তে চায় অন্য কোনো আলো কোনো মর্মের সন্ধানী,
মানুষের মন থেকে কাটবে না তাহলে যদিও সব গ্লানি
তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে।

আমাদের পৃথিবীর পাখলী ও নীলডানা নদী
আমলকী জামরুল বাঁশ ঝাউয়ে সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন ; হৃদয়কে সেখানে করে না অবহেলা
বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন শক্তি,— শতকের ম্লান চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি

নরনারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে—
অশ্রু রক্ত নিষ্ফলতা মরণের খণ্ড খণ্ড গ্লানি
তাহ'লেও রবে ; তবু, আদি ব্যথা হবে কল্যাণী
জীবনের নব নব জলধারা— উজ্জ্বল জগতে।

এই হ'ল প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ।

বর্ণ গন্ধের কবি জীবনানন্দ

জীবনানন্দের কবিতা পড়তে গেলে অনেক জিনিসের মতো, আরও দুটি জিনিস বেশ চোখে পড়ে। সে দুটি হ'ল— ১. বর্ণ অর্থাৎ নানা রকমের রং-এর কথা, ২. গন্ধ-র কথা। এখানে এই অধ্যায়ে প্রথমে জীবনানন্দের কবিতায় বর্ণ বা রং-এর কথা নিয়ে, পরে গন্ধর কথা নিয়ে আলোচনা করছি—

শাদা, কালো, লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, ধূসর প্রভৃতি রং-এর কথা তিনি তাঁর বহু কবিতায় বহু ভাবে ব্যবহার করে গেছেন।

জীবনানন্দ যেমন তাঁর কাব্যে হেমন্ত ও শীতের কথা, বিশেষ করে হেমন্তের কথা বলায় তাঁকে অনেকে হেমন্তের কবি বলেন, তেমনি তাঁর অসংখ্য কবিতায় ধূসর শব্দের ব্যবহারের জন্য তাঁকে কেউ কেউ ধূসরতার কবিও বলে থাকেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর *কল্লোল যুগ* গ্রন্থে এ সম্পর্কে তো লিখেই গেছেন :

> তীব্র আলো, স্পষ্ট বাক্য বা প্রখর রাগ রঞ্জন— এ সবের মধ্যে সে (জীবনানন্দ) নেই। সে ধূসরতার কবি। চির প্রদোষ দেশের এক বাসিন্দা।

জীবনানন্দ নিজেও একবার এ নিয়ে একজনকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন :

> আমার কাব্য-প্রেরণার উৎস নিরবধিকাল ও ধূসর প্রকৃতির চেতনার ভিতর রয়েছে বলেই তো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সব সময়েই যে ধূসর তা হয়তো নয়।

জীবনানন্দের একটা কবিতার বই-এর নাম *ধূসর পাণ্ডুলিপি* হওয়ায় তাঁকে ধূসরতার কবি বলার পক্ষে কারও কারও এ যুক্তিটি হয়ত একটু জোর পেয়েছে। কিন্তু তা ঠিক নয়। কেন না, জীবনানন্দ যে তাঁর বই-এর নাম *ধূসর পাণ্ডুলিপি* রেখেছেন, সে তো বহু দিন থেকে কবিতার বই প্রকাশ করবেন, আশা ক'রে ক'রে বই-এর পাণ্ডুলিপি ধূসর বর্ণের হয়ে এসেছিল বলেই, এ বই এর নাম *ধূসর পাণ্ডুলিপি* দিয়েছিলেন। এ কথা তিনি ঐ বই-এর ভূমিকায় বলে গেছেন।

জীবনানন্দ এ কথা বলে গেলেও যাঁরা তাঁকে ধূসরতার কবি বলেন, তাঁরা হয়ত বলবেন, পাণ্ডুলিপি প'ড়ে থেকে থেকে ধূসর বর্ণের হয়েছে বলেই কি ঐ নাম দিতে হবে? অন্য নামও তিনি দিতে পারতেন। আসলে 'ধূসর'-এর প্রতি তাঁর একটা টানের জন্যই তিনি বই-এর ঐ নাম দিয়েছিলেন।

যাই হোক, তবে একথাও ঠিক যে জীবনানন্দ তাঁর অনেক কবিতায় ধূসর বর্ণের উল্লেখ করে গেছেন। এখানে কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি—

১. *পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রের ভিতর দেখেছি আমি।*

'হাওযাব বাত', *বনলতা সেন*

২ *পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে—*

'বুনো হাঁস', *বনলতা সেন*

৩. *সেই নগরীর এক ধূসর প্রাসাদের রূপ জাগে হৃদয়ে।*

'নগ্ননির্জন হাত', *বনলতা সেন*

৪. *বিলুপ্ত ধূসর কোন্ পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,*

হরিণেরা', *বনলতা সেন*

৫. *ধূসব বাতাস খেয়ে এক গাল— রাস্তার পাশে*
ধূসর বাতাস দিয়ে ক'রে নিলো মুখ আচমন।

'লঘু মুহূর্ত', *সাতটি তারার তিমিব*

৬. *...ধূসর বকের সাথে ঘরে চলে আসে অন্ধকার*
বাংলার,...

'রূপসী বাংলা'

৭. *...বনে বনে ডালপালা উড়িতেছে— যেন পরীজিন্*
কথা কয় : ধূসর সন্ধ্যায় আমি ইহাদের শরীরের' পর
খইযের ধানের মতো দেখিয়াছি ঝরে ঝর্ ঝর্
দু ফোঁটা মাঘের বৃষ্টি..

রূপসী বাংলা'

৮. *নেউল ধূসর নদী আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয় ;*

'আবহমান', *মহাপৃথিবী*

৯. *যে-সব ধূসর হাসি, গল্প, প্রেম, মুখরেখা*
পৃথিবীর পাথরে কংকালে অন্ধকারে মিশেছিলো
ধীরে ধীরে জেগে ওঠে তারা;

'শ্রাবণ রাত', *মহাপৃথিবী*

জীবনানন্দ তাঁর বহু কবিতায় ধূসর বর্ণের উল্লেখ করলেও তিনি তাঁর অসংখ্য কবিতায় কখনো উপমায়, কখনো প্রসঙ্গত, কখনো বা এমনিতেই নানা রং-এর বা বর্ণের উল্লেখ করে গেছেন। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত কয়েকটি বর্ণ বা রং-এর নাম হল :

শাদা, কালো, ছিট্ কালো, পাটকিলে, বাদামী, পাণ্ডুর, ধূসর, খয়েরি, ফ্যাকাশে বেগুনী, নীল, নীলাভ, সবুজ, হলুদ, লাল, জাফরান, সোনালী, কমলা রং, মেরুণ, রুপালী ইত্যাদি।

জীবনানন্দ এই রংগুলোর কথা কোথায় কোন্ কবিতায় কিভাবে ব্যবহার করেছেন, সে সব অজস্র উদাহরণের মধ্য থেকে এখানে উপরোক্ত প্রত্যেকটি রং-এর কথায় মাত্র একটা করে উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছি :

১. *সারাদিন এঁকেবেঁকে নদীটির ঢেউ*
মিশে যায় শাদা কালো রঙের সাগরে

'দুটি তুরঙ্গম' *দেশ* ; ২১ কার্তিক ১৩৬০

২. *শাদা শাদাছিট কালো পায়রার ওড়া উড়ি জ্যোৎস্নায়-ছায়ায়,*

'আমাকে তুমি', *বনলতা সেন*

৩. *দুপুর বেলায় জনবিরল গভীর বাতাস*
দূর শূন্যে চিলের পাটকিলে ডানার ভিতর অস্পষ্ট হয়ে হারিয়ে যায়;

'আমাকে তুমি', *বনলতা সেন*

৪. *গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণ পাতা উড়ে গেছে,*

'পথ হাঁটা', *বনলতা সেন*

৫. *তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া*
গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে।

'অন্ধকার', বনলতা সেন

৬. *একটা ধবল চিতল হরিণীর ছায়া*
আতার ধূসর ক্ষীরে-গড়া মূর্তির মতো
নদীর জলে
সমস্ত বিকেলবেলা ধরে
স্থির।

'আমাকে তুমি', *বনলতা সেন*

৭. *হেমন্ত আসিয়া গেছে ; চিলের সোনালী ডানা হয়েছে খয়েরি*
দুজন

বনলতা সেন

৮. *ফ্যাকাশে মেঘের মতো চাঁদের আকাশ পিছে রেখে*
চলে যাই ;

'অনেক আকাশ', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*

৯. *...তবু শেষে শান্তি এল মনে*
যখন বেগুনী নীল প্রজাপতি কাঁচপোকা আবার নেমেছে মাঠে বনে।

'এই শান্তি', *ঐ*

১০. *শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর*

'শঙ্খমালা', *বনলতা সেন*

১১. *বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ*

ঐ

১২. *চারিদিকে পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ*

'শিকাব', *বনলতা সেন*

১৩. *দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ*

'মৃত্যুর আগে', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*

১৪. *আমি মুদ্রিত চোখ নিয়ে*
তোমাকে অনুভব করি,
মনে হয় যেন সূর্যাস্তের জাফরান আলোয়
শাদা গোলাপের বাগান ছড়িয়ে রয়েছে মাইলের পর মাইল,

'চিঠি এল', *কবিতা,* আষাঢ় ১৩৬৪

১৫. *রূপালি চাঁদের আলোর ফোয়ারায়*
হাওয়ার ফোয়ারায়
রাশি রাশি কাঞ্চন ফুলের মত ফুটে উঠছে এদের দেহ আরেকবার

'সুন্দরবনেব গল্প', *চতুরঙ্গ,* চৈত্র ১৩৬২

১৬. *সবুজ জাফরান রঙের বাতাসের উষ্ণতায়*
প্রান্তবে প্রান্তরে চাঁদের আলোর কমলাবর্ণের মদিরার ভিতর
এরা দুজনে অরণ্যের স্বপ্ন তৈরি করেছিল কাল
এই হরিণ— এই চিতা—

ঐ

১৭. *মনে পড়ে নিবিড় মেরুণ আলো, মুক্তার শিকারী*

'সবিতা', *বনলতা সেন*

আবার এক একটা রং-এর কথা কত ভাবেই না তিনি লিখেছেন। যেমন, লাল রংটার কথাই ধরা যাক—

তিনি লিখেছেন :

১. মচ্‌কা ফুলের মত লাল
২. শিশুর গালের মত লাল
৩. করবী ফুলের মত লাল

তবে নীল রংটার কথাই যেন জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় বেশি ব্যবহার করেছেন। যেখানে নীল শব্দের ব্যবহারের কোনও প্রয়োজন নেই, বরং নীল শব্দ ব্যবহারে অর্থও তেমন পরিষ্কার হয় না, জীবনানন্দ সেখানেও নীল শব্দ প্রয়োগ করে গেছেন। যেমন— নীল কুয়াশা।

যাই হোক, শুধু জীবনানন্দই নন, নীল রংটা বোধ করি কবিদের কাছে প্রিয় বলেই অনেক কবি তাঁদের কবিতায় যেখানে নীল বলার কথা নয়, সেখানেও নীল বলে গেছেন। যেমন, মহাকবি কালিদাস তাঁর *রঘুবংশ* কাব্যে লিখেছেন :

তমালতালি বনরাজি নীলা।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর একটি কবিতায় লিখেছেন :

নীল নবঘনে আষাঢ় গগনে
তিল ঠাঁই আর নাহিরে।

কবি অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর একটি গানে লিখেছেন :

ও আকাশ বল আমারে
মেঘেরা দল বেঁধে যায় কোন্ দেশে,
তারা কেউবা রঙীন ওড়না গায়ে
কেউ সাদা কেউ নীল বেশে।

নীল শাড়ির কথা নিয়ে বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসও লিখে গেছেন :

চলে নীল শাড়ি
নিঙাড়ি নিঙাড়ি
পরাণ সহিত মোর।

জীবনানন্দ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় কতভাবে যে নীল শব্দ ব্যবহার করে গেছেন, এখানে তার কিছু উদাহরণ দিচ্ছি :

নীল চাঁদ, নীল জ্যোৎস্না, নীল রাত্রি, নীল কুয়াশা, নীল অশ্রুজল, নীল নরক, নীল অন্ধকার, নীল শিশিব, নীল মত্ততা, নীল ধোঁয়া, নীল অমাবস্যা, নীল তারা, নীল জল (শিশিরের), নীল মৃত্যু, নীল সন্ধ্যা, নীল জামরুল, নীল নীড়, নীল পাতা, নীল সুপারির বন, নীল তেঁতুলের বন, নীল ছায়া (তমালের), নীল বাংলা, নীল অত্যাচার, নীল নাভিশ্বাস— ইত্যাদি।

আবার শুধু নীল-ই নয় নীলাভ এবং নীলচে শব্দও কোথাও কোথাও ব্যবহার করেছেন :

নীলাভ ব্যথিত দুই চোখ, নীলাভ বৃত্তি, নীলাভতম ইচ্ছা, কোমল নীলাভ ভাঙা ঘুমের আস্বাদ, নীলচে ঘাসের ফুল— ইত্যাদি।

জীবনানন্দ প্রধানত বিশেষণ শব্দ হিসাবেই এই যে এত নীল শব্দ ব্যবহার করে গেছেন, এর মধ্যে কিছু নীল ভাল অর্থে, আবার কিছু নীল মন্দ অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। মন্দ অর্থে যেমন :

নীল মৃত্যু, নীল অশ্রুজল, নীল নরক ইত্যাদি।

আর জীবনানন্দ যেখানে লিখেছেন :

বেতের ফলের মতো টল্‌মল্‌ দুই চোখ জুড়ে
নীল আশা ছিল ঢের;
এখানে ভাল অর্থেই নীল ব্যবহার করেছেন।

গন্ধ প্রধানত নাসিকা এই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হলেও অনেক সময় আমরা নাসিকার সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্ক না রেখেও গন্ধ শব্দ ব্যবহার করে থাকি :

১. আমরা গিয়ে দেখি সেখানে তাদের কোনো নাম গন্ধই নেই।
   এখানে গন্ধ নাসিকা এই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়, চোখ এই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখে শুধু অস্তিত্ব বোঝাতেই গন্ধ শব্দের ব্যবহার করা হয়েছে।
২. কিছুদিন আগেও এই পরিবারের যে সুনাম ছিল, আজ আর তার কোনো নাম গন্ধ নেই।
   এখানে গন্ধ শব্দের ব্যবহারে স্মৃতি এবং অস্তিত্ব দুই-ই রয়েছে।
৩. শেষ পর্যন্ত দু জনের মধ্যে যে মারামারি হবে, তার গন্ধ দুজনেই আগে থেকেই পেয়েছিল।

এখানে পূর্বাভাস বোঝাতে গন্ধ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।
জীবনানন্দ লিখেছেন :

দিকে দিকে চাল ধোয়া গন্ধ মৃদু— ধূসর শাড়ীর ক্ষীণ স্বর
শোনা যায় মানুষের হৃদয়ের পুরনো নীরব
বেদনার গন্ধ ভাসে।

জীবনানন্দ যে বলেছেন, 'চাল ধোয়া মৃদু গন্ধ'— এই গন্ধ নাসিকা গ্রাহ্য অর্থাৎ নাক দিয়ে ঐ মৃদু গন্ধ অনুভব করা যেতে পারে। কিন্তু তিনি যে বলেছেন— হৃদয়ের পুরনো নীরব বেদনার গন্ধ— এখানে এই গন্ধ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক— এই পঞ্চ বহিরিন্দ্রিয়ের কোনোটার দ্বারাই অনুভবের নয়। এখানে পুরনো বেদনার গন্ধকে বলা যেতে পারে— পুরনো স্মৃতি অর্থাৎ একদিন যার অস্তিত্ব ছিল।

জীবনানন্দ লিখেছেন— *সুপক্ক রাত্রির গন্ধ*

সুপক্ক রাত্রিকে না হয় বলা যেতে পারে— গভীর রাত্রি, কিন্তু রাত্রি সে গভীরই হোক বা অগভীরই হোক, তার কি কোনো গন্ধ আছে?

এখানে হয়ত তিনি বলতে চেয়েছেন— গভীর রাত্রির অস্তিত্ব। তাহলে গন্ধ এখানে নাসিকাগ্রাহ্য না হয়ে অস্তিত্ব অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৩৬৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা *কবিতা* পত্রিকায় 'নির্জন হাঁসের ছবি' নামে

জীবনানন্দের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ কবিতায় জীবনানন্দ এক জায়গায় লিখেছিলেন :

রাত যেন লেবুর ফুলের মতো নক্ষত্রের গন্ধ দিয়ে ঘেরা

এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়— রাতের আকাশে লেবুর ফুলের মতো নক্ষত্র ফুটেছে বা নক্ষত্র দেখা দিয়েছে। নক্ষত্রের গন্ধ দিয়ে ঘেরা বলতে কি কবি নক্ষত্রের আলো দিয়ে ঘেরা বা নক্ষত্রের আলোয় আলোকিত রাত্রি বলতে চেয়েছেন? তাই যদি হয়, তাহলে বলতে হবে কবি এখানে— নক্ষত্রের আলোকেই নক্ষত্রের গন্ধ বলেছেন। অর্থাৎ যেখানে স্বাভাবিক অর্থে গন্ধের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই, সেখানেই কবি গন্ধ শব্দ ব্যবহার করেছেন। না হলে বলতে হয়— নক্ষত্রের অস্তিত্বকেই নক্ষত্রের গন্ধ বলেছেন।

জীবনানন্দ লিখেছেন :

কৃষ্ণা যমুনার নয় যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে— রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর জেগে থাকে।

ময়লা জলের ঢেউয়ের ঘ্রাণ বা আঘ্রাণ হতে পারে। কিন্তু কবি এখানে গাঙুড়ের ঢেউ বলে পরিষ্কার বা ভাল জলেরই ঢেউ-এর কথা বলেছেন। তাই গাঙুড়ের জলের ঢেউ-এর ঘ্রাণ বা আঘ্রাণ হবে কি করে? তবে গাঙুড়ের ঢেউয়ের দৃশ্য বা শব্দ হতে পারে। তাই যদি হয়, তাহলে বলতে হবে— জীবনানন্দ এখানে চক্ষু ও কর্ণ এই দুই ইন্দ্রিয়ের জিনিষকে নাসিকা ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য করে বলে গেছেন।

জীবনানন্দ বলেছেন— যেন গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ লেগে থাকে চোখে মুখে।

এখানে 'লেগে থাকে চোখে মুখে' থাকায় বলা যেতে পারে গাঙুড়ের জল চোখে মুখে দিলে চোখে মুখে লেগে থাকতে পারে। এবং সেই জলের যদি কিছু আঘ্রাণ থাকে, তাহলে সেই জলের আঘ্রাণ মুখে লাগতে পারে, কিন্তু এখানেও সেই আঘ্রাণ বুঝতে হলে নাসিকার প্রয়োজন, চোখ বা মুখের বহিঃঅঙ্গ দিয়ে তা বোঝা যাবে না। অথচ জীবনানন্দ নাসিকার কথা না বলে চোখ মুখের কথা বলেছেন।

জীবনানন্দ তাঁর অনেক কবিতায় অচেতন বস্তু বা অবস্তুকে সচেতন কল্পনা করে সে সবেরও গন্ধ বা ঘ্রাণ নেবার কথা বলেছেন। যেমন, তিনি তাঁর *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থের 'অবসরের গান' কবিতায় লিখেছেন :

শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা রেখে

...

মাঠের ঘাসের গন্ধ বুকে তার চোখে তার শিশিরের ঘ্রাণ

চাবিদিকে এখন সকাল

...

মাঠেব ঘাসেব 'পবে শৈশবের ঘ্রাণ

এখানে কবির এই বক্তব্যে— ভোরের রোদকে কর্তা করা হয়েছে এবং সেই রোদ ধানের উপর মাথা রেখে শুয়েছে। মাঠের ঘাসের উপরও রোদ পড়েছে, তাই কবি বলেছেন— রোদের বুকে ঘাসের গন্ধ। আর তখন ভোর বা অতি প্রত্যুষ বলে ধানের উপর তখন শিশিরও আছে। তাই তিনি লিখেছেন— রোদের চোখে শিশিরের ঘ্রাণ, অর্থাৎ রোদের চোখে মুখে শিশির রয়েছে। এখানে জীবনানন্দ অচেতন রোদকে সচেতন কল্পনা করে বা অচেতন রেখেই রোদের বুক চোখ আছে দেখিয়েছেন।

আর এই উদ্ধৃতির শেষ অংশে জীবনানন্দ যে লিখেছেন— এখন সকাল, তাই মাঠের ঘাসের 'পরে শৈশবের ঘ্রাণ— এখানে সকাল বলেই তিনি শৈশবের ঘ্রাণের কথা বলেছেন। যদি বলতেন— এখন দুপুর, তাহলে হয়ত লিখতেন, যৌবনের ঘ্রাণ।

আমি প্রথমেই যে বলেছি, অনেক সময় 'অস্তিত্ব' বোঝাতেও গন্ধ বা ঘ্রাণ শব্দ ব্যবহৃত হয়ে থাকে, তেমনি এখানে ঘাস ও ধানের উপর রোদের কল্পিত বুক ও চোখে ঘাস ও শিশির থাকায় বুকে ঘাসের গন্ধ এবং চোখে শিশিরের ঘ্রাণ বলা হয়েছে— এমন অনুমান করা যেতে পারে।

গন্ধ নিয়ে কেউ কিছু বলতে বা লিখতে গেলে, সাধারণত গন্ধের প্রকার ভেদেব জন্য গন্ধ শব্দের আগে যেমন মৃদু অথবা তীব্র শব্দ ব্যবহার করে থাকেন, তেমনি সু অথবা দুঃ বসিয়ে সুগন্ধ অথবা দুর্গন্ধও বলে থাকেন।

জীবনানন্দের কবিতায় এরূপ সুগন্ধ বা দুর্গন্ধি শব্দের ব্যবহাব কচিৎ দু একটা চোখে পড়ে মাত্র। যেমন—

১. *কচি বাতাবী লেবুব মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস*

'শিকাব', *বনলতা সেন*

২. *তিমির মৃত দেহের দুর্গন্ধের মতো*

'আদিম দেবতাবা', *মহাপৃথিবী*

জীবনানন্দ সাধারণের মতো সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বেশি না লিখলেও তিনি গন্ধ শব্দ নিয়ে 'গন্ধ'কে মূলত বিশেষ্য হিসাবে রেখে গন্ধের আগে নানা রকমের বিশেষণ দিয়ে প্রচুর লিখে গেছেন। যেমন :

নরম গন্ধ, ভিজে গন্ধ, সোঁদা গন্ধ, ম্লান গন্ধ, বিষণ্ণ গন্ধ, মৃদু গন্ধ, সিন্ধুর ফেনার গন্ধ।

এমনও লিখেছেন :

বেদনার গন্ধ, ব্যথিত গন্ধ ইত্যাদি।

আবার কত রকমের গন্ধের কথাও বলেছেন। যেমন :

> ফেন্সা ভাতের গন্ধ, দীঘির জলের গন্ধ, মৌরির গন্ধ, দুব পৃথিবীর গন্ধ, নদীর জলেব গন্ধ, রৌদ্রের ডানার গন্ধ, ধানের গন্ধ, ফাল্গুন রাতের গন্ধ, ঝিঁঝির গন্ধ— ইত্যাদি।

গন্ধর কোনো বিশেষণ না দিয়ে বা কিসের বা কি ধরনের গন্ধ না বলে শুধু গন্ধ ব্যবহার করেছেন খুবই কম। যেমন, একটা উদাহরণ :

> *... শাদা ভাঁট ফুলের তোড়া*
> *আলোক লতার পাশে গন্ধ ঢালে দ্রোণফুল বাসকের গায়।*

গন্ধ আর ঘ্রাণের অর্থ একই। জীবনানন্দ তাঁর বহু কবিতায় গন্ধের ন্যায় ঘ্রাণও ব্যবহার করেছেন, কোথাও কোথাও একই সঙ্গে পাশাপাশি বা পরপর গন্ধ এবং ঘ্রাণ দুই-ই ব্যবহার করে গেছেন।

জীবনানন্দ গন্ধ যেমন নানা রকমের বলেছেন, তেমনি নানা ধরনের ঘ্রাণ তিনি তাঁর কবিতায় লিখে গেছেন। যেমন :

> সুপক্ক যবের ঘ্রাণ, সুপক্ক রাত্রির ঘ্রাণ, রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ, ঘাসের ঘ্রাণ, বনের পথে চিতা বাঘের গায়ের ঘ্রাণ, মাঠে ঘাসের 'পবে শৈশবের ঘ্রাণ, শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ, হাঁসের গাযের ঘ্রাণ, পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ, জলের ঘ্রাণ, আদিম রাত্রির ঘ্রাণ, পৃথিবীর ঘ্রাণের পসরা— ইত্যাদি।

জীবনানন্দের মতো এত রকমের এত ঘ্রাণ গন্ধ নিয়ে আর কেউ কি লিখেছেন? বোধ হয় না।

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা

জীবনানন্দ প্রচুর প্রেমের কবিতা লিখে গেছেন। আর তাঁর সেই সব কবিতাও নানান ধরনের। তাঁর লেখা প্রেমের কবিতাগুলিকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন :

১. কোনো নারীকে দেখে তার উপর লেখা কবিতা। এটা কতকটা পূর্বরাগের কবিতার মতন।
২. সফল প্রেমের বা মিলনের কবিতা
৩. প্রেয়সীর চিঠি পেয়ে তার উপর লেখা কবিতা
৪. প্রৌঢ় বয়সের প্রেম সম্বন্ধে লেখা কবিতা
৫. ব্যর্থ প্রেমের কবিতা
৬. মৃতা-প্রেয়সীদের উপর লেখা কবিতা
৭. অপরের— তা সে মানুষই হোক বা পশুপক্ষীই হোক বা অন্যান্যই হোক, তাদের প্রেম নিয়ে লেখা কবিতা।

ড. সুকুমার সেন তাঁর *বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস* (৪র্থ খণ্ড) গ্রন্থে জীবনানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে জীবনানন্দের প্রেমের কবিতাগুলি সম্পর্কে মাত্র তিনটি শব্দে মন্তব্য করেছেন— 'প্রেমের স্বাদ তিক্ততা।'

সুকুমারবাবুর এ কথা ঠিক নয়। কারণ, জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা যেমন তিক্ত স্বাদের আছে, তেমনি মধুর স্বাদের আছে, তিক্ত-মধুর মিশ্র স্বাদেরও আছে। আবার এ ব্যাপারে যেখানে তিনি অনেকটা নিরপেক্ষ, সেখানে তাঁর স্বাদ-বিহীন কবিতাও আছে।

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা প্রসঙ্গে ড. দীপ্তি ত্রিপাঠির উক্তিটিও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি তাঁর *আধুনিক বাংলা কাব্যপরিচয়* গ্রন্থের জীবনানন্দ অধ্যায়ে লিখেছেন, 'যে-প্রেম তিনি পান নি, যে-প্রেম শেষ হয়ে গিয়েছে, যা আর কোনো দিনও ফিরে আসবে না, জীবনানন্দ সেই অচরিতার্থ প্রেমের কবি।'

দীপ্তি দেবীর এ কথাও সঠিক বলে আমি মনে করি না। কারণ, প্রেম না পাওয়া, প্রেম শেষ হয়ে যাওয়া এবং প্রেম আর কোনো দিন ফিরে না পাওয়ার কবিই শুধু জীবনানন্দ ছিলেন না। যে প্রেম তিনি পেয়েছেন, যে-প্রেম আবার ফিরে এসেছে,

এমন চরিতার্থ প্রেমেরও কবি তিনি ছিলেন।

জীবনানন্দের প্রায় সব প্রেমের কবিতাই উত্তম পুরুষের এক বচনের জবানীতে লেখা। অর্থাৎ এইসব কবিতায় যেন তিনি নিজেই প্রেমিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে, কখন তাঁর প্রেমিকা বা প্রেয়সীর কাছে উপস্থিত হয়েছেন, কখন সাক্ষাতে তার সঙ্গে কথা বলেছেন, আবার কখনও অসাক্ষাতেও তার উদ্দেশে কিছু বলেছেন।

অবশ্য কবি যেমন কখনো কখনো তাঁর প্রেয়সীর কাছে গেছেন, কোনো কোনো কবিতায় দেখি তাঁর প্রেয়সীও তাঁকে খুঁজে তাঁর কাছে এসেছে।

জীবনানন্দের এই প্রেমের কবিতাগুলিতে প্রেমিকের জায়গায় 'আমি' থাকায় অনেকেই ঐ 'আমি'কে জীবনানন্দ ভেবে এই কবিতাগুলিকে জীবনানন্দেরই ব্যক্তি-জীবনের প্রেম-কাহিনী ভেবেছেন। তাই জীবনানন্দের প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে বহু ব্যর্থ প্রেমের কবিতা থাকায় অনেককে এমন কথাও বলতে শুনেছি যে, জীবনানন্দ তাঁর জীবনে স্ত্রীর কাছ থেকে তেমন ভালবাসা পাননি। জীবনানন্দ সম্পর্কীয় একজন লেখক (এঁর নামটা আর এখানে বললাম না) এমন কথাও আমার কাছে বলেছিলেন যে, জীবনানন্দের *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আকাশলীনা' জীবনানন্দ তাঁর স্ত্রীকে লক্ষ্য করে লিখেছিলেন।— সেই কবিতাটি বইয়ে 'কয়েকটি কবিতা' অধ্যায়ে দিয়েছি।

আকাশলীনা কবিতটি যে জীবনানন্দের স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে লেখা নয়, এটা যে কবির নিছক কল্পনা— এ কথা আমি বুঝলেও, তবুও একদিন সাহস করে জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দেবীকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। উত্তরে সেদিন তিনি কোনোরূপ ইতস্তত না করেই সঙ্গে সঙ্গে সরলভাবে বলেছিলেন যে, ঐ কবিতাটি তাঁদের বিয়ের আগের লেখা। কবিতাটিতে রচনার তারিখ দেওয়া না থাকলেও লাবণ্য দেবীর একথা অবিশ্বাস করারও কোনো কারণ দেখি না।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে *ময়ূখ* পত্রিকার কর্তৃপক্ষ জীবনানন্দের ভ্রাতা ও ভগ্নীর সহযোগিতায় অনেক লেখা দিয়ে বেশ বড় ও সুন্দর করে একটি 'জীবনানন্দ সংখ্যা' করেছিলেন। কেন জানি না, ঐ বইয়ের কোথাও কিন্তু একটি বারের জন্যও লাবণ্য দেবীর নাম পর্যন্তও নেই। এই কারণেই হয়ত, ঐ জীবনানন্দ-গবেষক ভদ্রলোক ঐরূপ ভাবতে সাহস করেছিলেন।

যাঁরা জীবনানন্দের ব্যর্থ-প্রেমের কবিতা পড়ে ভাবেন, জীবনানন্দ তাঁর স্ত্রীর ভালবাসা পাননি, তাঁদের বলতে পারি জীবনানন্দ যে স্ত্রীর সঙ্গে দীর্ঘদিন শান্তিতে কাটিয়েছেন, সেকথা তিনি তো তাঁর একটি কবিতায় নিজেই স্বীকার করে গেছেন। যেমন,

আমাদের হৃদয়ের নদীর উপর দিয়ে ধীরে
এখনো যেতেছে চ'লে কয়েকটি শাদা রাজহাঁস ;

সহধর্মিণীর সাথে ঢের দিন— আরো ঢের দিন
করেছি শান্তিতে বসবাস;

'বিভিন্ন কোবাস', (এক) *মহাপৃথিবী*

জীবনানন্দের ঐ 'আমি' উক্তির মধ্যে সর্বত্রই তাঁকে খুঁজতে গিয়ে লোকে যে কি ভাবে ভুল করেন, এখানে তাঁর 'মেয়ে' কবিতাটি নিয়ে তারই একটা উদাহরণ দিচ্ছি। এটা যদিও প্রেমের কবিতা নয়, তবুও প্রেম ও দাম্পত্য জীবনের পরিণতির ফল যে সন্তান, তারই কবিতা। কবিতাটি জীবনানন্দের সিগনেট সংস্করণ *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থে আছে। এই কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

আমার এ ছোট মেয়ে— সব শেষ মেয়ে এই
শুয়ে আছে বিছানার পাশে

...

...আমার প্রথম মেয়ে সেই
মেঘ দিয়ে ভেসে আসে যেন
বলে এসে, বাবা তুমি ভালো আছ?...
হাতখানা ধরি তার ঃ ধোঁয়া শুধু ...
'ব্যথা পাও? কবে আমি মরে গেছি— আজো মনে কর?'

জীবনানন্দের এই কবিতাটিও উত্তম পুরুষের এক বচনের জবানীতে লেখা হওয়ায়, কবিতাটি পড়ে অনেকেরই দৃঢ় ধারণা যে, জীবনানন্দের প্রথম মেয়েটি অল্প বয়সেই মারা গিয়েছিল।

এই মেয়ে কবিতাটি পড়েই, একটি বড় কলেজের নামজাদা এক ইংরাজির অধ্যাপককে বলতে শুনেছি— জীবনানন্দের একাধিক কন্যা জন্মেছিল, তাদের মধ্যে প্রথমটি কম বয়সেই মারা যায়।

জীবনানন্দের স্ত্রী লাবণ্য দেবীর কাছেও শুনেছি,— তিনি কলকাতায় যে বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, সেই বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী ঐ 'মেয়ে' কবিতাটি পড়ে একদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর দুটি মেয়ে কিনা?

'মেয়ে' কবিতায় জীবনানন্দ যাই লিখুন না কেন, আসলে তাঁর একটিই মেয়ে ছিল— নাম মঞ্জুশ্রী।

জীবনানন্দের ব্যর্থ প্রেমের কবিতা বা সফল প্রেমের কবিতা এগুলির মধ্যে ব্যক্তি জীবনানন্দকে না খুঁজে, সাধারণভাবে তাঁর কবিতাগুলি নিয়েই আলোচনা করা শ্রেয়। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করি যে, কবিতায় কল্পনা থাকলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে কবির ব্যক্তি জীবনের প্রভাব বা ছাপ পড়াও অসম্ভব নয়। তাই জীবনানন্দের এই প্রেমের কবিতাগুলির কোনোটিতেই যে তাঁর নিজের জীবনের কোনো ছাপ পড়েনি,

তা নয়। যেমন, *রূপসী বাংলা*-র একটি কবিতার শেষে পাদটীকায় জীবনানন্দ লিখেছেন— '১৩২৬-এব কতকগুলো দিনের স্মরণে।'

এ থেকে তো পরিষ্কারই বোঝা যাচ্ছে, জীবনানন্দ তাঁর নিজের জীবনেরই কয়েকটি দিনের কথা স্মরণ করেই এই প্রেমের কবিতাটি লিখেছেন।

এখানে কবির নিজের স্বীকারোক্তি বলে তাই, না হ'লে তাঁর কোন্ কবিতায় তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা বা মনের কথা আছে তা বলা কঠিন।

'বনলতা সেন' জীবনানন্দের একটি অতি বিখ্যাত কবিতা। এই কবিতাটির কথাই ধরা যাক। এই কবিতাটি নিয়ে আমি একদিন জীবনানন্দকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম বনলতা সেন নামে তাঁর পরিচিতা কোনো মহিলা ছিল বা আছে কিনা। উত্তরে সেদিন তিনি কিছু না বলে শুধু মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসেছিলেন।

আমার মতই কবি নীহারকান্তি ঘোষ দস্তিদারও একদিন জীবনানন্দকে ঐ একই প্রশ্ন করেছিলেন। সেদিন জীবনানন্দ উত্তরে নীহারবাবুকে শুধু বলেছিলেন— কবিতাটা ভাল লেগেছে কিনা তাই বলুন! অন্য খোঁজে কি দরকার!

তাই জীবনানন্দের কোন্ প্রেমের কবিতায় তাঁর নিজের কথা কতটা আছে তা খোঁজ না করে (তাঁকে জিজ্ঞাসা করেই যখন জানা যায়নি, তখন এ নিয়ে আন্দাজে অনুমান করা তো আরো কঠিন) তাঁর কবিতার গুণাগুণ নিয়েই সাধারণভাবে আলোচনা করা ভাল।

জীবনানন্দ তাঁর প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটিতে প্রেয়সীদের নাম ধরে সম্বোধন করে তাদের সম্বন্ধে লিখে গেছেন। শুধু নাম বা পদবী সহ নামই কেবল নয়, কোনো কোনো কবিতায় তাদের বাসস্থানের ঠিকানা পর্যন্তও বলে গেছেন। তার ফলে, কবির এই প্রেয়সীরা যেন বাস্তব হয়ে উঠেছে।

কয়েকটি কবিতায় প্রেয়সীদের নাম বা নাম ধাম বলে গেলেও, জীবনানন্দ তাঁর প্রেমের কবিতাগুলির অধিকাংশতেই প্রেয়সীদের 'তুমি' এই সম্বোধনের আড়ালেই রেখে গেছেন।

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা নিয়ে, শুধু প্রেমের কবিতাই বা কেন, তাঁর সকল রকমের কবিতা নিয়েই আলোচনা করবার আগে আর একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, তিনি ছিলেন একজন রোমাণ্টিক কবি।

রিয়েলিস্টিক ও রোমাণ্টিক সাহিত্য নিয়ে এক সময় ইউরোপীয় সাহিত্যে প্রচুর আন্দোলন হয়েছিল। তার ঢেউ আমাদের সাহিত্যেও এসেছিল। এ নিয়ে আমাদের দেশের সাহিত্য সমালোচকরাও নানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এখানে বিখ্যাত সাহিত্যিক ও সমালোচক প্রমথ চৌধুরী বা বীরবলের এ সম্বন্ধে একটা লেখা থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি :

Realism শব্দটি কিন্তু একটি বিশেষ সঙ্কীর্ণ অর্থেই ইউরোপীয় সাহিত্যে সুপরিচিত।

এক কথায় *Realistic* সাহিত্য *Romantic* সাহিত্যের অপর পৃষ্ঠা এবং Victor Hugo প্রমুখ লেখকদের রচিত সাহিত্যের প্রতিবাদ স্বরূপেই Flaubert প্রমুখ লেখকরা এই বস্তুতান্ত্রিক সাহিত্যের সৃষ্টি করেন।

Romanticism এর বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ এই যে, সে-সাহিত্য মনগড়া সাহিত্য। *Romantic* কবিদের মানসপুত্র ও মানসী কন্যারা এ পৃথিবীব সন্তান নয় এবং যে জগতে তারা বিচরণ করে সেটি কবিদের স্বকপোলকল্পিত জগৎ। এক কথায় সে রূপের রাজ্যটি রূপ কথার রাজ্য। উক্ত শ্রেণীর কবিরা নিজের কুক্ষিস্থ উপাদান নিয়ে যে মাকড়সার জাল বুনেছিলেন ফরাসী *Realism* তারই বক্ষে নখাঘাত করে। এ অভিযোগের মূলে যে অনেকটা সত্য আছে, তা অস্বীকাব করা যায় না। এক গীতিকাব্য বাদ দিলে ফরাসী দেশের গত শতাব্দীর *Romantic* লেখকদের বহু নাটক নভেল যে অশরীবী এবং প্রাণহীন সে কথা সত্য। কিন্তু একমাত্র সুন্দরের চর্চা করতে গিয়ে সত্যের জ্ঞান হারানো যেমন *Romantic*-দের দোষ, তেমনি সত্যের চর্চা করতে গিয়ে সুন্দরের জ্ঞান হারানোটাও *Realist*-দের দোষ, প্রমাণ Zola। আকাশ-গঙ্গা অবশ্য কাল্পনিক পদার্থ, কিন্তু তাই বলে কাব্যে মন্দাকিনীর পরিবর্তে ঘোলা নর্দমাকে প্রবাহিত করার অর্থ তার জীবন দান নয়।

সবুজ পত্র, মাঘ ১৩২১

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতা নিয়ে আলোচনা করবার আগে আর একটা কথা। জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থে 'প্রেম' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা আছে। এই কবিতায় জীবনানন্দ সাধারণভাবে প্রেম সম্বন্ধে অনেক কথা এবং ঐ সঙ্গে কখন কখন নিজেরও প্রেমের কথা বলেছেন। আরও কয়েকটি কবিতায়ও জীবনানন্দ প্রসঙ্গত সাধারণভাবে প্রেমের কথাও বলেছেন, যেমন, একটা উদাহরণ :

সমস্ত নীলিমা-সময় প্রেম কী উদার অনল সংঘর্ষময়ী বাসনা
মহনীয় অগ্নি-পরিধির অন্তহীন কারুশিল্প সংগীতে লীন।

'আমি', *সুদর্শনা*

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতাগুলি সম্বন্ধে আমি যে বলেছি, এগুলিকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে, এখন সেই নিয়েই আলোচনা করছি।

পূর্বরাগের কবিতা

এক সময় কয়েক বছর ধরে আমি জীবনানন্দের অগ্রন্থভুক্ত কবিতা সংগ্রহ করেছিলাম। ঐ সব কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে ছিল। এইভাবে আমি তখন প্রায় দেড়শো জীবনানন্দের অগ্রন্থিত কবিতা সংগ্রহ করেছিলাম। ঐ কবিতাগুলির মধ্য থেকে ৪০টি বিভিন্ন ধরনের প্রেমের কবিতা নিয়ে *সুদর্শনা* নাম দিয়ে জীবনানন্দের একটি প্রেমের

কবিতার বই করেছিলাম। এই বইয়ের প্রথমে 'এই পথ দিয়ে', 'তুমি আলো', 'তোমায় আমি দেখেছিলাম' ইত্যাদি নামে কয়েকটি কবিতা দিয়েছি। এগুলোকে অনেকটা পূর্বরাগের কবিতা বলা যেতে পারে। যেমন, 'এই পথ দিয়ে' কবিতাটি :

এই পথ দিয়ে কেউ চলে যেত জানি।
এই ঘাস
নীলাকাশ—
এসব শালিখ সোনালি ধান নর-নারীদের
ছায়া কাটাকুটি কালো-রোদে

...

সে তার নিজের সাধ রৌদ্র স্বর্ণ সৃষ্টি করেছিল।
তবুও রাত্রির দিকে চোখ তার পড়েছিল ব'লে
হে আকাশ, হে সময়, তোমার আলোকবর্ষব্যাপ্তি শেষ হ'লে
যখন আমার মৃত্যু হবে
সময়ের বঞ্চনায় বিরচিত সে এক নারীর
অবোলা রাত্রির মত চোখ মনে রবে।

জীবনানন্দ 'তুমি আলো' কবিতার প্রথমে লিখেছেন :

তুমি আলো হতে আরো আলোকের পথে
চলেছ কোথায়!
তোমার চলার পথে কি গো তপতীর
ছায়ার মতন থাকা যায়!

'তোমায় আমি দেখেছিলাম' কবিতায় কবি লিখেছেন :

তোমায় আমি দেখেছিলাম ঢের
সাদা কালো রঙের সাগরের
কিনারে এক দেশে
রাতের শেষে— দিনের বেলায় শেষে।
এখন তোমায় দেখি না তবু আর—

জীবনানন্দের এই ধরনের কবিতা অবশ্য সংখ্যায় বেশি নেই।

সফল প্রেমের কবিতা

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালক*-এর 'ছায়াপ্রিয়' কবিতাটি থেকে জানা যায়, কবি কৈশোরেই এক বান্ধবী পেয়েছিলেন। সে বান্ধবী ছিল কবির 'মনের মধু মনোরমা', কবির এই বান্ধবী অবশ্য বেশি দিন বাঁচেনি।

বনলতা সেন গ্রন্থের 'বনলতা সেন' কবিতাটি একটি সার্থক প্রেমের কবিতা। কারণ, ক্লান্ত কবিকে দু-দণ্ডের জন্য হলেও বনলতা সেন শান্তি দিয়েছিল।

এই বনলতাও একদিন কবিকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। বনলতার সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল নাটোরে। শেষ সাক্ষাৎ হয় দ্বারকায়। তখন কবির জীবনের সব লেনদেন ঘুচে গেছে অর্থাৎ শেষ হয়ে গেছে। তাঁর শরীরে তখন ঘুমের ঘ্রাণ। এই ঘুম, চিরঘুম বা চিরনিদ্রাও হতে পারে। কেননা, কবি এই ঘুমের ঘ্রাণ শব্দটা না লিখে, আগে এর জায়গায় লিখেছিলেন— মমির ঘ্রাণ অর্থাৎ মৃত্যুরই ঘ্রাণ। এবার বনলতাকে দেখে হালভাঙ্গা নাবিকের দারুচিনি দ্বীপের ভিতর সবুজ ঘাসের দেশ দেখার মতো উৎসাহ বা আনন্দ ছিল না।

এবার কবিব চাহনিতে আশা আনন্দ না থাকায়, বনলতা তার নারীসুলভ সহজাত বুদ্ধিতেই কবির মনের ভাব বুঝতে পেরে, কবিকে শুধু বলেছিল— মনে আছে? অর্থাৎ বনলতাকে কবি চিনতে পারছেন কিনা প্রশ্ন করেছিল।

বনলতার কথার উত্তরে কবিও নির্লিপ্তভাবে বলেছিলেন— বনলতা সেন? অর্থাৎ তুমি তো বনলতা সেন? বাস্ আর কোন কথা নেই। শুধু দুজনের দুটি কথা।

জীবনানন্দের *বনলতা সেন* গ্রন্থের 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতা থেকেই বনলতার সঙ্গে কবির শেষ সাক্ষাতের কথাটি জানা যায়।

বনলতা সেন গ্রন্থের 'শঙ্খমালা' কবিতায় প্রথমেই কবি লিখেছেন :

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে এক নারী এসে ডাকিল আমারে
বলিল, তোমারে চাই।

এই নারী অনেক খুঁজে খুঁজে কবির কাছে এসে কবিকে এই কথা বলেছিল।

বনলতা সেন গ্রন্থে 'সবিতা' ও 'সুচেতনা' নামে পর পর দুটি কবিতা আছে। এই কবিতা দুটি প্রেমের কবিতা হলেও কবিতা দুটিতে প্রেমের চেয়ে দেশ ও সমাজ বড় হয়ে দেখা দিয়েছে।

বনলতা সেন গ্রন্থের 'মিতভাষণ' কবিতায় কবি লিখেছেন :

অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়ায়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি;

যা হয়েছে, যা হতেছে, এখনি যা হবে
তার স্নিগ্ধ মালতী-সৌরভে।

কবির এই কথা থেকে বোঝা যায় প্রেয়সীর প্রেম ও ভালবাসায় কবির মন তখন ভরপুর।

জীবনানন্দের *রূপসী বাংলা* কাব্য গ্রন্থের শেষ দিকে মাত্র আট পংক্তির একটি ছোট কবিতা আছে। তার শেষ চার পংক্তি হল :

পৃথিবীর সব ঘুঘু ডাকিতেছে হিজলের বনে
পৃথিবীর সব রূপ লেগে আছে ঘাসে
পৃথিবীর সব প্রেম আমাদের দুজনের মনে
আকাশ ছড়ায়ে আছে শান্তি হয়ে আকাশে আকাশে।

এই কবিতায় 'আমাদের দুজন' কবি ও তাঁর প্রেয়সী বলেই মনে হয়। তাই যদি হয়, তাহলে এ কথা বলা যেতে পারে যে, কবি ও তাঁর প্রেয়সী উভয়েই এক সময় শান্তিময় পরিবেশে পরস্পর পরিপূর্ণভাবে প্রেম উপভোগ করেছেন।

এই *রূপসী বাংলা*-তেই প্রেয়সীর সহিত কবির মিলিত হওয়ার আর একটি কবিতা আছে। সে কবিতার প্রথম পংক্তি এই :

কত দিন তুমি আমি এসে এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর

'রূপসী বাংলা'য় প্রায় এই ধরনের আর একটি কবিতার প্রথম পংক্তি—

কতদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দুজনে

জীবনানন্দের *বেলা অবেলা কালবেলা* গ্রন্থের বিভিন্ন কবিতা থেকেও জানা যায়, জীবনানন্দ কোনো নারীকে বা তাঁর প্রেয়সীকে ভালবেসে পরিপূর্ণ তৃপ্তি লাভ করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, ঐ নারী বা তাঁর ঐ প্রেয়সী কবিকে রীতিমতই ভালবেসে ছিল।

বেলা অবেলা কালবেলা গ্রন্থের 'আমাকে একটি কথা দাও' কবিতায় এক জায়গায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

আমি যাকে আবহমান কাল ভালোবেসে এসেছি সেই নারীর।

এতে বোঝা যাচ্ছে, কবি একটি নারীকে কোনো এক বিশেষ সময়ের জন্য নয়, আবহমান কাল ধরেই ভালবেসে এসেছেন।

এই বইয়ের 'তোমাকে' কবিতার শেষে কবি বলেছেন :

...নারি, শুধু তোমাকে ভালোবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

এখানে, কবি কোনো নারীকে ভালবেসে দুঃখের মধ্যেও শান্তি খুঁজে পেয়েছেন। *বেলা অবেলা কালবেলা* গ্রন্থের একটি কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

হে আকাশ, হে সময়গ্রন্থি সনাতন
আমি জ্ঞান আলো গান মহিলাকে ভালোবেসে আজ;
সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন।

মানুষের মতো মানুষ হয়ে সুস্থ ও আনন্দময় জীবনযাপনের জন্য যেগুলোর প্রয়োজন সেই জ্ঞান আলো ও গানের সঙ্গে সঙ্গে কোনো মহিলাকে অর্থাৎ প্রেয়সীকে ভালবেসে কবি যে কতখানি তৃপ্ত বা চরিতার্থ তা সকালের নীলকণ্ঠ পাখি জল সূর্যের মতন, এই কথাটা থেকেই পরিষ্কার বোঝা গেল।

সুদর্শনা বইয়ে অনেকগুলো সফল প্রেমের বা মিলনের কবিতা আছে। যেমন—এই বইয়ের 'সে' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

...নতুন বসন্ত এক এসেছে জীবনে

...

...আমার বুকে হৃদয়ের বনে
কখন অঘ্রাণ রাত শেষ হ'ল— পৌষ গেল চলে।
যাহারে পাইনি রোমে বেবিলনে, সে এসেছে ব'লে।

'অন্ধকারে' কবিতার শেষে জীবনানন্দ বলেছেন :

...সময়কে যা দেবার সবি দিয়ে
কোটি আলোকবর্ষ পরে আকাশ, তোমার মনের কথা আজ
পেয়েছি অনাথ আমার সুদর্শনাকে বুকে নিয়ে।

এই *সুদর্শনা* গ্রন্থের 'পৃথিবী জীবন সময়' কবিতায়ও কবি তাঁর প্রেয়সী 'সুদর্শনা'র কথা বলেছেন। এই কবিতায় তিনি যদিও এক জায়গায় বলেছেন :

আজকে তোমার ইচ্ছা চিন্তা শপথ আর এক রকম সুদর্শনা।

তবুও তিনি সুদর্শনার সঙ্গে তাঁর আগের প্রেমের কথা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

কে যেন ডেকে নিত আমায়
কে যেন ডেকে নিত তোমার কাছে
সে যেন ডানা টিউব ট্রেন রাডার প্লেন টেলিপ্যাথির গতি
ছাড়িয়ে নীল আকাশে এসে নীল আকাশের নিজের পরিণতি।

সময় এসে আমার কাছে একটি কথা জানতে চেয়েছিল,
তোমার কাছে একটি কথার মানে;
আমরা দুজন দু দৃষ্টিকোণ দিতাম তাকে হেসে
একটি শরীর হতাম পরস্পরকে ভালোবেসে।

এখানে দেখছি, কবি ও তাঁর প্রেয়সী পরস্পরকে ভালোবেসে এক সময় একটি শরীর হয়েছিলেন। এমনি এই গ্রন্থের 'জল' কবিতাতেও দেখছি, কবি ও তাঁর প্রেয়সী এক সময় এক শরীর হয়েছিলেন। ঐ কবিতায় কবি লিখেছেন :

মনে পড়ে, জলের মতন ঘুরে অবিরল
পেয়ে ছিলাম জামের ছায়ার নিচে তোমার জল,
যেন তোমার আমার হাজার হাজার বছর মিল,
মনের সঙ্গে শরীর যেমন মেশে ;

সুদর্শনা গ্রন্থের 'তোমায় আমি' কবিতায় দেখি, কবি তার আগের এক সময় নয়, একবারে বর্তমানেই প্রেয়সীর সহিত গভীরভাবে মিলিত হয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

তোমায় আমি দেখেছিলাম ব'লে
তুমি আমার পদ্মপাতা হ'লে ;

১৩৬৫ সালের শারদীয় *আনন্দবাজার পত্রিকা*-য় 'তোমার আমার' নামে জীবনানন্দের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ৪ পংক্তি করে ৪ স্তবকের সেই কবিতার শেষ দুটি স্তবক হ'ল :

তোমার আমার ভালোবাসা— তা কি
একটি পাখি— একটি শাদা পাখি!
সময় কি তার পথ দেখিয়ে দিয়ে
সঙ্গে চলে ভেসে।
শাদা পাখিই কালো পাখি কিনা
চিনি না আমি, চিনি না চিনি না ;
কালো-শাদার ধাঁধার ব্যথা সব
ফুরিয়ে গেছে তোমায় ভালোবেসে।

জীবনানন্দের এই কবিতাটিকেও একটি পরিপূর্ণ ভালবাসার বা প্রেমের কবিতা বলা যেতে পারে।

প্রেয়সীর চিঠি পেয়ে তার উপর লেখা কবিতা

জীবনানন্দের কোনো প্রেয়সী তাঁকে ছেড়ে দূরে চলে গেলেও সে কিন্তু কবিকে একেবারে ভুলে যায়নি। সে কবিকে স্মরণ করে কখনো কখনো চিঠিও দিয়েছে। যেমন ১৩৬৪ সালের আষাঢ় মাসের *কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত জীবনানন্দের 'চিঠি এল' কবিতাটি। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম।

চিঠি এল

কত বছর পরে তোমার চিঠি পেলাম আবার :
এই সকাল বেলার রৌদ্রে
আমার হৃদয়ে
বারুণীর কোটি কোটি সহচরী
তিমির পিঠ থেকে মকরের পিঠে আছড়ে প'ড়ে
নটরাজ্ঞিদের মতো
মহান্ সমুদ্রের জন্ম দিল।

আমি মুদ্রিত চোখ নিয়ে
তোমাকে অনুভব করি
মনে হয়, যেন সূর্যাস্তের জাফরান আলোয়
শাদা গোলাপের বাগান ছড়িয়ে রয়েছে মাইলের পর মাইল,
একটা সজনে গাছও নেই,
তাই বিরাট আকাশ চিল উড়ে এসে
শূন্য বাতাসের ভিতর আঁকাবাঁকা ব্যর্থ জ্যামিতির দাগ রেখে
গেল শুধু
তারপর দূর নীড়ের দিকে উড়ে গেল
হৃদয়ের পানীয়ের দিকে।

এই পৃথিবীর অব্যবহারের দিকে তাকিয়ে,
কেমন একটা তুহিন ছিল হৃদয়ে :
তোমাকে দেখে ভেঙে গেল;
সমুদ্র যখন (শীতের শেষে) আকাশকে ভালোবেসে
শত শত স্ফীত খোঁপার প্রেমিকা নারীর জন্ম দেয় সে তার জলের ভিতরে।
তাদের সমস্ত ক্ষুধা জড়ো ক'রে

আকাশের পানে গভীরভাবে নিক্ষেপ করে সে :
তোমার উত্তাল গম্বুজের উদ্দেশে
আমার অনুভূতির আলোড়ন,—
সেই সব স্ফীত খোঁপার নারী
তোমার নিস্তব্ধ নীল ভাস্কর্যকে চূর্ণ ক'রে
গুঁড়োয় গুঁড়োয় পৃথিবীর শস্য ক্ষেতে ছড়িয়ে দেবে,
হৃদয়ের ভিতর প্রতিভার নব নব সন্তান কলরব ক'রে উঠবে।

রচনাকাল, ১৩৪৪

১৩৪৪ সাল হ'ল ১৯৩৭-৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। এই কবিতাটি লেখার দু তিন বছর আগে অর্থাৎ ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে কবি অধ্যাপনার কাজ নিয়ে বরিশালের বি. এম. কলেজে যোগদান করেন। এবং তখন তিনি সুখে ও শান্তিতে সপরিবারে বরিশালে নিজের বাড়িতে বাস করছিলেন।

সুখে ও শান্তিতে বললাম এই জন্য যে, স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে বেকার জীবনানন্দকে তখন আর চাকরির জন্য বৃথাই ঘুরে বেড়াতে হচ্ছিল না। কবিতাটি রচনা কালে জীবনানন্দ মানসিক সুখ শান্তির মধ্যে ছিলেন বলেই হয়ত কবিতাটিতে কবির মনের আনন্দ, তৃপ্তি ও আশা এতটা উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিয়েছে।

যাই হোক, কবিতাটি নিয়ে এখন কিছুটা আলোচনা করা যাক— এই কবিতার প্রথমেই জীবনানন্দ লিখেছেন, 'কত বছর পরে তোমার চিঠি পেলাম আবার'।

এখানে 'আবার' এই কথাটা থাকায় বোঝা যাচ্ছে, কবির প্রেয়সী আগেও তাঁকে চিঠি দিয়েছিল। কবির প্রেয়সীর লেখা আগের চিঠিতে বা চিঠিগুলিতে কি সব কথা ছিল, তা পরিষ্কার জানা না গেলেও, এই যে-চিঠির উপর কবির কবিতাটি লেখা, এই চিঠির ভাষা ও বক্তব্য যে কবিব মনের অনুকূলে ছিল তা বলা যেতে পারে। কেন না, আমরা দেখছি, প্রেয়সীর এই চিঠি পেয়েই কবির হৃদয় আনন্দে তোলপাড় করে উঠেছিল।

কবি তাঁর প্রেয়সীর চিঠি পেয়ে মনের আনন্দে ও শান্তিতে চোখ বুজে প্রেয়সীকে অনুভব করতে থাকেন। এই সময় কবির মন আনন্দে রঙীন হয়ে ওঠে এবং এক অপার শান্তি ও স্নিগ্ধতায় তাঁর মন ভরে যায়। কবির মনের এই শান্তিকে বিঘ্নিত করবার জন্য বিঘ্ন সৃষ্টির সহায়ক হিসাবে সামান্যতম কোনো কিছুও তখন তাঁর মনে ছিল না।

কবি তাঁর প্রেয়সীকে সম্বোধন করে বলেছেন, এই পৃথিবীতে যা ব্যবহার করা যায় না বা যাচ্ছে না, এমন অব্যবহারের জিনিসের দিকে তাকিয়ে আমার মনের মধ্যে কেমন একটা জড়তা বা আড়ষ্টতা ছিল। তোমাকে দেখে এখন আমার মনের সেই আড়ষ্টতা দূর হ'ল। অর্থাৎ তোমাকে পাচ্ছিলাম না বলে আমার মনের মধ্যে যে একটা ক্ষোভ ছিল, এখন তোমাক পেতে পারি বা পাব, এই আশায় আমার

মনের সে ক্ষোভ কেটে গেল।

কবি এখানে তোমাকে দেখে যে বলেছেন, এই 'দেখে' বলতে হয় কবি মুদ্রিত চোখে তাঁর প্রেয়সীকে অনুভব করবার বা তার 'মূর্তি' চিন্তা করবার সময় মনশ্চক্ষে তাকে দেখেছেন, নয়ত প্রেয়সীর চিঠি পেয়ে, ঐ চিঠিতেই যেন তাকে প্রত্যক্ষ করছেন, এইরূপ হওয়াটাই সম্ভব বলে মনে হয়।

কবি তাঁর প্রেয়সীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন :

তোমার উত্তাল গম্বুজের উদ্দেশে
আমার অনুভূতির আলোড়ন।

উত্তাল শব্দের একটা অর্থ হ'ল তাল গাছ অপেক্ষাও লম্বা। আর গম্বুজ শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রাসাদের উপরিস্থিত ক্ষুদ্র গৃহের গোলাকার ছাদ। তাই কবির এই কথায় বলা যেতে পারে, কবি এখানে হয়ত তাঁর প্রেয়সীর বাস ভবনের কথাই স্মরণ করেছেন। আর এও বলা যেতে পারে কবি হয়ত এক বা একাধিকবার তাঁর প্রেয়সীর বাস ভবনে গিয়েও ছিলেন।

টীকা

ক. *বারুণীর কোটী...প'ড়ে*

হিন্দু পুবাণে বরুণ হলেন বৃষ্টিব দেবতা। এই বরুণের স্ত্রী হলেন বারুণী। জীবনানন্দ এই বারুণীকে বরাবব সমুদ্রবাসিনীই করে গেছেন। যেমন— ঝরা পালক গ্রন্থের 'সিন্ধু' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

চাহিনা পলার মালা, শুচিতার কলস
মুক্তা তোরণেব তট মীনকুমারীর
চাহিনা নিতল নীড় বারুণী রাণীর।

রূপসী বাংলা গ্রন্থের একটা কবিতাও তিনি লিখেছেন :

এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে সবচেয়ে সুন্দর করুণ :
সেখানে বারুণী থাকে গঙ্গা সাগরের বুকে,— বরুণ
কর্ণফুলী ধলেশ্বরী পদ্মা জলঙ্গীরে দেয় অবিরল জল;

খ. *সমুদ্র যখন...জলের ভিতরে*

কবি এখানে শীতের শেষের সমুদ্রের কথা বলেছেন, তার কারণ, গ্রীষ্ম বা বর্ষার সমুদ্র যখন উদ্দাম থাকে বা শীতে যখন সমুদ্র কিছু শান্ত থাকে, তখন নয়। শীতের শেষে অর্থাৎ বসন্ত সমাগমে সমুদ্রের উপর দিয়ে যখন মৃদুমন্দ বসন্ত পবন বয়ে যেতে থাকে, সেই সময়কার সমুদ্র।

স্ফীত খোঁপা বলতে কবি সমুদ্রের ঢেউকে বুঝিয়েছেন।

গ. *তাদের সমস্ত ক্ষুধা...সে*
এখানে কবি সমুদ্র জলের বাষ্প হওয়ার কথাটাই আসলে বলতে চেয়েছেন।

ঘ. *নিস্তব্ধ নীল ভাস্কর্যকে চূর্ণ ক'রে*
সমুদ্রের জল বাষ্প হয়ে আকাশে যায়, সেই বাষ্প বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে নেমে আসে। তখন তোমার নিস্তব্ধ নীল (ভাল অর্থে এখানে নীল ব্যবহৃত হয়েছে) গম্বুজের ভাস্কর্য বৃষ্টি ধৌত হয়ে ফোঁটা ফোঁটা হয়ে পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে।

আমার এই ব্যাখ্যা ঠিক হল কিনা জানি না, তবে কেউ কেউ এই অংশের অন্যরকম ব্যাখ্যাও করেছেন। একজন সমালোচক বলেছেন যে, এই কবিতার শেষ ১০ লাইনে শেলীর বিখ্যাত কবিতা *Ode to the West Wind*-এর দ্বিতীয় স্তবকের কিছুটা প্রভাব আছে।

দিক চক্রবালে আকাশ ও সমুদ্রের মিলনে মেঘের জন্ম হয় এবং ঐ মেঘ ঊর্ধ্বে আকাশে ছড়িয়ে পড়ে। নীল আকাশের ঐ মেঘগুলোকে গ্রীক পুরাণের মদ এবং দেবতা ব্যাকাস-এর (Bacchas) মহিলা ভজনাকারী মিন্যাড (Maenad) এর আলুলালিত কেশ বলে মনে হয়।

সমুদ্রের বাষ্পরাশি দিয়ে আকাশে অর্ধবৃত্তাকার ছাদ বা গম্বুজ তৈরি হয়। ঐ বাষ্পরাশি পরে মেঘে পরিণত হলে সেই মেঘ বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীতে ঝরে পড়ে।

কিন্তু আমার প্রশ্ন, শেলীর কবিতায় আছে :

Vaulted with all thy congregated might
Of vapours, from whose solid atmosphere
Black rain, and fire, and hail will burst : O, hear !

এতে কি জীবনানন্দের ভাষায়, হৃদয়ের ভিতর প্রতিভার নব নব সন্তান কলরব করে উঠবে?

এবার অন্য একটা কথা। জীবনানন্দ লিখেছেন :

আমি মুদ্রিত চোখ নিয়ে
তোমাকে অনুভব করি
মনে হয়, যেন সূর্যাস্তের জাফরান আলোয়
শাদা গোলাপের বাগান ছড়িয়ে রয়েছে মাইলের পর মাইল,
একটা সজনে গাছও নেই।

জীবনানন্দ এখানে গোলাপের বাগান ব'লে এত গাছ থাকতে সজনে গাছের কথা বললেন কেন? এ সম্পর্কে একটা কথা আমার মনে আসছে। সেটা এই—

পরিচয় পত্রিকায় জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতা প্রকাশিত হলে, তখন *শনিবারের চিঠি*-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাস ঐ কবিতা নিয়ে জীবনানন্দকে অত্যন্ত নির্মমভাবে

আক্রমণ করেছিলেন। জীবনানন্দ সজনীকান্তের দ্বারা ঐভাবে আক্রান্ত হয়ে তখন ঐ আক্রমণের একটা জবাব লিখেছিলেন। অবশ্য সে লেখা প্রকাশিত হয়নি, এই বইয়ে আগে এই নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

ঐ আলোচনায় আমি অনুমানেই দেখিয়েছি, জীবনানন্দের সেই লেখায় যে সজনে গাছ ছিল, সে ঐ আক্রমণকারী সজনীকান্ত দাসকে লক্ষ্য করেই জীবনানন্দ বলেছিলেন।

সজনীকান্ত বার বার জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে তাঁকে আক্রমণ ক'রে তাঁর মনের শান্তি নষ্ট করতেন বা বিঘ্নিত করতেন।

এখানে এই 'চিঠি এল' কবিতায় জীবনানন্দ প্রেয়সীর চিঠি পেয়ে এত আনন্দিত হয়েছিলেন বা এত মানসিক শান্তি লাভ করেছিলেন যে, তাঁর ঐ শান্তিকে বিঘ্নিত করবার জন্য মনের শান্তি ভঙ্গকারী সজনীকান্তের মতো তখন কেউ ছিলেন না। তাই কবি তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতা নিয়ে আক্রমণের জন্য সজনীকান্তকে যেমন সজনে গাছ বলেছিলেন, এখানেও ঐ আক্রমণকারী সজনীকান্তের কথা স্মরণ করেই, তাঁর প্রতি কিছুটা প্রতিশোধ নেবার জন্যই হোক বা তাঁকে কিছু হেয় করার জন্যই হোক ঐ সজনে গাছ বলেছিলেন।

না হলে গোলাপের বাগানের উচ্চারণের সঙ্গে 'এত গাছ থাকতে' এখানে সজনে গাছ-এর কথা বললেন কেন?

আগেই বলেছি— এই সজনে গাছের ব্যাখ্যা— এটা আমার অনুমান। সঠিক নাও হতে পারে।

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থে 'লোকেন বোসের জর্নাল' কবিতায়ও লোকেন বোসকে লেখা সুজাতার কিছু চিঠির উল্লেখ আছে। সেখানে লোকেন বোস কবি নিজেই বলে মনে হয়।

প্রৌঢ় বয়সের প্রেম সম্বন্ধে লেখা কবিতা

প্রেমের প্রকৃষ্ট সময় হ'ল যৌবন। যৌবনের পরে প্রৌঢ় বয়সে প্রেমিক-প্রেমিকার মনে যৌবনের সে উদ্দামতা আর থাকে না। তখন উভয়েরই মন অনেকটা শান্ত ও সমাহিত হয়ে আসে।

এই প্রৌঢ় বয়সেই প্রেমিকের মনে কখন কখন প্রেম জাগরিত হলেও, প্রেমিকার দিক থেকে কিন্তু এ ব্যাপারে বড় একটা সাড়া মেলে না। তাই ব'লে প্রেমিকা তার প্রেমিককে যে তখন অবহেলা বা প্রত্যাখ্যান করে তাও নয়। প্রেমিকার মনে তখন তার প্রেমিকের প্রতি যত্ন এবং দরদের ভাবটাই বরং বড় হয়ে দেখা দেয়।

আর প্রেমিক-প্রেমিকা ঐ বয়সে যদি একে অন্যের কাছ থেকে দূরে থাকে এবং দেখা সাক্ষাৎ না হয়, তাহলে তারা পরস্পরকে একরূপ ভুলতেই থাকে। প্রেমিকা তখন তার প্রেমিককে চিঠিপত্রও আর লেখে না এবং প্রেমিকও তার প্রেয়সীর পুরাতন প্রেমপত্র বার করে পড়ার ধৈর্যও হয়ত হারিয়ে ফেলে। প্রেমিক-প্রেমিকার ঠিকানা জানলেও তার খোঁজ নিতে তেমন ইচ্ছাও প্রকাশ করে না।

জীবনানন্দ তাঁর কয়েকটি কবিতায় প্রেমিক-প্রেমিকার প্রৌঢ় বয়সের এই সাক্ষাৎকার বা মিলনের এবং পরস্পরের দূরে থাকার চিত্র অতি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন।

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা গ্রন্থে 'লোকেন বোসের জর্নাল' নামে একটি কবিতা আছে। কবিতাটি নামে 'লোকেন বোসের জর্নাল' হলেও সমস্ত কবিতাটি উত্তম পুরুষের এক বচনের জবানীতে লেখা। তাই এটি লোকেন বোসের না হয়ে কবির নিজেরই জর্নাল বলা যেতে পারে।

এই কবিতায় এক জায়গায় আছে :

প্রৌঢ় হৃদয়, তুমি
সেই সব মৃগতৃষ্ণিকাতলে ঈষৎ সিমুমে
হয়তো কখনো বৈতাল মরুভূমি,
হৃদয়, হৃদয় তুমি!

...

সেখানে বালির সৎ নীরবতা ধূধূ
প্রেম নয় তবু প্রেমেরই মতন শুধু।

বনলতা সেন গ্রন্থের 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

... অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে,
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু ;...

এখানে দুজন হ'ল— কবি এবং তাঁর প্রেয়সী, আর হেমন্ত হ'ল— প্রৌঢ়ত্ব। তাই কবিও লিখেছেন :

... হেঁটে চলি... আজ কোনো কথা
নেই আর আমাদের; মাঠের কিনারে ঢের ঝরা ঝাউফল
পড়ে আছে; শান্ত হাত, চোখে তার বিকেলের মতন অতল
কিছু আছে ;...

কবি তাঁর প্রেয়সীকে এই সাক্ষাতের প্রথমেই বলেওছিলেন :

জানি আমি তোমার দু চোখ আজ আমাকে খোঁজে না
আর পৃথিবীর 'পরে—

বনলতা সেন গ্রন্থে 'দুজন' নামে একটি কবিতা আছে। এই দুজন হ'ল— এক প্রৌঢ় প্রেমিক ও তার প্রৌঢ়া প্রেমিকা। এই কবিতায় কবি আর নিজের জবানীতে না বলে দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার মুখ দিয়েই তাদের হৃদয়ের কথা বলিয়েছেন।

'অঘ্রাণ প্রান্তরে' কবিতায় কবির প্রেয়সী কবির আর খোঁজ করে না বলে, কবি প্রেয়সীর কাছে অভিযোগ করেছিলেন। 'দুজন' কবিতার, প্রেমিক-প্রেমিকা দুজনেই বয়সের গুণে কেউই কারও খোঁজ করা প্রয়োজন বোধ করেনি। তাই কবি প্রথমেই লিখেছেন :

আমাকে খোঁজ না তুমি বহুদিন— কতদিন আমিও তোমাকে
খুঁজি নাকো;— এক নক্ষত্রের নিচে তবু— একই আলো পৃথিবীর পারে
আমরা দুজনে আছি ; পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
প্রেম ধীরে মুছে যায়, নক্ষত্রেরও একদিন মরে যেতে হয়,
হয় নাকি?— বলে সে তাকাল তার সঙ্গিনীর দিকে,
আজ এই মাঠ সূর্য সহমর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে
প্রাণ তার ভরে গেছে।

এখানে সহমর্মী অঘ্রাণ-কার্তিকে তার প্রাণ ভরে গেছে, বলায় বোঝা যাচ্ছে, তারও জীবনে হেমন্ত অর্থাৎ প্রৌঢ়ত্ব এসেছে।

এই কবিতার প্রেমিকটির ন্যায় তাঁর প্রেমিকারও জীবনে তখন প্রৌঢ়ত্ব এসেছিল। তারও জীবনের প্রেম তখন শেষ হয়ে এলেও, সে কিন্তু তখন তার বিগত প্রেমের কথা বলেছিল। তাই সে তার সঙ্গীকে বলেছিল :

...পৃথিবীর পুরনো পথের রেখা হয়ে যায় ক্ষয়,
জানি আমি ;— তারপর আমাদের দুঃস্থ হৃদয়
কী নিয়ে থাকিবে বল ;— একদিন হৃদয়ে আঘাত ঢের দিয়েছে চেতনা
তারপর ঝরে গেছে ; আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না
হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের— প্রেমের অপূর্ব শিশু আরক্ত বাসনা
ফুরত না যদি, আহা, আমাদের হৃদয়ের থেকে—

মহাপৃথিবী গ্রন্থে 'জর্নাল ১৩৪৬' নামে একটি কবিতা আছে। এই কবিতায় কবি তাঁর প্রেয়সীকে লক্ষ্য করে বলেছেন :

আজকে অনেক দিন পরে আমি বিকেল বেলায়
তোমাকে পেলাম কাছে;

ঝাউফল ঝরে ঘাসে...
দুজনে হাঁটছি ভরা প্রান্তরের কোল থেকে আরো দূর প্রান্তরের ঘাসে।

এই কবিতায় কবি যদিও কোথাও হেমন্ত বা কার্তিক-অঘ্রাণের নাম করেন নি, তবুও 'অঘ্রাণ প্রান্তরে' কবিতার ন্যায়ই কবিতায় কবি ঝাউফল ঝরার কথা বলায়, বলা যেতে পারে হয়ত কবি এই কবিতায়ও পৃথিবীর বনে এবং তাঁদেরও মনে হেমন্ত আসারই ইঙ্গিত করেছিলেন।

যাই হোক, হেমন্তের কোনো কথা না থাকলেও, কবির, বিশেষ করে তাঁর প্রেয়সীর মনে যে হেমন্ত বা প্রৌঢ়ত্ব এসেছিল, সে কথা কবিই শেষে পরিষ্কার ভাবে বলেছেন। তিনি লিখেছেন :

রাত্রি হয়ে গেলে তার উৎসারিত অন্ধকার জলের মতন
কী-এক শান্তির মতো স্নিগ্ধ হয়ে আছে এই মহিলার মন।
হেঁটে চলি তার পাশে, আমিও বলি না কিছু, কিছুই বলে না ;
প্রেম ও উদ্বেগ ছাড়া অন্য এক স্থির আলোচনা
তার মনে;— আমরা অনেক দূর চলে গেছি প্রান্তরের ঘাসে

...

অন্ধকার থেকে খুঁজে কখনো আমার হাত একবার কোলে তুলে নিয়ে
গালে রেখে দিল তার ঃ 'রোগা হ'য়ে গেছো এত— চাপা প'ড়ে গেছো যে হারিয়ে
পৃথিবীর ভীড়ে তুমি— ' বলে সে খিন্ন হাত ছেড়ে দিলো ধীরে ;
শান্ত মুখে— সময়ের মুখপাত্রীর মতো সেই অপূর্ব শরীরে
নদী নেই— হৃদয়ে কামনা ব্যথা শেষ হয়ে গেছে কবে তার ;
নক্ষত্রেরা চুরি করে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর।

১৩৬০ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় 'এখন এ পৃথিবীর' নামে জীবনানন্দের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

'এখন এ পৃথিবীর গোধূলি সময়, আর আমাদের হৃদয়ের যেন বেলা শেষ'
বলে সে তাকাল;— চোখে করুণা রয়েছে তার ;
আকাঙ্ক্ষার সে সব আবেশ নেই আজ ;

...

হাত তার মনে হ'ল ভিজে-হিম এক আধ মুহূর্তের ছোঁয়ার ভিতর ;
উন্নতা নেইকো চোখে— শান্ত আলো— দু একটা ঝরা পাতা
আধো-খসা বিনুনীর পর
পড়ে আছে—

দেখলাম শাদা হাত— কেমন সম্পন্ন হীম— স্নিগ্ধ সব বোমকূপ— নিখুঁত শরীরে
স্বভাবকে অতিক্রম করে ফেলে রক্তের ইঙ্গিত মুখে গালে
নেই আজ; হৃদয় শান্ত স্থির;

...

আমার হৃদয়ে প্রেম— ধীরে ধীরে বাসনার নিশ্চয়তা আসে।
হয়তো তা বুঝেছে সে— তবু তার দিক থেকে যে চেতনা সাড়া
পেলে অর্থ পেয়ে যেত মানুষ মৃত্যুর অর্থ ছাড়া
সে প্রেম শরীর থেকে ফুরিয়ে গিয়েছে আজ তার ;

'অঘ্রাণ প্রান্তরে' কবিতায় কবি যেমন 'আমাদের দুজনের মনে হেমন্ত এসেছে' বলে প্রৌঢ়ত্বের কথা বলেছেন, এই কবিতায়ও কবির প্রেয়সী কবিকে 'আমাদের হৃদয়ের যেন বেলা শেষ' বলে তাদের প্রৌঢ়ত্বের কথাই বলেছেন।

এই প্রৌঢ়ত্বের জন্যই আজ আর কবির প্রেয়সীর আগের সে সব আকাঙ্ক্ষাও নেই। তার 'রক্তের ইঙ্গিত মুখে গালে নেই আজ : হৃদয় শান্ত স্থির ;'

তবে কবি প্রেয়সীকে মাঠের পথে সঙ্গিনী হিসাবে পেয়ে, তার নিখুঁত শরীরের হাত স্পর্শ করে এবং প্রেয়সীর প্রতি বার বার তাকিয়ে ঐ প্রৌঢ় বয়সেও তাঁর হৃদয়ে প্রেম— ধীরে ধীরে বাসনার নিশ্চয়তা এনেছিল। কিন্তু কবির প্রেয়সীর দিক থেকে এ ব্যাপারে কোনো সাড়া বা চেতনা ছিল না। কবির 'জর্নাল ১৩৪৬' কবিতার প্রেয়সীর মতই হয়ত এরও 'হৃদয়ে কামনা ব্যথা শেষ হয়ে গেছে কবে', নক্ষত্রেরা চুরি করে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর।

ব্যর্থ প্রেমের কবিতা

জীবনানন্দের কবিতাসমূহের মধ্যে ব্যর্থ প্রেমের কবিতা আছে অনেক। তাঁর প্রথম কাব্য-গ্রন্থ *ঝরা পালক*-এ ও এই রকমের কয়েকটি কবিতা আছে। *ঝরা পালক*-এ 'একদিন খুঁজেছিনু যারে' নামক কবিতায় কবি বলেছেন— তাঁর যৌবন শতদলে যখন পরিমল ফোটেনি এবং এক প্রিয়ার তরে যখন তাঁর বুকের ডাকাত কেঁদে মরছিল, সেই সময় তিনি মুসাফের মতো নানা স্থান ঘুরে এবং বহু জায়গায় খুঁজে খুঁজে একদিন তাঁর এক প্রিয়ার সন্ধান পেয়েছিলেন। কবির সেই প্রিয়া একদিন কবির প্রতি সহানুভূতি সম্পন্না হয়েও কবিকে ভুলে গিয়েছিল।

ঝরা পালক গ্রন্থের 'ওগো দরদিয়া' কবিতায় দেখা যায়, কবির যৌবনের এক নিশীথে জীবনের বাসন্তী উৎসবে তাঁর প্রিয়া তাঁর কাছে এসেছিল। কিন্তু পরে সে চলে যায়। আর দেখা দেয়নি।

কবির যে সব প্রেয়সী তাঁর কাছ থেকে চলে গেছে, তাদের কারও কারও সম্বন্ধে কবি এখনও আশা রাখেন যে, তারা হয়ত আবার তাঁর কাছে ফিরে আসবে। এই চলে যাওয়া প্রেয়সীদের কারও কারও সঙ্গে পরে কবির দেখাও হয়েছে। তখন তিনি জোর দিয়ে না বলে প্রেয়সীকে বলেছেন, তোমার ইচ্ছা হ'লে আবার এসো। এ ধরনের একটা কবিতা হ'ল *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র 'পঁচিশ বছর পরে'। এই কবিতায় কবি বলেছেন ·

শেষবাব তার সাথে যখন হয়েছে দেখা মাঠের উপবে—
বলিলাম— একদিন এমন সময়
আবার আসিও তুমি— আসিবার ইচ্ছা যদি হয়।—

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র '১৩৩৩' নামক কবিতাটিতে দেখি, কবি তাঁর চলে যাওয়া প্রিয়ার আসার আশায় বসে আছেন। তিনি বলেছেন :

...নক্ষত্রের তলে বসে আছি— সমুদ্রের জলে
দেহ ধুয়ে নিয়া
তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া!

এই কবিতায় আরও জানা যায় যে, কবির প্রিয়া বন্ধুহীনা হয়ে একা ছিল বলেই কবির কাছে এসেছিল এবং কবিব কাছে তার প্রেম নিবেদনও করেছিল। কবি লিখেছেন :

তোমার শরীর,—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার, তারপর মানুষের ভিড়
বাত্রি আর দিন
তোমাবে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানি না তা,

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র 'সহজ' কবিতায় কবি তাঁর কোনো প্রেয়সীর উদ্দেশে লিখেছেন :

নিঃসঙ্গ বুকের গানে
নিশীথের বাতাসের মতো
একদিন এসেছিলে,—
দিয়েছিলে একরাত্রি দিতে পারে যত!

এই কবিতা থেকে কবির সম্বন্ধে জানা যায়, কবির প্রিয়া কবি কাছ থেকে চলে গেলে কবি প্রিয়ার বিরহে খুবই দুঃখ কষ্ট ভোগ করেন। কবি প্রিয়ার খোঁজে কত দিন রাত্রি পৃথিবীর পথে পথে ঘুরেছেন। কবির এই প্রিয়ার প্রতি তাঁর প্রেম যে কত গভীর ছিল, তা জানা যায়, কবি যখন বলেন— আরও অনেক নারী তাঁর কাছে এসে প্রেম নিবেদন করলেও, কবি তাদের প্রেম গ্রহণ না করে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র 'কয়েকটি লাইন' কবিতায় কবির প্রিয়া তাঁকে ভুলে গেছে বলে, কবিও তাকে ভুলে যেতে চান, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেনানি।

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র 'প্রেম' কবিতায় দেখা যায়, কবি ক্ষণিকের তরে বা অল্পদিনের জন্য প্রেমের স্বাদ পেয়ে, পরে ঐ প্রেম ব্যাপারেই প্রচণ্ড আঘাত পেলেও, তিনি তাঁর প্রেমের অতীত স্মৃতি ভুলতে পারেননি। তিনি সেই প্রেমেরই স্মৃতি বহন করে চলেন।

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র 'বোধ' কবিতায় কবির প্রেয়সী শুধু চলে যায়নি, সে কবিকে ঘৃণা করে চলে গেছে। কবির প্রেয়সী তাঁকে ঘৃণা করে চলে গেছে, এমন কথা কবি এর আগে বা পরেও কোনো কবিতাতেই লেখেননি।

ধূসর পাণ্ডুলিপি-তে যতগুলো প্রেমের কবিতা আছে, তার কোনোটাতেই কবি তাঁর প্রিয়া বা প্রেয়সীর নাম উল্লেখ করেননি। তিনি সর্বত্রই তাদের 'তুমি' 'তুমি'ই বলে গেছেন। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালক* এবং *ধূসর পাণ্ডুলিপি* পর্যায়ের পরের ফসল বলে কথিত তাঁর *রূপসী বাংলা* গ্রন্থের প্রেমের কবিতাগুলিতেও কবি তাঁর প্রেয়সীদের 'তুমি'ই বলে গেছেন। *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র পরে প্রকাশিত বনলতা সেন গ্রন্থেই প্রথম কবির প্রেয়সীদের নাম উল্লেখ পাওয়া যায়। বনলতা সেন এবং অন্যান্য গ্রন্থে যেমন একাধিক নামের কবির প্রেয়সীর সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি 'তুমি' নামের আড়ালেও কবির একাধিক প্রেয়সী রয়েছে।

জীবনানন্দের অগ্রন্থভুক্ত ৪০টি বিভিন্ন ধরনের প্রেমের কবিতা নিয়ে ১৩৮০ সালের ভাদ্র মাসে (১৯৭৩ আগষ্ট) *সুদর্শনা* নামে আমি যে একটি বই করেছিলাম, তাতে ১৯৫৯ সালের *নবান্ন* পত্রিকা থেকে 'তুমি আজ' নামে একটি কবিতা সংগ্রহ করে দিযেছিলাম। ঐ কবিতার প্রথমেই জীবনানন্দ লিখেছিলেন :

তুমিই যদি চ'লে যাবে তবে
হরির নামের চেয়েও কেন বড় হয়ে রবে
তোমার জন্যে আমার ভালোবাসা,
অনন্তকাল বটের গাছে পাতার যাওয়া আসা
তুমি বুঝি যাবে একটি বারের জন্যে এসে?

ঐ *সুদর্শনা* গ্রন্থেই ১৩৬৬ সালের আশ্বিন সংখ্যা *কবিতা* পত্রিকা থেকে 'মনকে আমি নিজে' নামের একটি কবিতা নিয়েও দিয়েছিলাম। ঐ 'মনকে আমি নিজে' কবিতার শেষ দিকে জীবনানন্দ লিখেছেন :

মরণ নদী মুছে জীবন নদীর পটভূমি
জেনেছে এই নিখিলে শুধু রয়েছো একা তুমি।
যদি এমন চলে যাবে তবে

কালের মহাসাগর হ'য়ে রবে
আমাব হাতের অঞ্জলি
মন ছাড়া কেউ বোঝে না তাই মনকে আমি বলি।

ভারবি থেকে প্রকাশিত *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা* গ্রন্থে 'রাত্রিদিন' নামে একটি কবিতা আছে। এই কবিতা থেকে জানা যায়, কবির সুখে দুঃখে তাঁর প্রিয়া ছায়ায় মতই তাঁর পাশে ছিল। তখন কবি তাঁর জীবনকে 'শিশিরের মতো স্বচ্ছতায়' সত্য বলে অনুভব করেছিলেন।

কবি বলেছেন, তখন তাঁরা যেন কোনো নীল নতুন সাগরে ছিলেন। সেই নতুন সাগরে থাকার সময় তাঁরা যেন ঝিনুকের ঘরে জোড়া মুক্তো হয়ে বাস করছিলেন। কিন্তু পরে 'সেই জোড়া মুক্তো মিথ্যে বন্দরে বিকিয়ে গেল হায়।'

অপরের প্রভাবে বা সময়ের গতিকে (কালক্রমে) কবির সঙ্গে তাঁর প্রিয়ার এই যে বিচ্ছেদ হ'ল, কবি অনেক দিন পরে এ সম্বন্ধে বুঝেছিলেন, সময় অনন্ত হলেও প্রেম অনন্ত নয়, তাই তিনি বললেন :

অনেক মুহূর্ত আমি ক্ষয
ক'রে ফেলে বুঝেছি সময়
যদিও অনন্ত, তবু প্রেম সে অনন্ত নিয়ে নয়।

প্রেম অনন্ত নয়, একথা কবি বুঝলেও, তিনি এও বুঝেছেন যে, তাঁর সাময়িক প্রেম সব সময়ের জন্যই তাঁর হৃদয়ে জাগরুক হয়ে থাকে। তাই তিনি বললেন :

তবুও তোমাকে ভালোবেসে
মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এসে
বুঝেছি অকূলে জেগে রয়
ঘড়ির সময়ে আর মহাকালে যেখানেই রাখি এ হৃদয়।

'পৃথিবীতে থেকে' কবিতায় দেখছি যে, কবি একটি নারীকে ভালবেসে ছিলেন। কবি জানতেন, সেই নারীকে আরো অনেকে ভালবেসেছে :

...তোমারে দেখেছে ভালোবেসেছে অনেকে
তাহাদের সাথে আমি...

তবুও কবি তাদের মতন ঐ নারীকে ভালবেসেছেন।

কবির মন যখন ঐ নারীর আবেশে ভরে ছিল এবং তিনি যখন তাঁর ঐ প্রেয়সীকে কাছে ডাকতেন বা ডেকে নিতেন, তখন তাঁর মনের অবস্থা কিরূপ হ'ত, সে সম্বন্ধে কবি নিজেই বলেছেন :

১ ..*একদিন পৃথিবীতে তোমাব আবেশে*
যখন আমার মন ভরে ছিল, মনে হ'ত চলেতেছি ভেসে
জ্যোৎস্নার নদীতে এক রাজহাঁস রূপোলি ঢেউযের পথ ধ'রে
কোন্ এক চাঁদের দিকে অবিরল— মনে হ'ত আমি সেই পাখি ;

২. ...*তোমারে কাছে ডেকে*
মনে হয় যেন শান্ত মালযের সমুদ্রেরে পেল পাখি—

কবি মৃত্যুদিন পর্যন্তও এই নারীকে ভালবেসে যাবেন। কবি ঐ নারীকে ভালবাসলেও, ঐ নারী কিন্তু কবিকে ভালবাসেনি। কবি নিজেই বলেছেন :

তুমি প্রেম দাও নাই— জানি আমি।

প্রেম না দিলেও তবে কবির সঙ্গে ঐ নারীর অনেকবার দেখা হয়েছে। তখন কবি কিন্তু ঐ নারীর হৃদয়ে কোনোদিন কোনো বেদনা দেননি। তিনি বলেছেন :

...*কোনোদিন বেদনা কি দিযেছি হৃদয়ে*
যতদিন পৃথিবীতে তোমাব আমার সাথে হযেছিল দেখা!

কবি ভেবেছেন, তিনি এই যে এই নারীকে এত ভালবেসে গেলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে এজন্য তাঁর প্রেয়সী হয়ত একদিন তাঁকে স্মরণ করতেও পারে বা তাঁর জন্য ঐ নারী মনে ব্যথা পেতেও পারে। তাই যদি হয়, তাহলে কবি কিন্তু এজন্য তাঁর প্রেয়সীকে ব্যথা না পাওয়ার কথাই জানিয়েছেন। তিনি লিখেছেন :

...*সব থেকে স'রে*
যখন ঘুমাব আমি মাটি ঘাসে— সেইখানে একদিন এসে
হয়তো অজ্ঞানে তুমি মাথা নেড়ে বলিবে— 'আমারে ভালোবেসে
ব্যথা পেলে; আমি আজও ভাল আছি— তবুও গিয়েছে আহা ঝরে
সেই প্রাণ,— হয়তো ভাবিবে এই— তবু একবার চুপ করে
ভেবে দেখো সে কী ছিল—

কবি আরও বলেছেন :

...*আমি চলে গেলে পরে মনে কর যদি খুব একা*
একা হয়ে গেছ তুমি— ভাব যদি কোথায় সে ঘাসের আশ্রয়ে
চলে গেল— ভালোবেসে, মৃত্যু পেয়ে ; এই ব্যথা ভয়ে
জেগে থাক যদি তুমি অন্ধকারে— সেজো নাকো ব্যথার রেবেকা।

'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতায় আছে— কবি একটি নারীকে যাকে তিনি ভালবাসেন, তাকে ভালবেসে যাবেন।। বলেছেন এবং আশা করেছেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে ঐ নারী হয়ত সেদিন তাঁকে স্মরণ করবে। তিনি বলেছেন :

তুমি ত জান না কিছু, না জানিলে
আমাব সকল গান তবুও তোমাকে লক্ষ্য করে!

যে নারীকে তিনি ভালবাসেন, তার কাছ থেকে কোনো সাড়া না পেয়ে, তিনি যে ব্যথা পেয়েছেন, তা তিনি এই *নির্জন স্বাক্ষর* কবিতায় বলেছেন। তাই তিনি লিখেছেন :

জীবনেব স্বাদ লযে জেগে আছো— তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে
পার তুমি!

এই ধরনের কবিতায় কখন তিনি তাঁর ঐ মানস প্রেয়সীর কাছ থেকে স্পষ্ট করে শুনে নিতে চেয়েছেন, সে তাঁকে ভালবাসে, না অন্য কাউকে ভালবাসে, না কাউকেই ভালবাসে না। যেমন— *বেলা অবেলা কালবেলা* গ্রন্থের 'যদিও দিন' কবিতায় তিনি লিখেছেন :

এ কথা যদি জলের মতো উৎসাবণে তুমি
আমাকে— তাকে— যাকে তুমি ভালোবাস তাকে
ব'লে যেতে ;— শুনে নিতাম মহাপ্রাণের বৃক্ষ থেকে পাখি
শোনে যেমন আকাশ-বাতাস বাতের তারকাকে।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র যে ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়, তাতে জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি*-র সময়কার রচনা আরও ১৫টি কবিতা যুক্ত করা হয়েছে। ঐগুলির মধ্যে এখানে আলোচিত এই 'পৃথিবীতে থেকে' কবিতাটিব ন্যায় 'এই শান্তি' নামে আর একটি কবিতা আছে। ঐ কবিতায় কবি লিখেছেন :

এইখানে একদিন তুমি এসে বসেছিলে, তারপর কতদিন আমি
তোমারে রয়েছি ভুলে— একদিন তুমি এসে বসেছিলে কখন এখানে
মুছেছে জীবন থেকে...

কবি প্রিয়া-বিরহে এই বেদনা ভুলে প্রকৃতিকে ভালবেসে তাতে শান্তি পেয়েছেন। তাই তিনি লিখেছেন :

...আমি ভালোবাসিয়াছি— সেই সব ভালোবাসা প্রাণে
বেদনা আনে না কোনো— তুমি শুধু একদিন ব্যথা হয়ে এসেছিলে কবে
সে দিকে ফিরিনি আর— চড়ুয়ের মতো আমি ঘাস খড় পাতার আহ্বানে
চলে গেছি : এ-জীবন কবে যেন মাঠে-মাঠে হয়ে রবে
নীল আকাশের নিচে অঘ্রাণের ভোরে এক— এই শান্তি পেয়েছি জীবনে।

তবুও এক সময়ের ঐ প্রিয়ার কথা মনে পড়লে, কবির মন বেদনায় আবার

ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। শেষে ঐ প্রকৃতির মধ্যেই অবশ্য তিনি শান্তি ফিরে পান। তিনি লিখেছেন :

একদিন— হেমন্তের সারাদিন তবুও বেদনা এল— তুমি এলে মনে
. . . তারপর তবু শেষে শান্তি এল মনে
যখন বেগুনি নীল প্রজাপতি কাঁচপোকা আবার নেমেছে মাঠে বনে।

মহাপৃথিবী গ্রন্থের 'ফিরে এস' এবং *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থের 'আকাশলীনা' কবিতায় কবির প্রেয়সীরা তার কাছ থেকে চলে যাওয়ায়, কবি তাদের ফিরে আসবার জন্য ডাকছেন। কবির এই প্রেয়সীরা ফিরে এসেছিল কিনা জানা যায়নি। 'আকাশলীনা' কবিতায় কবি লিখেছেন :

সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়ো নাকো তুমি,
বোলো নাকো কথা অই যুবকের সাথে ,
ফিরে এসো সুরঞ্জনা ;

জীবনানন্দের এই ধরনের ব্যর্থ প্রেমের কবিতাগুলিতে একটা বড় জিনিস লক্ষ্য করা যায় এই যে, যেখানে কবির প্রেয়সী কবিকে ছেড়ে অন্য পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করছে, বা অন্য পুরুষকে ভালবাসছে— কবি এ কথা জেনে এমন কি দেখেও প্রেয়সীর প্রতি রাগে ফেটে পড়েননি। আর কবি তাঁর প্রেমের প্রতিদ্বন্দ্বীর উপরও ক্রোধ প্রকাশ করেননি। এমন কি এজন্য নিজের মনেও তেমন কোনো জ্বালা অনুভব করেননি।

মৃতা প্রেয়সীদের উপর লেখা কবিতা

জীবনানন্দ তাঁর বহু কবিতায় মৃতা প্রেয়সীদের কথা লিখে গেছেন। এমন কি তিনি তাঁর কৈশোরের মৃতা বান্ধবীর কথাও লিখতে ভোলেননি।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ *ঝরা পালক*-এ 'ছায়াপ্রিয়া' নামে একটি কবিতা আছে। এই কবিতায় দেখা যায়— কবির কিশোর কালের কিশোরী বান্ধবী কবে মারা গেছে। সে মারা গেলেও কবি কিন্তু তাকে ভুলতে পারেননি। তিনি তাকেই জীবন-ভোরের সঙ্গিনী করে রেখেছেন। পৌষ মাসের এক দুপুর রাতে কবি তাঁর ঘরে তাঁর ঐ মৃতা বান্ধবীর অস্তিত্বও অনুভব করেছিলেন। কবি লিখেছেন :

আজকে রাতে কে ঐ এল
কালের সাগর সাঁতরি!
জীবন-ভোরের সঙ্গিনী সেই,
মাঠে ঘাটে আজকে সে নেই।

কোন্ তিয়াসায় এল রে হায়
মরণ পারের যাত্রী।
কালের সাগর সাঁতৃরি।

জীবনানন্দের *বনলতা সেন* গ্রন্থে 'তুমি', 'ধান কাটা হয়ে গেছে' এবং 'শিরীষের ডালপালা' নামে পর পর ৩টি কবিতা আছে। 'তুমি' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছ তুমি।
মাটির অনেক নীচে চলে গেছ? কিংবা দূর আকাশের পারে
আজ তুমি? কোন্ কথা ভাবছ আঁধারে?
ঐযে ওখানে পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে :
মনে হয় তুমি যেন ঐ পাখি—

'ধানকাটা হয়ে গেছে' কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছেন :

ঐখানে একজন শুয়ে আছে— দিনরাত দেখা হ'ত কত কত দিন
হৃদয়ের খেলা নিয়ে তার কাছে করেছি যে কত অপরাধ ;
শান্তি তবু : গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

'শিরীষের ডালপালা' কবিতায় লিখেছেন :

...তার মুখ মনে পড়ে এ রকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর
পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে ; চারিদিকে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন
এখন দয়ার মতো ; তবুও দয়ার মানে মৃত্যুতে স্থির
হয়ে থেকে ভুলে যাওয়া মানুষের সনাতন মন।

এখানে উদ্ধৃত কবিতা ৩টি কবির মৃতা প্রেয়সীদের উদ্দেশ্য করে লেখা বলেই মনে হয়।

মহাপৃথিবী গ্রন্থের 'শব' কবিতায় কবি তাঁর মৃতা প্রেয়সী মৃণালিনী ঘোষালের কথা এবং *সাতটি তারার তিমির* গ্রন্থের 'সপ্তক' কবিতায় কবি তাঁর মৃত প্রেয়সী সরোজিনীর কথা লিখে গেছেন।

অনুক্ত পত্রিকার ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় (১৩৬২ মাঘ-চৈত্র) জীবনানন্দের 'হে জননী, হে জীবন' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবির প্রেয়সী নীহারিকা মিত্র চোখ বুজে ফুরিয়ে যাওয়ায় বা মারা যাওয়ায় কবি এই কবিতায় সৃষ্টির আদি শক্তিকে জননী হিসাবে সম্বোধন করে তাঁর কাছে কিছুটা অনুযোগ করেছেন। যে বেদনা ও কাতরতার সহিত কবি অনুযোগ করেছেন, তাতে নীহারিকা মিত্র কবির প্রেয়সী ছিল বলেই মনে হয়।

১৩৬৪ সালের চৈত্র সংখ্যার *কবিতা* পত্রিকায় 'শবের পাশে' নামে জীবনানন্দের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।

এই কবিতায় কবি একটি মৃতা নারীর কথা বলেছেন। এই নারী কবির পরিচিতা ছিল, তবে সে কবির প্রেয়সী ছিল কিনা স্পষ্ট জানা যায়নি। যাই হোক ঐ কবিতার কিছুটা এই :

কোন এক অন্ধকার লাইব্রেরির নিস্তব্ধ হলুদ পাণ্ডুলিপির মতো
দেখলাম তাকে,
শ্রাবণের রৌদ্রে রেবা নদীর মতো ছিল যে একদিন,
সে আর ঘুমোবে না কোনো দিন
স্বপ্ন দেখবে না ;

...

এই নারী আজ নিস্তব্ধ ;
মনে হয় যেন কোনো সুদূর দ্বীপে ঘুম রয়েছে শুধু;
এর দেহের ভিতর বিবর্ণ দারুচিনি ছালের গন্ধ
এর মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়
কোনো অসীম নির্জনতাব ভিতবে উঁচু উঁচু গাছেব ধীর আলোড়ন যেন
(আরো নিস্তব্ধ)
এই মৃতার শরীরে সেই দূর দ্বীপের সবুজ শব্দ-স্বাদ-ছায়া রৌদ্রের-বুনুনি,
আমলকী গাছে কোকিল এই নিষ্পাপ স্রোত অনুভব করেছে
তাই সে ধূসর সম্রাটের জন্যে সংগীত খুঁজতে চলে গিয়েছে।

অপরের প্রেম নিয়ে লেখা কবিতা

জীবনানন্দের প্রেমের কবিতাগুলির মধ্যে মাত্র অল্প কয়েকটিতে তিনি তাঁর নিজের ও তাঁর প্রেয়সীর কথা বাদে অপর নর-নারীর কথা বলেছেন। সেই কবিতা ক'টি, যেমন— *বনলতা সেন* গ্রন্থের 'দুজন', *শ্রেষ্ঠ কবিতা* গ্রন্থের 'লোকেন বোসের জর্নাল' ইত্যাদি। লোকেন বোসের জর্নাল কবিতায় সুবল ও অমিতার ভালবাসার কথা বাদে, অপর অংশে জীবনানন্দ যেখানে উত্তম পুরুষের এক বচনের জবানীতে সুজাতার সঙ্গে প্রেমের কথা বলেছেন, সেখানে তিনি নিজেই যে লোকেন বোসের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে বলেননি, তা জোর করে বলা যায় না।

তবে তিনি মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণী এমন কি প্রকৃতির কোনো কোনো উপাদান নিয়ে কবিতা লিখতে গিয়েও মাঝে মাঝে প্রেমের চিত্র এঁকেছেন। তাতে প্রসঙ্গত

মানুষ-মানুষী এলেও কোথাও পক্ষী পক্ষীণী এসেছে, কোথাও হরিণ-হরিণী এসেছে, আবার কোথাও বা নিছক অচেতন প্রকৃতিকেই মানুষ-মানুষীরূপে কল্পনা করে প্রেমের চিত্র ফুটিয়েছিল।

দুপুর বেলায় ডাহুকীর ডাক শুনে কবির মনে ডাহুকীর বিরহের কথা মনে এসেছে, তাই তিনি তাঁর *ঝরা পালক* গ্রন্থের 'ডাহুকী' কবিতায় লিখেছেন :

হারাযেছে প্রিযেবে কি? অসীম আকাশে
ঘুরেছে অনন্তকাল মরীচিকা আশে?

ঝরা পালক এর 'মিশর' কবিতায় মিশরের মরু, বালু, পিরামিড, নীলনদ প্রভৃতির কথা বলতে বলতে কবি মিশরের যুবতীদের প্রেমের কথাও বলেছেন :

মিশর ছুঁড়ি গাইছে মিঠা শুঁড়িখানার সুরে
বালুর খাতে, প্রিযের সাথে— খেজুর বনে দূরে।

ঝরা পালক-এর 'মরীচিকার পিছে' কবিতাতেও ঊষর, ধূসর মরুর কথা বলতে বলতে কবি মরীচিকাকে নারীরূপে কল্পনা করে বলেছেন :

কোন্ যেন পরী চেয়ে আছে দুটি চঞ্চল চোখ তুলে!

এই বইয়ের 'আলেয়া' কবিতায় কবি আলেয়াকে মানুষের মতো কল্পনা করে প্রিয়ার সন্ধানী ও বিরহী করেছেন। যেমন,

কারে কবে বেসেছিলে ভালো
হে ফকির,— আলেয়ার আলো!— ইত্যাদি।

এই বইয়ের 'দক্ষিণা' কবিতায় কবি পশু, পক্ষী প্রকৃতি কত কি নিয়েই না তাদের প্রণয় চিত্র এঁকেছেন!

প্রিয়ার গালেতে চুমো খেয়ে যায় চকিতে পিয়াল রেণু!
এল দক্ষিণা,— কাননের বীণা,— বনানী পথের বেণু।
তাই মৃগী আজ মৃগের চোখেতে বুলায়ে নিতেছে আঁখি,
বনের কিনারে কপোত আজিকে নেয় কপোতীরে ডাকি।

কবি এখানে 'দখিণা' বাতাসকে নাগর এবং যামিনীকে নাগরী করে তাদের একটি মিলনের চিত্রও এঁকেছেন।

'চাঁদনীতে' কবিতায় কবি অপরের প্রেমের কথা বলতে গিয়ে নিজেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপে দূরে রাখতে পারেননি। প্রথম দিকে বললেন :

হয়তো তাহারা আমাদেরি মত মধু-উৎসবে উঠিত মেতে' ইত্যাদি।

'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' কবিতায়ও কবি রাজার দুলালের প্রণয় কাহিনী বলতে গিয়ে লিখেছেন— রাজার দুলাল তাঁকেই তার প্রণয় কাহিনী শুনিয়েছিল।

এই কবিতাটি একটি রূপক কবিতা বলে মনে হয়। রাজার দুলাল এখানে কবি নিজেই। রূপক হোক আর নাই হোক এই কবিতাটিকে কিন্তু কবি শেষ পর্যন্ত একটি পরিপূর্ণ সার্থক প্রেমের কবিতা করলেন না।

ক্যাম্পে কবিতার বিষয়বস্তু বা মূল সুর যদিও ভিন্ন, তবুও বসন্তের জ্যোৎস্না রাতে ঘাই হরিণী যে পুরুষ হরিণদের কাছে ডাকে, তাতে হরিণ-হরিণীর প্রেমের কথাও আছে। যেমন,

ঘাইমৃগী সারারাত ডাকে

...

পুরুষ-হরিণ সব শুনিতেছে শব্দ তার
তাহারা পেতেছে টের
আসিতেছে তার দিকে!
আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে।

জীবনানন্দ প্রেমের কবিতাগুলি নিয়ে এখানে আলোচনা করে দেখা গেল যে, প্রিয়ার সহিত মিলনের বা সাক্ষাতের কবিতাগুলিতে জীবনানন্দ ভাষা ও ভাবের দিক থেকে যেমন অসাধারণ সংযম ও শালীনতাবোধের পরিচয় দিয়েছেন, প্রিয়ার সহিত বিচ্ছেদের কবিতাগুলিতেও ঠিক তেমনি কোথাও তিনি হা-হুতাশ ও কাতরতার বাড়াবাড়ি আদৌ দেখাননি।

জীবনানন্দের প্রেয়সীর চিঠি পেয়ে লেখা কবিতাটি বক্তব্যে, ভাষায়, বর্ণনায়, উপমায় অপূর্ব। তাঁর প্রৌঢ় বয়সের প্রেমের কবিতাগুলিও বাংলা সাহিত্যে নতুনত্বের দাবী করতে পারে।

উপমা প্রকাশভঙ্গি প্রভৃতিতে জীবনানন্দের প্রেমের কবিতাগুলি বাংলা সাহিত্যে অসাধারণ।

জীবনানন্দের ব্যবহৃত উপমা ও বিশেষণ

উপমা

সাহিত্যিকরা তাঁদের লেখায় বক্তব্যকে সহজতর ও সুন্দরতর করার জন্যই সাধারণত উপমার ব্যবহার করে থাকেন। জীবনানন্দও মূলত এই কারণেই তাঁর কবিতায় উপমার ব্যবহার করে গেছেন। তবে উপমা দেওয়ার জন্য জীবনানন্দের একটা স্বাভাবিক ও প্রবল ঝোঁক ছিল বলেই তিনি প্রায় কথায় কথায় উপমা ব্যবহার করেছেন। তাঁর কবিতায় কখনো কখনো এমনও দেখা যায় যে, তিনি কোনো কবিতায় লাইনের পর লাইন এক একটা নতুন নতুন উপমা দিয়ে দিয়ে লিখে গেছেন।

জীবনানন্দের এই উপমা ব্যবহারের কথা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু তাঁর *কালের পুতুল* গ্রন্থে লিখেছেন :

> মনে পড়ে বহুকাল পূর্বে জীবনানন্দ কোনো এক পত্রিকায লিখেছিলেন উপমাই কবিত্ব। এ কথাটাকে কিছুটা অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও মেনে নেওয়া অসম্ভব হয না।

বুদ্ধদেববাবু কোথায় কোন্ প্রবন্ধে জীবনানন্দের এ কথা পড়েছিলেন, তা বলেননি।

জীবনানন্দের বরিশাল কলেজের এক ছাত্র শামসুদ্দিন আহমদ (পরবর্তীকালে একজন কবি) তাঁর এক প্রবন্ধে জীবনানন্দের উপমা দেওয়ার প্রবণতার কথাও লিখেছেন।

এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, কবি হিসাবে তিনি এই উপমার উপর একটা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। কারণ, মনে হয় তিনি ভাল রকমই জানতেন যে, উপমার ব্যবহারে বক্তব্যকে যেমন সহজতর ও স্পষ্টতর করে, তেমনি সুন্দরতরও করে। এইজন্য বোধ করি তাঁর কাব্যে উপমার এত বেশি ছড়াছড়ি।

জীবনানন্দের ব্যবহৃত উপমাগুলি সম্বন্ধে একটা বিষয় লক্ষ্য করার এই যে, এই উপমাগুলি প্রায় সবই নতুন নতুন ধরনের। জীবনানন্দের পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক কবিরা তাঁদের কাব্যে যে ধরনের উপমা ব্যবহার করেছিলেন বা করতেন, জীবনানন্দ সে সব উপমা নিতেন না।

আর একটা কথা, জীবনানন্দের উপমা নতুন ধরনের হলেও, তা যে অসঙ্গত বা বে-সুরো হয়েছে, তাও নয়। বরং উপমাগুলি বাংলা সাহিত্যে যেমন অভিনব, তেমনি সুসঙ্গত এবং সুখপাঠ্যও।

জীবনানন্দ একজন সুদক্ষ চিত্রকরের মতো ছবি এঁকে এঁকে তাঁর কবিতায় উপমা বসাতেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধে বলেছেন, 'চিত্ররূপময়— লেখায় রস আছে, স্বীকয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।'

উপমা সংগ্রহের জন্য জীবনানন্দের কবি মন অতি নিকট বা নিকট থেকে শুরু করে, দূর ও অতি দূর, এমন কি পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন স্থান পর্যন্তও ভ্রমণ করেছে। আর তা বর্তমানেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, তা অতীত থেকে সুন্দর অতীত পর্যন্ত বিচরণ করেছে। এ জন্য তিনি বর্তমান ও অতীতের ইতিহাস, ভূগোল, প্রত্নতত্ত্ব প্রভৃতি থেকে যেমন তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তেমনি স্বদেশের এবং বিদেশেরও পুরাতন লোক সাহিত্য, প্রবাদ প্রভৃতি থেকেও উপাদান নিয়েছেন।

এখানে জীবনানন্দের কাব্যে তাঁর ব্যবহৃত কিছু উপমার উদাহরণ দেওয়া যাক :

১. *খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষিয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে— গান*
গায়— গান গায় এই দুপুরের বাতাস ;

'আমাকে তুমি', *বনলতা সেন*

২. *চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,*
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ;...

'বনলতা সেন', *বনলতা সেন*

৩. *প্রতিদিন ভোর আসে ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ ;*

'মৃত্যুর আগে', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*

৪. *শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে*
অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকের ভোরে ;

'অবসরের গান', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*

৫. *অপরাহ্নে রাঙা রোদ সবুজ আতায়*
রেখেছে নরম হাত যেন তার— ঢালিছে বুকের থেকে দুধ।

'রূপসী বাংলা'

৬. *সোনালী রোদের রং দেখিয়াছি, দেহের প্রথম কোন্ প্রেমের মতন রূপ তার*

'রূপসী বাংলা'

৭. *হেমন্তের নদী,— ঢেউ ক্ষুধিতের মতো এক সুরে*
হতাশ প্রাণের মতো অন্ধকারে ফেলিছে নিঃশ্বাস,—

'অনেক আকাশ', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*

৮. *কাচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল*
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে!

'পরস্পর', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*

৯. *শ্বেতাঙ্গ দম্পতি সব সেইখানে সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো*
সময় পোহায়ে যায় ;

'নিরঙ্কুশ', *সাতটি তারার তিমির*

১০. *মহাসাগরের জল কখনো কি সৎবিজ্ঞাতার মতো হয়েছিলো স্থির—*

'বিভিন্ন কোরাস', *সাতটি তারার তিমির*

বাসন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা* গ্রন্থে 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা' অধ্যায়ে জীবনানন্দের কবিতায় উপমার কথা বলতে গিয়ে লিখেছেন :

উপমার জন্য জীবনানন্দ বিখ্যাত। কিন্তু তাঁর অন্যমনস্কতা অন্তত একটি কবিতায় তাঁর একটি অতি সুন্দর উপমাকে নষ্ট করে দিয়েছে।
একটি তারা এখনো আকাশে রয়েছে :
পাড়াগাঁর বাসর ঘরে সব চেয়ে গোধূলিমদির মেয়েটির মতো ;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে মুক্তা
আমার নীল মদের গেলাসে রেখেছিল
হাজার হাজার বছর আগে এক রাতে তেমনি—
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও।

পৃথকভাবে প্রথম উপমাটি যতখানি সার্থক, দ্বিতীয় উপমাটি ততখানি নয়, তাছাড়া নির্জন রাত্রি শেষের পরিবেশে প্রথম উপমাটি যে প্রশস্ত ইঙ্গিত ছড়িয়ে দেয়, তার সঙ্গে দ্বিতীয় উপমাটির প্রভাবের তুলনা হয় না। নির্জন ভোরের প্রশান্তি বর্ণনায় উপমার ভিড়ও অবাঞ্ছনীয়। সুতরাং দ্বিতীয় উপমাটি বাদ দিলেই বোধ হয় ভাল হোত। প্রথম উপমার রহস্যের পাপড়ি খুলতে দ্বিতীয়টি কোনো সাহায্য তো করেই না, বরং দ্বিতীয়টির অনাবশ্যক জমকালো উপস্থিতিতে গোধূলি মদির মেয়েটি লজ্জায় কুঁকড়ে যায়।

বাসন্তীবাবুর আলোচ্য এই উপমা দুটি আছে, জীবনানন্দের *বনলতা সেন* গ্রন্থের 'শিকার' কবিতায়।

বাসন্তীবাবু বলেছেন— জীবনানন্দের অন্যমনস্কতা একটি অতি সুন্দর উপমাকে নষ্ট করে দিয়েছে। এই বলে তিনি উপরে আলোচ্য দ্বিতীয় উপমাটির কথা বলেছেন।

এ সম্বন্ধে আমার বক্তব্য— জীবনানন্দ অন্যমনস্ক হয়ে নয়, এক মনস্ক হয়েই, ঐ দ্বিতীয় উপমাটিও লিখেছিলেন। এখন এই উপমায় নষ্ট হবার মতো কিছু আছে কিনা দেখা যাক— জীবনানন্দ উপমায় নীল আকাশের তারাকে বলেছেন, নীল মদের গেলাসে রাখা মুক্তা। আর ভোরের ঐ শেষ তারাটি, যেটি কতকটা ম্লান বা ধূসর, সেটা বোঝাবার জন্য বলেছেন— হাজার হাজার বছর আগে নীল মদের গেলাসে রাখা মুক্তা।

এখানে দ্বিতীয় উপমাটি জমকালো হলেও অসংগত হয়েছে বলে তো আমার মনে হয় না।

জীবনানন্দ তাঁর অনেক কবিতায় কোনো জিনিসকে ভালভাবে বোঝাবার জন্য সেটা নিয়ে পর পর একাধিক উপমাও দিয়ে গেছেন। এখানে তিনি ঐরূপ পর পর দুটি উপমা দিয়েছেন। এতে প্রথম উপমার রহস্যের পাপড়ি খোলার সঙ্গে দ্বিতীয় উপমার সম্পর্ক থাকবে কেন? আর এখানে দ্বিতীয় উপমার জন্য প্রথম উপমার গোধূলি মদির মেয়েটি লজ্জায় কুঁকড়ে যাবেই বা কেন?

জীবনানন্দ *বনলতা সেন* গ্রন্থে 'হাওয়ার রাত' কবিতায় এক আশ্চর্য রাতের কথায় আকাশের 'সমস্ত নক্ষত্র' ও 'বিশাল আকাশ' নিয়ে এইরূপ পর পর দুটা উপমা দিয়েছেন :

> অন্ধকাব রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিল পুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো
> ঝলমল্ করছিল সমস্ত নক্ষত্রেরা ;
> জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়েব ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
> শালেব মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ!

অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিল পুরুষের শিশির ভেজা চোখ কি রকম থাকে সে সম্বন্ধে নিছক অনুমান ছাড়া কেউ তা জানে না। এমন কি জীবনানন্দও জানতেন না। তবুও সেই চোখকে আকাশের ঝলমল করা সমস্ত নক্ষত্রের সঙ্গে তুলনা করায় বা উপমা দেওয়ায় তা বুঝতে কষ্ট হয় না, বরং পড়তে বেশ ভালই লাগে।

জ্বলজ্বল করা বিশাল আকাশের সঙ্গে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের উজ্জ্বল চামড়ার শালের তুলনাও বুঝতে তেমন অসুবিধা হয় না। কিন্তু সে রাতের আকাশ ঝলমল করা নক্ষত্রে ভরা ছিল। তাই জীবনানন্দ না বললেও এখানে অনুমান করতে হবে—রাণীর ঘাড়ের চামড়ার শাল যা আকাশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, সেই শালে নিশ্চয়ই আকাশের তারার মত মুক্তা বা ঐ জাতীয় উজ্জ্বল কিছু ছিলই। যাই হোক, এই উপমা বা চিত্রকল্পও পড়তে ভালই লাগে।

বাসন্তীবাবু তাঁর ঐ প্রবন্ধে অন্যত্র লিখেছেন :

> মগ্নচৈতন্যের গভীরে ডুব দিয়ে কবি যে-সকল চিত্রকল্প অথবা প্রতীক আহরণ করে নিয়ে আসেন, সাধারণত যুক্তির পারম্পর্যের উপর নির্ভর না করে সরাসরি তাদের সাজিয়ে যে সকল কবিতা রচনা করা হয় মোটামুটি তাদেরই নাম সুররিয়ালিষ্ট কবিতা। সেখানে একটি চিত্রকল্প অন্য একটি চিত্রকল্পকে টেনে নিয়ে আসে। এই চিত্রকল্পগুলির নিকট সাদৃশ্য নেই, হয়ত বা আছে একটা দূর সাদৃশ্য। প্রত্যেক মানুষেরই স্বপ্ন জগতের অভিজ্ঞতা আছে। স্বপ্নের জগতে যেমন বাস্তব অভিজ্ঞতাগুলি পরিবর্তিত হয়ে নতুন রূপ গ্রহণ করে, কবিতাতেও চিত্রকল্পগুলি তেমনই বাস্তবের উপর দাঁড়িয়ে থাকলেও

নতুন আকারে উপস্থিত হয়। কবি এখানে চিত্রকল্পগুলির মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করতে সচেষ্ট নন।

সুররিয়ালিস্ট কবিতা সম্বন্ধে বাসন্তীবাবুর এই কথা থেকেই তো তাঁর আলোচ্য উপমা দুটি সম্বন্ধে এও বলা যেতে পারে— 'কবি এখানে চিত্রকল্পগুলির মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কার করতে সচেষ্ট নন'।

এই প্রসঙ্গে *জীবনানন্দ জিজ্ঞাসা* গ্রন্থে অধ্যাপক দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়ের জীবনানন্দ বিষয়ক একটি প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। ঐ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন :

জীবনানন্দ বাক্যে শব্দ ও অলঙ্কারের এমন ভাবে বিন্যাস করেছেন যে আসল অর্থ গ্রহণে বাধার সৃষ্টি হয় এবং সেই বাধার মধ্য দিয়েই তিনি ইঙ্গিত অর্থের ব্যঞ্জনা আনতে চেয়েছেন। চিত্রকল্পগুলিকে ভাবৈক সূত্রে তিনি গ্রথিত করতে চাননি— চেয়েছেন পাশ্চাত্য সঙ্গীতের মতো বহুতানের মধ্য দিয়ে একটা সঙ্গতি সৃষ্টি করতে।

তবে এখানে একটা কথা যে, জীবনানন্দের উপমা সুখপাঠ্য হলেও সব উপমাই যে নির্ভুল ও সুসঙ্গত হয়েছে, তা নয়। এরূপ দু-একটা ত্রুটিযুক্ত উপমা আমার চোখে পড়েছে। সে কথা বলি :

জীবনানন্দ তাঁর *বনলতা সেন* গ্রন্থে 'আমি যদি হতাম' কবিতায় এক জায়গায় লিখেছেন :

নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালী ফুলের মতো অজস্র তারা,

খই ক্ষেত বলে কোনো ক্ষেত নেই। ধানকে সিদ্ধ করে শুকিয়ে নিয়ে খোলায় ভাজলে তবেই খই হয়। আর এই খই এর রং পরিষ্কার সাদা।

আমার অনুমান, নীল আকাশে অসংখ্য খই-এর বা সাদা রং-এর তারা দেখে জীবনানন্দ লিখেছেন— খই ক্ষেতের সোনালী ফুলের মতো অজস্র তারা। তা হলেও ঐ খই ক্ষেত তো রূপালী ফুলের মতো। সোনালী ফুলের মতো তো নয়।

পাটের মত শণ ক্ষেতে শণ ফুল হয় সোনালী।

জীবনানন্দ তাঁর সাতটি তারাব তিমির গ্রন্থে 'জুহু' কবিতায় লিখেছেন :

[সোমেন পালিত] বর্তুল মাথায় সূর্য বালি ফেনা অবসর অরুণিমা ঢেলে
হাতির হাওয়ার লুপ্ত কয়েতের মতো দেবে নিমেষে ফুরিয়ে
চিন্তার বুদবুদদের।

একটা প্রবাদের মধ্যে আছে— গজভুক্ত কপিত্থবৎ

এইটা মূল প্রবচন নিয়ে যা আছে, অনেকে তা না জেনে ব্যাখ্যা করে— হাতি আস্ত কয়েত বেল গিলে খেয়ে, যখন সে মলত্যাগ করে, তখন তার মলের সঙ্গে হাতির খাওয়া ঐ গোটা কয়েত বেল বেরিয়ে আসে, কেবল বেলের মধ্যেকার ভিতরের শাঁসটা থাকে না।

এটা ভুল ব্যাখ্যা। এখানে গজ হ'ল এক রকমের পোকা, সেই পোকা কোনো রকমে কয়েত বেলের মধ্যে ঢুকে কুরে কুরে সব শাঁস খেয়ে নেয়, তার খাওয়ার পর শুধু কয়েত বেলের খোলটা পড়ে থাকে।

আমার মনে হয় যে, জীবনানন্দ এখানে তাঁর কবিতায় গজভুক্ত ঐ ভুল ব্যাখ্যাটাই নিয়েছেন। আর তাই যদি হয়, তাহলে জীবনানন্দের ঐ কবিতার 'হাতির হাওয়ার' না হয়ে 'হাতির খাওয়ার' হলেই বোধ করি ভাল হ'ত।

বিশেষণের ব্যবহার

লেখায় বক্তব্যকে সহজতর ও সুন্দরতর করার জন্য যেমন সাধারণত উপমা ব্যবহৃত হয়, তেমনি লেখার মধ্যকার কোনো জিনিসকে বা বিষয়কে আরও সুন্দর করে বা বিশেষ করে জানাবার জন্য, সেই জিনিষ বা বিষয়ের আগে বিশেষণ ব্যবহার করা হয়, কখন কখন আবার ঐ বিশেষণেরও বিশেষণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

জীবনানন্দের কবিতায় এই বিশেষণের এবং বিশেষণের বিশেষণেরও প্রায়ই প্রয়োগ দেখা যায়। আর জীবনানন্দের ব্যবহৃত এইসব বিশেষণও বেশ নতুন ধরনের।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্— এই পাঁচটি বাহ্য-ইন্দ্রিয়। জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় বিশেষণ পদের ব্যবহারের সময় বহু ক্ষেত্রেই এই পাঁচটি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে— কোনো একটি ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য শব্দকে অপর এক বা একাধিক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহার করেছেন। যেমন, ধবল শব্দ। ধবল শব্দটি চক্ষু এই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, আর শব্দ কর্ণ এই ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। ধবল কিনা আমরা চোখ দিয়ে দেখে বুঝতে পারি। আর শব্দ আমরা কান দিয়ে শুনি।

এখানে জীবনানন্দের ব্যবহৃত কয়েকটি বিশেষণের উদাহরণ দিচ্ছি :

১. *আমাদের হাড়ে এক নির্ধূম আনন্দ আছে,*

'কবিতা', *সাতটি তারার তিমিব*

২. *বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝরে পড়ে ইস্পাতের কলে;*

'ঘোড়া', *সাতটি তারার তিমির*

৩. *জমিছে ধোঁয়াটে*
ধারালো কুয়াশা!

'পেঁচা', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*

৪. *শুনেছে কে ইহাদের মুখে কোনো অন্ধকার কথা?*

'এই নিদ্রা', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*

৫. *সমুদ্রের অন্ধকারে প্রবেশাধিকারে;*
নিপট আঁধার;

'উন্মেষ', *সাতটি তারার তিমির*

৬ *ধবল বাতাস খাবে সাবাদিন,*

'জুহু', *সাতটি তাবাব তিমিব*

৭. *মাঠে— মাঠে— আড়ষ্ট পউষে*
ফসলেব গন্ধ বুকে ক'বে

'পিপাসাব গান', *ধূসব পাণ্ডুলিপি*

৮ *আমলকীব শাখা থেকে নীল শিশির ঝ'বে পডবে না—*

'ফুটপাতে', *মহাপৃথিবী*

৯. *জাফরান আলোকেব বিশুষ্কতা সন্ধ্যাব আকাশে আছে লেগে :*

'সপ্তক', *সাতটি তাবাব তিমিব*

১০. *যে-সব ধূসর হাসি, গল্প, প্রেম, মুখবেখা*

'শ্রাবণ বাত', *মহাপৃথিবী*

এই বিশেযণগুলিব দু-একটা নিয়ে এখানে কিছু আলোচনা করছি।

জীবনানন্দ লিখেছেন 'নির্ধূম আনন্দ'। চোখ এবং নাক এই দুই বাহ্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ধূম বা ধোঁয়ার অস্তিত্ব ও জ্বালা বুঝে থাকি। নির্ধূম অর্থাৎ ধোঁয়া না থাকলে আমরা আনন্দ পাই। এই আনন্দ হ'ল অন্তরিন্দ্রিয়।

এখানে জীবনানন্দ অন্তরিন্দ্রিয় গ্রাহ্য এক শব্দের বিশেষণ কবেছেন দুই বাহ্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য এক শব্দ দিয়ে।

জীবনানন্দ লিখেছেন 'বিষণ্ণ খড়'। খড় একটি নির্জীব পদার্থ। জীবনানন্দ এখানে নির্জীব খড়কে সজীব করেছেন। কারণ, প্রসন্ন বা বিষণ্ণ এ সজীবেরই বিষয়।

আবার এক একটা শব্দের কত রকমেরই না বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। এখানে শুধু বাতাস এই বিশেষ্য পদটির সঙ্গে এর বিশেষণ হিসাবে জীবনানন্দ যেসব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন, তার কয়েকটা উদাহরণ দিচ্ছি :

অধীর বাতাস	'জীবন'	*ধূসর পাণ্ডুলিপি*
অনুকূল বাতাস	'অভিভাবিকা'	*সাতটি তারার তিমির*
উত্তুঙ্গ বাতাস	'হাওয়ার রাত'	*বনলতা সেন*
ধবল বাতাস	'জুহু'	*সাতটি তাবার তিমির*
ধূসর বাতাস	'লঘুমুহূর্ত'	*সাতটি তারার তিমির*
বিকীর্ণ বাতাস	'নিরঙ্কুশ'	*সাতটি তারার তিমির*
বিশুষ্ক বাতাস	'রাত্রি'	*ঐ*
মিহিন বাতাস	'লঘুমুহূর্ত'	*ঐ*
সবুজ বাতাস	'বিভিন্ন কোবাস'	*ঐ*

বাতাসের আরও নাম হ'ল বায়ু এবং হাওয়া। এই বায়ু এবং হাওয়া নিয়েই লিখেছেন :

বাণিজ্য বায়ু	'নিরঙ্কুশ'	*সাতটি তারার তিমির*
গভীর হাওয়া	'হাওয়াব বাত'	*বনলতা সেন*
নীল হাওয়া	ঐ	*ঐ*
বিস্তীর্ণ হাওয়া	ঐ	*ঐ*
লবেজান হাওয়া	'মনোসবণি'	*সাতটি তারাব তিমির*

সাধারণের ব্যবহৃত বিশেষণ— 'পড়ন্ত' (রোদ), 'ফলন্ত' (ধান), 'পোড়ো' (জমি) — এরূপ বিশেষণ জীবনানন্দের কবিতায় একরূপ নেই বললেই হয়। আছে অসংখ্য অভিনব ও অপূর্ব সব বিশেষণ। যেমন— কয়েকটা মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি :

অন্ধকাব প্রেরণা	'শ্যামলী'	*বনলতা সেন*
অন্ধকার কথা	'এই নিদ্রা'	*ধূসব পাণ্ডুলিপি*
উষ্ণ গান	'অনেক আকাশ'	*ঐ*
বধির আঁধাব	'আলেয়া'	*ঝরা পালক*
মূঢ় হাসি	'সপ্তক'	*সাতটি তারার তিমির*
সফেন আলোক	'ঘাস'	*মহাপৃথিবী*
সফেন কথা	'লঘু মুহূর্ত'	*সাতটি তারার তিমির*
সৎ অন্ধকার	'উন্মেষ'	*ঐ*

এই নতুন ধরনের বিশেষণগুলি পড়ায় বেশ আনন্দ লাগে।

জীবনানন্দের কবিতায় স্বদেশী ও বিদেশী প্রভাব

জীবনানন্দ তাঁর *ধূসর পাণ্ডুলিপি* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'পরস্পর' কবিতায় লিখেছেন :

মনে পড়ে গেল এক রূপকথা ঢের আগেকার,
কহিলাম— শোনো তবে—
শুনিতে লাগিল সবে,
শুনিল কুমার;
কহিলাম— দেখেছি সে চোখ বুজে আছে,
ঘুমানো সে এক মেয়ে— নিঃসাড় পুরীতে এক পাহাড়ের কাছে।

..

ফুরালাম রূপকথা, শুনিল কুমার।
তারপর, কহিল কুমার—
আমিও দেখেছি তারে— বসন্তসেনার
মতো সেইজন নয়,— কিম্বা হবে তাই—
ঘুমন্ত দেশের সে-ও বসন্তসেনাই।

'ঢের আগেকার' সংস্কৃত সাহিত্যে শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিকম্* নাটকের নায়িকার নাম দেখি বসন্তসেনা। বসন্তসেনা এই শব্দটার আভিধানিক অর্থ হল 'কোকিল'। এই আভিধানিক অর্থে কেউ কেউ তাঁদের সাহিত্যে বসন্তসেনা শব্দটা ব্যবহার করলেও, কোনো নায়িকার নাম হিসাবে শূদ্রক ছাড়া আর কেউ বসন্তসেনা ব্যবহার করেছেন কিনা জানি না।

বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁর *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলার নামটা ভবভূতির *মালতীমাধব* নাটক থেকে নিয়েছিলেন, আমার অনুমান জীবনানন্দও তেমনি তাঁর এই 'পরস্পর' কবিতার বসন্তসেনার নামটা 'ঢের আগেকার' শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* নাটক থেকেই নিয়েছেন।

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ করে বিশেষণের ব্যবহারের সময় এক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুকে অন্য ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর বিশেষণ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। যেমন— আগেই বলেছি, ধবল শব্দ। এখানে ধবল শব্দটা চক্ষু ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, আর

শব্দ এটা কর্ণ ইন্দ্রিয়ের বিষয়।

শূদ্রকের *মৃচ্ছকটিক* নাটকেও দেখি শূদ্রক এক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জিনিসকে অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হিসাবে ব্যবহার করে গেছেন।

মৃচ্ছকটিক নাটকে শকার ও বিট নামে দুটি চরিত্র আছে। এঁরা হলেন যথাক্রমে রাজার শ্যালক ও শকারের পণ্ডিত পারিষদ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-কৃত *মৃচ্ছকটিক* নাটকের বাংলা অনুবাদ থেকে এঁদের কথোপকথনের কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করছি :

> *শকার :* হাঁ, হাঁ, আমি মালাব গন্ধ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, অন্ধকারে আমার নাক একেবাবে ভরে গেছে, কিন্তু কই ভূষণের শব্দ তো দেখতে পাচ্ছি না।

এরূপ এক ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য শব্দের বদলে অন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে জীবনানন্দের উপর শূদ্রকের কিছু প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়।

জীবনানন্দের কবিতায় বসন্তসেনা নামটা দেখেই শূদ্রকের ঐ প্রভাবের কথা অনুমান করলাম। অবশ্য এ অনুমান সঠিক নাও হতে পারে।

জীবনানন্দ সংস্কৃত সাহিত্য বিশেষ করে *উপনিষদ* ইত্যাদি যে পড়েছিলেন, তা তাঁর কবিতায় 'যম', 'নচিকেতা', 'মৈত্রেয়ী' ইত্যাদির বার বার উল্লেখ থেকে বোঝা যায়।

সংস্কৃত সাহিত্যের মতো প্রাচীন বাংলা সাহিত্যও যে জীবনানন্দ গভীরভাবে পড়েছিলেন, তাও তাঁর কবিতা থেকেই জানা যায়। বিদ্যাপতি (ইনি যদিও আসলে মৈথিলী কবি, তবুও তাঁর কবিতা বাংলা সাহিত্যেরই অন্তর্গত), চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব তাঁর কবিতায় পাওয়া যায়।

জীবনানন্দ তাঁর *রূপসী বাংলা*-য় যেমন চণ্ডীদাসের নাম করেছেন, তেমনি *কীর্তন মাথুরের পালা*-র কথাও বলেছেন। জীবনানন্দের *রূপসী বাংলা*-য় কয়েকটি কবিতায় 'গোরচনা' শব্দটা পাওয়া যায়। 'গোরচনা' এই শব্দটা প্রধানত *বৈষ্ণব পদাবলী*-তেই দেখা যায়। জীবনানন্দ 'গোরচনা' শব্দটা যে *বৈষ্ণব পদাবলী* থেকে নিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কেননা, *রূপসী বাংলা*-র একটা কবিতায় তিনি তো পরিষ্কারই লিখেছেন :

> *গোরচনা রূপ নিয়ে এসেছে কি রাই*

উজ্জ্বল পীতবর্ণ বা হরিদ্রাবর্ণ গন্ধদ্রব্য— এই অর্থেই বৈষ্ণব কবিরা তাঁদের পদাবলীতে 'গোরচনা' শব্দটা ব্যবহার করেছেন। যেমন :

> *সখি হে ভালে তুহুঁ রসবতী রাই*
> *তুয়া অনুরাগে পরাণে পূরিত তনু*

বহুত তোহারি পথ চাই।
গোরচনা আনি পাণি তলে মেটল
তোহারি মুরতি বিরচই।
সমতি না পাই রাই বলি রোয়ত
নয়ন লোরে ঘন সেচই।

'গোরচনা' শব্দের আভিধানিক অর্থ গো-পিত্তজ উজ্জ্বল পীত রং বা গরুর পিত্তকোষস্থ শুষ্ক উজ্জ্বল পীত বর্ণ পিত্ত।

জীবনানন্দ এই আভিধানিক অর্থটা নিয়ে তাঁর কবিতায় 'গোরচনা' শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন :

...বাসমতী চালে ভেজা শাদা হাতখানা
রেখো বুকে, হে কিশোরী, গোরচনারূপে আমি করিব যে স্নান—

কিংবা—

...আমিও ঘাসের বুকে রব মুখ গুঁজি
মৃদু কাঁকনের শব্দ— গোরচনা জিনি রং চিনিব না কিছু—

জীবনানন্দের *রূপসী বাংলা*-য় এবং *ঝরা পালক*-এ কখন কখন কিশোরী শব্দটা দেখেও মনে হয়, এটাও হয়ত *বৈষ্ণব পদাবলী*-রই প্রভাব, কেননা, *বৈষ্ণব পদাবলী*-তে রাধা কিশোরী। যেমন :

রাজার ঝিয়ারি বয়সে কিশোরী
তাহে কুলবতী বালা।

জীবনানন্দের *রূপসী বাংলা*-র বিভিন্ন কবিতায় একদিকে চাঁদ, ধনপতি, শ্রীমন্ত, সনকা, বেহুলা, লহনা এদের নাম, অপর দিকে চম্পা, কালিদহ, গাঙুড়, মধুকর ডিঙা প্রভৃতিরও উল্লেখ দেখে মনে হয় জীবনানন্দ *মনসা মঙ্গল* এবং *চণ্ডীমঙ্গল* কাব্য বিশেষভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। তিনি *রূপসী বাংলার* একটি কবিতায় মুকুন্দরামের *চণ্ডীমঙ্গল*-এর উল্লেখ করে লিখেছেন :

...যখন মুকুন্দরাম হায়
লিখিতে ছিলেন বসে দু'প্রহরে...

জীবনানন্দ *মনসা মঙ্গল*-এর মধ্যে বিজয় গুপ্তের *মনসা মঙ্গল* পড়েছিলেন বলে মনে হয়। মনে হয়, কারণ, বিজয় গুপ্ত ছিলেন জীবনানন্দের স্বজেলা বরিশালের অধিবাসী, আর পূর্ববঙ্গে বিজয় গুপ্তের *মনসা মঙ্গল*-এরই প্রচলন বেশি। জীবনানন্দ *রূপসী বাংলা*-র একটি কবিতায় লিখেছেন :

ধনপতি, শ্রীমন্তের বেহুলার, লহনার ছুঁয়েছে চরণ ;

এ তাঁর *মনসা মঙ্গল* অধ্যয়নের ফল, তা সহজেই বোঝা যায়।

জীবনানন্দ রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় এবং বিশেষ করে রামপ্রসাদ সেনের রচনাও ভালই পড়েছিলেন। তিনি তাঁর *রূপসী বাংলা*-য় একবার রায় গুণাকরের উল্লেখ করলেও রামপ্রসাদের কথা একাধিকবার বলেছেন। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে একটি কবিতায় লিখেছেন :

যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে।

শঙ্খমালা, চন্দ্রমালা, মানিকমালা প্রভৃতি নামগুলোর উল্লেখ দেখেও বলা যেতে পারে তিনি বাংলার রূপকার বইও পড়েছিলেন।

জীবনানন্দের প্রথম যুগের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রভৃতির কবিতার কিছু কিছু প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন, ১৩০৭ সালের শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের *ক্ষণিকা* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত বিখ্যাত 'সেকাল' কবিতার এক জায়গায় আছে :

কুরুবকেব পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে
লীলা কমল রইত হাতে কি জানি কোন্ কাজে
অলক সাজত কুন্দ ফুলে শিরীষ পরত কর্ণ মূলে,
মেঘলাতে দুলিয়ে দিত নবনীপের মালা।
ধারাযন্ত্রে স্নানের শেষে ধূপের ধোঁয়া দিত কেশে
লোধ্র ফুলের শুভ্ররেণু মাখত মুখে বালা।

১৩৩৪ সালের শ্রাবণ সংখ্যা *বঙ্গবাণী* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'অলকা (মেঘদূত)' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। তাতে তিনি এক জায়গায় লেখেন :

সেথা নারীর হস্তে লীলা উৎপল, চিকুরে কুন্দফুল
কর্ণে তাদের শোভে নিরুপম শিরীষ কুসুম দুল,
আনন তাহারা করিছে শুভ্র লোধ্র-রেণুকা মাখি
মাধবী বনের নব কুরুবকে চূড়াপাশ দেছে ঢাকি।

জীবনানন্দের এই লেখা রবীন্দ্রনাথের প্রায় হুবহু অনুকরণ নয় কি?

জীবনানন্দের পরবর্তীকালে বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন'-এ তিনি যে বলেছেন :

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি এই পৃথিবীর পথে।

আমার দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল, নাটোরের বনলতা সেন।

এই কথাগুলি পড়লে রবীন্দ্রনাথের *কল্পনা* কাব্যগ্রন্থের 'স্বপ্ন' কবিতার নিম্নোক্ত পংক্তি ক'টা মনে পড়ে :

দূরে বহু দূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে
খুঁজিতে গেছিনু কবে শিপ্রা নদী তীরে
মোর পূর্ব জনমের প্রথম প্রিয়ারে।

অবশ্য এই কবিতায় কীট্‌সের 'On first Looking into Chapman's Homer' কবিতার *Much have I travelled* ইত্যাদির এবং শেলীরও 'Alastor or the Spirit of Solitude' কবিতার *The poet wandering on* প্রভৃতির প্রভাব থাকাও অসম্ভব নয়। তবে এই কবিতায় এডগার এলেন পো-র 'To Helen' কবিতার বেশ প্রভাব আছে।

অবন্তীকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা* গ্রন্থে দেখিয়েছেন— জীবনানন্দের *মহাপৃথিবী* গ্রন্থের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের *সন্ধ্যা সংগীত* গ্রন্থের 'তারকার আত্মহত্যা' কবিতার যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে।

অধ্যাপক ড. দিলীপকুমার মিত্র তাঁর *ইংরাজি সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে জীবনানন্দের কবিতায় ইয়েট্‌স-এর প্রভাব সম্বন্ধে লিখেছেন :

> 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় জীবনানন্দের যে ইন্দ্রিয়ময়তার পরিচয় পাওয়া যায়, দৃশ্যগন্ধ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় বোধের দ্বারা যে বিস্ময়কর চিত্রকল্প অঙ্কন করেছেন, তা অনেকটা ইয়েটসীয়, যেমন—
>
> *Autumn is over the long leaves that love us*
> *And over the mice in the barley sheaves,*
> *Yellow the leaves of the rowan above us,*
> *And yellow the wet wild-strawberry leaves.*
>
> 'The Falling of the Leaves'
>
> *দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,*
> *হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,*
> *ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ,*
> *চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দুবেলা*
>
> 'মৃত্যুর আগে'

জীবনানন্দের 'হায় চিল' কবিতাটিতে ভিজে মেঘের দুপুরে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে চিলের কান্নায় অপরিসীম বেদনার সৃষ্টি হয়েছে। তা অনেকটা ইয়েটসের মতো

O Curlew, cry no more in the air,

Or only to the water in the West;
Because your crying brings to my mind
Passion-dimmed eyes and long heavy hair
That was shaken out over my breast :
There is enough evil in the crying of wind.

'He reproves the Curlew'

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদো নাকো উড়ে উড়ে ধানসিঁড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে ;
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা
জাগাতে ভালবাসে!

'হায় চিল'

জীবনানন্দের 'আমি যদি হতাম' কবিতায় 'সৌন্দর্যচেতনার, প্রেমস্পৃহার, সংগতির সাধনার অপমৃত্যুর কথা বলা হয়েছে। ...কবির বক্তব্য কিছু সৌন্দর্য, প্রেম, পূর্ণতা এখনো বনহংস অর্থাৎ অন্য প্রাণীর মধ্যে আছে— মানুষের জীবনে তা একেবারেই নেই। বনহংসর জীবনও নষ্ট হয় গুলির আঘাতে কিন্তু সে মৃত্যু আসে অনন্তরূপে, আর মানুষের জীবনে মৃত্যু আসে টুকরো টুকরো ব্যর্থতায় খণ্ডিত হয়ে'। জীবনানন্দের এই কবিতা অনেকাংশই ইয়েটসের 'The White Birds'-এর অনুরূপ। ইংরাজী কবিতায়ও পাখী হয়েছে যেন প্রাণের প্রতীক যাকে যুগের ক্লান্তি অবক্ষয় যেন ক্লিষ্ট করতে পারে না :

I would that we were, my beloved, white birds on the foam of the sea!
We tire of the flame of the meteor, before it can fade and flee;

আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি;
কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে।

'আমি যদি হতাম'

ইয়েটস ও জীবনানন্দ দুজনের কবিতায় এইসব প্রাণীর অবিরাম আবির্ভাব :

১. *The delicate-stepping stag and his lady sigh*

'The Ragged Wood'

এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

'শিকার'

বা

নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীল গাই, হরিণের ছায়ার আসা-যাওয়া;
একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া।

'আমাকে তুমি'

২. *Where mouse-grey waters are flowing.*

'The Pity of Love'

নেউল ধূসর নদী আপনার কাজ বুঝে প্রবাহিত হয়।

'আবহমান'

৩. *...a bat rose from the hazels*
And circled round him with its squeaky cry...

'The Phases of the Moon'

একটি বাদুড় দূর স্বোপার্জিত জ্যোৎস্নায় মনীষায় ডেকে নিয়ে যায়
যাহাদের যতদূর চক্রবাল আছে লভিবার।

৪. *He bade his heart go to her,*
When the owls called out no more;

'The Cap and Bells'

তখন হয়তো মাঠে হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে।

'কুড়ি বছর পর'

পেঁচার ধূসব পাখা উড়ে যায় নক্ষত্রের পানে

'বুনো হাঁস'

৫. *Preposterous pig of a world*
শত শত শূকরের চিৎকার

৬. *Upon the brimming water among the stones*
Are nine and fifty swans

'The Wild Swans at Coole'

নয়টি অমল হাঁস নদীতে রয়েছে মনে পড়ে।

'হাঁস'

জীবনানন্দ গৃহীত ইয়েটসের আরো কয়েকটি ভাবনা ও শিল্পরূপের নিদর্শন দেওয়া যায় :

Ignorant as the dawn
ভোরের মূর্খ উচ্ছ্বাস
The Silver apples of the moon.
The golden apples of the Sun.

'The Song of wandering Aengus'

... সোনাব বলেব মতো সূর্য আব
রূপার ডিবের মতো চাঁদেব বিখ্যাত মুখ।'

দিলীপবাবু তাঁর এই লেখায় আরও দেখিয়েছেন যে, ইয়েটসেব 'The Second Coming' এবং 'The Scholars' এই কবিতা দুটির সঙ্গে জীবনানন্দের যথাক্রমে 'অদ্ভুত আঁধার এক' এবং 'সমারূঢ়' কবিতা দুটির কিছু সাদৃশ্য আছে। অর্থাৎ ইয়েটসের কিছুটা প্রভাব আছে।

জীবনানন্দ তাঁর *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থের 'অবসরের গান' কবিতায় লিখেছেন :

ভুলে গিয়ে রাজ্য-জয় সাম্রাজ্যেব কথা
অনেক মাটির তলে যেই মদ ঢাকা ছিলো তুলে নেব তার শীতলতা
ডেকে লব আই বুড়ো পাড়াগাঁর মেযেদের সব,—
মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে,
শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।

জীবনানন্দের এই লাইন কয়টি কীটসের 'Ode to a Nightingale' কবিতার এই লাইন কয়টির কথা স্মরণ করায় :

O for a draught of vintage! that hath been
Cool'd a long age in the deep-delved earth,
Tasting of Flora and the country-green,
Dance and Provincial Song, and sun-burnt mirth,

ধূসর পাণ্ডুলিপি-র এই 'অবসরের গান' কবিতার আর এক জায়গায় আছে :

আমাদের পাড়াগাঁয়ে সেই সব ভাঁড়
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নীচে পৃথিবীব তলে।
অনেক মাটির নীচে তাদের কপাল
কোনো এক সম্রাটের সাথে
মিশিয়া রয়েছে আজ অন্ধকার রাতে!
যোদ্ধা-জয়ী-বিজয়ীর পাঁচ ফুট জমিনের কাছে— পাশাপাশি—
জিতিয়া রয়েছে আজ তাদের খুলির অট্টহাসি।

জীবনানন্দের এই লেখা পড়লে সেক্সপীয়রের *Hamlet* নাটকের কথা মনে আসে।

সেক্সপীয়রের হ্যামলেট নাটকের পঞ্চম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে (Elsimore, A Churchyard-এ) spades and picks হাতে কবর খননকারী Clown বা ভাঁড় এবং হ্যামলেট এঁদের কথোপকথনে আছে এইরূপ :

I clo *Here's a skull now. This skull has lien you i' th' earth three and twenty years*
Ham *Whose was it?*
I clo *A whoreson mad fellow's it was. Whose do you think it was?*
Ham *Nay I know not*

জীবনানন্দ তাঁব কোনো কোনো কবিতায় খ্যাতনামা ইংবাজ লেখকদের ভাব, ভাষা, এমন কি ব্যবহৃত শব্দও গ্রহণ করেছেন।

জীবনানন্দ তাঁব 'ক্যাম্পে' কবিতায 'হৃদযেব বোন' কথাটা ব্যবহার কবেছেন। জীবনানন্দ এক সময় তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতার একটা ব্যাখ্যা দেবার সময়, নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি শেলীব *Soul's sister* থেকে 'হৃদয়ের বোন' নিয়েছেন।

জীবনানন্দের *সাতটি তারার তিমিব* গ্রন্থেব 'বিভিন্ন কোরাস' কবিতায় এক জাযগায আছে— সবুজ বাতাস।

ইংরাজ কবি টি. এস. এলিয়ট-এর 'Landscapes III Usk' কবিতায় রয়েছে— green air, তিনি লিখেছেন :

Seek only there
Where the grey light meets the green air
The hermit's chapel, the pilgrim's prayer

জীবনানন্দ তাঁর *বনলতা সেন* গ্রন্থে 'শঙ্খমালা' কবিতায় লিখেছেন :

শিঙেব মতো বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যাব স্বব।

শেলীর 'Alastor' কবিতায় নীল চাঁদেব' কথা পাই। সেই অংশটা এই :

Roused by the shock he started from his trance—
The cold white light of morning, the blue moon'
Low in the west, the clear and garish hills,
The distinct valley and the vacant woods,
Spread round him where he stood

জীবনানন্দ তাঁর *বনলতা সেন* গ্রন্থে 'সবিতা' কবিতায় লিখেছেন ·

সবিতা, মানুষ জন্ম আমবা পেযেছি
মনে হয কোনো এক বসন্তের বাতে :
ভূমধ্যসাগর ঘিরে যেই সব জাতি :
তাহাদের সাথে
সিন্ধুর আঁধার পথে করেছি গুঞ্জন ;

...

তবুও অতীত থেকে উঠে এসে তুমি আমি ওরা—

সিন্ধুর রাত্রির জল জানে—
আধেক যেতাম নব পৃথিবীর দিকে ;

...

তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন ;

এখানে জীবনানন্দ বলেছেন :

সবিতার চুলের ভিতর 'কবেকার নুন' অর্থাৎ অনেক কাল আগের নুন বা পুরাতন নুন। ইংরাজিতে *old salt* বলে একটা কথা আছে, যার অর্থ অভিজ্ঞ নাবিক। সবিতা কবিতায় 'সিন্ধুর আঁধার পথে' 'সিন্ধুর রাত্রির জল জানে' 'যেতাম নব পৃথিবীর দিকে' দেখে মনে হয়, জীবনানন্দ 'কবেকার সমুদ্রের নুন' কথাটা হয়ত এখানে *old salt* বা 'অভিজ্ঞ নাবিক' হিসাবেই ব্যবহার করেছেন!

জীবনানন্দের কয়েকটি অগ্রন্থিত কবিতা

মহাত্মাজি

সফল উজ্জ্বল ভোর পৃথিবীতে আসে,
তারপব অন্ধকার ভাঙনের রাত;
এ রকম টানাপোড়েনের বেগে মানুষেব সময চলেছে।

একদিন পৃথিবীর হিংসাব্যথা শেষ হবে, সেই অনিবার
আনন্দের চিন্তার মতন প্রেম আলো
মাথার ওপরকার প্রসারিত নীলিমার মত
সবের ওপবে সত্য হয়ে আছে, আছে মনে হয়।

বসন্তের বায়ু আসে পাখিদের কলবর নিয়েঃ
সূর্য জ্বলে ওঠে নিজ মহিমার স্থলে;
জ্যোতির নিঃসৃত নিজ কন্যার মতন
সমুদ্র সমস্ত দিন কল্লোলিত হয়;
পৃথিবীতে, আমাদের সমাজেও এ রকম সুদীপ্ত সময়
অনুভব ক'রে সব মানুষেরা মৃত অপসৃত শতাব্দীব
গ্লানির কলঙ্ক থেকে উঠে এসে তনু মন প্রাণ
করায় কী অন্তহীন অমলিন আলোসূর্যে স্নান!

মানুষের অবিরল রাত্রি দিনে যেই ভুল, লোভ
হননের ইচ্ছা, রক্ত, অন্ধকার, ক্ষয়ঃ
তিরোহিত হ'ল না তো সেই সব আজো;
তবুও কল্যাণকৃৎ মহাত্মার মাধুরীর এটুকু সময়
আর সেই মধুরতা কি ক'রে নিহত হ'ল, তবু
সংরক্ষণ করে রাখে নিজের অমিয়;
সৃষ্টির অক্ষয় অন্ধ সবিতার কাছে
মানুষ, এ সূর্য তুমি নিও।

কবিতাটি ১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, *ক্রান্তি* পত্রিকায় (১৩৫৪ মাঘ) প্রকাশিত হয়েছিল।

সৌর চেতনা

এইখানে অন্ধকার সমুদ্রের জলে
একটি আলোক স্তম্ভ আছে,
তবুও তা' আলো ব'লে বোধ হয় যদি
ঝঞ্ঝায় শংকিত সব নাবিকের কাছে
অন্ধ প্রহরী তার ঘবে
আপনাব অন্ধকার নিয়ে খেলা করে।

মৃত পিতৃপুরুষের বিবর্ণ দেয়ালে
অধিক বিবর্ণতার তরবাব দেখে
প্রয়োগ পটুয়াদের সাধ জেগে গেল
হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে;
মদির উল্লাসে তাবা আত্মকর্মক্ষম
চেয়েছে কি ঠিকই এ রকম।

কণ্ঠস্থ গ্রন্থের শব্দ উচ্চারণ কবে
মোমের নিকট ব'সে মানুষেব চোখ
হারায়ে ফেলেছে গ্রন্থ,
হারায়েছে মোমের আলোক,
হারায়ে ফেলেছে এই শতাব্দীকে আজ
গোধূলির সুত মিত রমণী সমাজ।

এই জীবনের পথে জিনিসের মত
অপরের সমীচীন দৃষ্টির নির্দেশে
অচেতন জলের লোহের থেকে জলে
চলেছি বিম্বের মত ভেসে।
শুনেছি কোথাও এক শতাব্দীর মিতব্যয়ী মন
জানে নাক' অপ্রস্তুত হতে;
শুনেছি চ'লেছি লোক-পরিচিত প্রমাণের বলে।
জনমত,— অন্ধকার লোক মতামতে
চ'লেছি দৈবের দিকে?

যে আকাশ জনতার নিরাশায় পিছে
প'ড়ে আছে— অথবা মৃত্যুর পবে যেখানে শান্তিতে বসবাস
করা যায়,— অথবা যাদেব আমি
প্রতিহত ক'রে যাই আজ,
অথবা সেসব জ্ঞান জ্ঞানময় বলে মনে হয়
অথবা যে সব আশা, আশা বলে মনে হয় আজ
সকলি তন্দ্রার মত।
জ্ঞানপাপী হয়ে তবু যাকে আমি বধ কবি আজ
যাকে আমি ভালোবাসি বলে মনে হয়,
যাকে আমি অবহেলা করি,
সকলি রিরংসালীন পেংগুইন।
তবুও সত্যের পরিচয়
নিজের নিপট গুণে ভেদ কবে যদি এই মোহান্ধতাকে,
তবে সে তা' করে যায়। বিনয়ের অবসান হ'লে
তবুও বিনয়ী হযে ওরা কাল ভোর বেলা হয়তো বা
পেয়ে যাবে তাকে।

কবিতাটি সতীকুমার নাগ ও শতদল গোস্বামী সম্পাদিত কবিতা সংকলন গ্রন্থ *মিছিল* (১৯৪৪)-এ প্রকাশিত হয়েছিল।

ঢেউয়ে ঢেউয়ে

ঢেউয়ে-ঢেউয়ে হালভাঙা জাহাজের সাক্ষ্য রেখে দিয়ে—
কুয়াশায় ঘণ্টা নেড়ে কম্পাশ তৈরি ক'রে— চাকা
ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে কল ভেঙে গ'ড়ে গ'ড়ে ভেঙে গ'ড়ে
বেনামী নদীকে নাম দান ক'রে নাম ভুলে গিয়ে
মানুষের বিবরণে কুয়াশায় অন্ধকারে চলেছে মানুষ;
মৃত মানুষের বোঝা, বিধানের হৃদয়ের অবিরল পচনশীলতা,
মড়কের ইঁদুরের অন্তহীন খাঁচা নিয়ে চলেছে— চলেছে—
এ-সবের থেকে তবু উৎসারিত অনুভূতি জ্ঞান
প্রেম পেয়ে এই বার সব কুজ্ঝটিকা
শেষ ক'রে মহাসাগরের ভোরে আলো
আরো আলো পাওয়া যাবে?— আরো গাঢ় সম্মিলন?
নদীর ও নীল সমুদ্রের আরো বড় রেখা?

বলয়ের পরে আরো বলয় রয়েছে;
সেখানে অন্তিম শূন্য আছে;
শতকের মহাশতকের
উজ্জ্বলতা আছে।
শ্মশানের স্তব্ধতাও ভালো, তবু উৎস আলো শান্তি প্রীতি সব
ভেতরের— ওপরের— সূর্যের লক্ষ্যে প্রয়াণের।

অনেক বছরের ধূসরতার ভিতর দিয়ে

অনেক বছরের ধূসরতার ভিতর দিয়ে তোমার মুখের ছবি ভেসে ওঠে (আবার)
(তোমার মুখ যেন) আমাকে নিয়ে জীবনের (অনেক) সহজ সৌন্দর্যের ওপর
হাত রাখে (আবার)
(মনে হয়) এক প্রান্তরের দেশে চলে গেছি আমরা
পশ্চিমের লাল সূর্য যেখানে চাষার মত তার শেষ বোমা রাখে
যতদূর চোখ যায় সোনালী খড়ের কান্তার
উঁচু উঁচু গাছের ডালপালা ঘিরে আকাংখার করুণ ঝটপটানি
কাক-পাখিদের ডানার থেকে ঝরে পড়ছে
তাদের নীল মসৃণ ডানা মেঘের কমলা আলোর আভার ভিতর
বেঁচে থাকে সেইখানে
গাছের হলুদ-রক্তিম পাতা খসে খসে লাল সূর্যের দিকে উড়ে যায়।

রচনাকাল, এপ্রিল ১৩৩৬, অসংশোধিত

কয়েকজন প্রখ্যাত জীবনানন্দ-গবেষকের জীবনানন্দের কবিতা সংকলন গ্রন্থ

সুব্রত রুদ্র, অশোকানন্দ দাশ, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ, এঁরা বিখ্যাত জীবনানন্দ গবেষক। এঁদের মধ্যে আবার দেবীপ্রসাদবাবু ও সৈয়দ সাহেব দীর্ঘ কাল ধরে কঠোর পরিশ্রমে অক্ষয় কীর্তি স্বরূপ দুজনে দুটি জীবনানন্দ বিষয়ক সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করায় এঁরা আরও আরও বিখ্যাত হয়েছেন।

এঁদের জীবনানন্দের কবিতা সংকলনে, যে সব ভুল দেখেছি বলে মনে হয়েছে, সেই সবেরই আলোচনা করেছি এই অধ্যায়ে। ৮১ বছর বয়সে ক্ষীণ দৃষ্টি নিয়ে এঁদের ভুল দেখাতে গিয়ে নিজেরই কোথাও ভুল হয়েছে কিনা জানি না।

পত্র-পত্রিকায় বা বইয়ে কোনো লেখকের অজ্ঞাতে তাঁর লেখায় ভুল ছাপা হ'লে, সেই লেখক যে কিরূপ ক্ষুণ্ণ, এমনকি ক্রুদ্ধও হন, এ সম্পর্কে এখানে দুটা উদাহরণ দিচ্ছি :

১. আমি তখন *ভারতবর্ষ* মাসিক পত্রিকায় কাজ করি। সেই সময় আমাদের এই কাগজে একবার এক অখ্যাত কবির একটি কবিতা ছাপা হয়। ছাপা হ'ল বটে, কিন্তু ছাপাখানার ভুলে ঐ কবিতার এক জায়গায় অর্থ অন্য রকম হয়ে যায়। এই কবিতা ছাপা হ'লে কবি আমাদের অফিসে এসে অভিযোগ করলেন— কবিতা ছেপে এ কী করেছেন আপনারা? কবিতায় আমার যা বক্তব্য ছিল, তা সম্পূর্ণ উল্টে দিয়েছেন। এর চেয়ে কবিতাটা না ছাপলেই ভাল করতেন। এই কবিতা ছাপায় আমি পাঠকদের কাছে হেয় হয়ে গেলাম।

২. *ভারতবর্ষ* পত্রিকার মালিকদেবই ছিল— *গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স* পুস্তক প্রতিষ্ঠান। এঁরা শরৎচন্দ্রের প্রায় সমস্ত বইয়েরই প্রকাশক ছিলেন। একবার শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত-৪র্থ পর্ব বইয়ে সামান্য একটা ছাপার ভুল দেখে শরৎচন্দ্র তখন ঐ বই-এর প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন— বৈষ্ণবীরসচর্চা শব্দে, বৈষ্ণবী শব্দটা সমাসবদ্ধ বিশেষণে ব্যবহৃত হওয়ায় এখানে বৈষ্ণবি হবে। ব'য়ে ঈ না হয়ে ব'য়ে ই হবে। প্রুফে কেটেও দিলাম। তবুও বইয়ে ব'য়ে ঈ ছাপা হ'ল। এই ভুলের জন্য যিনি দায়ী, অন্তত দায়িত্ব যাঁরা 'পরে, তাঁর শাস্তি হওয়া উচিত।

এটা এমনই সামান্য ভুল যে, অনেক পণ্ডিত পাঠক-পাঠিকাও এ ভুলটা ধরতেই

পারতেন না। তবুও শরৎচন্দ্র ঐ ভুলের জন্যই অতটা রেগে গিয়েছিলেন।

এ থেকে এখন বলা যেতে পারে, জীবনানন্দও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং বইয়ে তাঁর কবিতায় ভুল দেখলে, তিনিও যে ক্ষুণ্ণ বা ক্রুদ্ধ হতেন, তা সহজেই অনুমেয়। আর একটা কথা— ভুল সংশোধন না হলে, সেই ভুল তো চলতেই থাকবে।

আমার মুখে যাঁরা ঐ সব ভুলের কথা শুনেছেন, তাঁরা সকলেই একবাক্যে ঐ ভুলগুলো দেখিয়ে দিয়ে যাবার কথা বলেছেন। একদিন বিকাশ ভবনে উচ্চশিক্ষা সচিব দিলীপ ভট্টাচার্য আই.এ.এস.-এর ঘরে তাঁর সঙ্গে কি একটা আলোচনা প্রসঙ্গে জীবনানন্দের কবিতা সংকলনে এই ভুলের কথা উঠলে, তিনিও বললেন— ঐ ভুলগুলো এখনি দেখিয়ে দিয়ে যান।

সাধারণত দেখা যায়, কারও লেখার ভুল দেখালে তিনি ঐ ভুলের নির্দেশকের উপর ক্ষুণ্ণ হন। এখানে যাঁদের জীবনানন্দের কবিতা সংকলন-এর ভুল নিয়ে আলোচনা করছি, এঁরা বা এঁদের প্রকাশকরা অন্তত জীবনানন্দের কথা ভেবে এবং সেই সঙ্গে জীবনানন্দের কবিতার পাঠক-পাঠিকাদের কথা ভেবেও আমার উপর আশা করি ক্ষুণ্ণ হবেন না। এঁরা ইচ্ছা করলে, পরে এগুলি সংশোধন করে নিতে পারবেন।

এমনও অনেক গুণী ও বিদগ্ধ ব্যক্তি আছেন, যাঁদের লেখায় ভুল দেখিয়ে দিলে তাঁরা এ জন্য কৃতজ্ঞ ও খুশীই হন। যেমন— আমার *ঢাকায় রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে আমি প্রসঙ্গত, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের *রবীন্দ্র-জীবনী* গ্রন্থের কয়েকটা ভুলের উল্লেখ করেছিলাম। আমার ঐ বই পড়ে আমার অপরিচিত প্রভাতবাবু তখন এক চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন— আপনার বইটি পেয়ে রবীন্দ্র-জীবনী ৩ খণ্ডে ঢাকা পর্বটিকে আবার নতুন করে লিখতে হচ্ছে। আপনি আমার যে সব ভুল ত্রুটি দেখিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।

এখন জীবনানন্দের যেসব কবিতা সংকলনে ভুলভ্রান্তি হয়েছে বলে মনে করেছি, সেই কবিতাগুলি উদ্ধৃত করে তা নিয়ে কিছু আলোচনা করছি :

এই পৃথিবীর
জীবনানন্দ দাশ

এই পৃথিবীর বুকের ভিতর কোথাও শান্তি আছে;
অঘ্রাণ মাস রাত্রি হ'লে অনেক বিষয়বিষের সমাধান
মাঠে জলে পাখির নীড়ে নক্ষত্রেতে থাকে;
অমেয় গোলকধাঁধাঁয় ঘুরে প্রাণ
চেষ্টা করে সমাজ জাতি সময় সৃষ্টি সঠিক বুঝে নিতে।
সকল প্রয়াণ সফল হবে গ্লাশিয়ারের দীপ্তি আসার আগে;
এখন রৌদ্রে আজন্মকাল অনুষ্ঠানের দিন;

সফল হতে ইতিহাসের অনেক দিন লাগে।

সে সফলতা এই পৃথিবী— হয়তো সৃষ্টি চূর্ণ হ'লে হবে;
আমি অনেক দূরের থেকে তাহার কাবণধ্বনি
নীল আকাশে জ্যোতিষ্কদের একে একে নিভে যেতে দেখে
সমাজ জাতি ধ্বংস হয়ে যেতেছে বলে— শুনি।
জানি নতুন নক্ষত্রেরা আবার ফিরে আসে,
নতুন সমাজ শুদ্ধ ভাষা মানুষ সৃষ্ট হয়,
অসংখ্য কাল কেটে গেলে বোঝা যাবে হয়তো প্রেমের মানে
সেন্টিগ্রেডের ধারণাতীত হিমের ভিতব নয়।

এসব তবু হেমন্তেতে স্তব্ধ হ'য়ে থেকে
সময়সেতু পেবিয়ে কথা ভাবা।
আজকে তবু খণ্ডকালের শিশু আমি,— নারি,
তোমাব কাছে জানিয়েছিলাম দাবি,
মহাকালের হাতেব স্নিগ্ধতা যে ভালো ক্ষমাময়
অন্ধকারে শিশির পাতায় পালকে নীড়ে ঘাসে
আস্তে সে তা' জানিয়ে যায়,— যদিও রাতদিন
অবাধ রক্ত রযেছে ইতিহাসে;

হয়তো তা-ই সত্যি, তবু আজকে রাতে আমি যে একা আছি
সে অধোগামী চিন্তাধারা থামিয়ে দিয়ে তুমি
জেনেছি এই নিখিলে শেষ একটি চেতনা;
অথচ কী ব্যাপ্ত অবচেতন মরুভূমি।
কোথায় তুমি রয়েছ আজ— সে কোন্ নাগর আলোর নীয়নে
আজ সমাজের গলিত নাম তোমার মুখে উচ্চারিত হয়?
সে কোন্ মৃত উপগ্রহ সসম্ভ্রমে উঠে
আজকে তোমার পদার্থে চিন্ময়।

তবুও অণু-পরমাণু হেতুরীতির কোথাও কোনো স্খলন হয় নাই;
সকলি ঠিক— তুমিও নিজে স্বাভাবিকতার শীর্ষে দাঁড়িয়ে
নীলকণ্ঠ পাখিকে আজও আকাশ দেখাবে
তোমার নীলাম্বরীতে সব নীলিমা মুছে দিয়ে।
সূর্য জ্বলে— মেঘরা ভাসে— ঝাউ শিসু নিম প্রকম্পিত হয়;
নদীর জলে সমস্ত দিন ক্রন্দসী উজ্জ্বল;
তোমায় আমি ভালোবাসি— এই সত্য স্বভাব পৃথিবীর
দানের মতন নিজেরই ফলাফল।

১৩৬০ সালের বৈশাখ সংখ্যা *পূর্বাশা* পত্রিকায় 'এই পৃথিবীর' নামে জীবনানন্দের এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়। সুব্রত রুদ্র *পূর্বাশা* থেকে এই কবিতাটি নিয়ে ১৩৮৫ সালে প্রকাশিত নবপর্যায় ত্রৈমাসিক *কৃত্তিবাস* পত্রিকার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় দেন। তিনি পূর্বাশা থেকে এই কবিতাটি নিয়ে *কৃত্তিবাস*-এ দেবার সময় কবিতার শেষে প্রাপ্তির উৎস হিসাবে ঐ *পূর্বাশা*-র ১৩৬০ বৈশাখ সংখ্যার কথাই বলেছেন। কিন্তু *কৃত্তিবাস*-এ প্রকাশিত সেই 'এই পৃথিবীর' কবিতাটি হ'ল :

এই পৃথিবীর

এই পৃথিবীর বুকের ভিতর কোথাও শান্তি আছে;
অঘ্রাণ মাস বাত্রি হ'লে অনেক বিষয়াবিষের সমাধান
মাঠে জলে পাখির নীড়ে নক্ষত্রেতে থাকে;
অমেয় গোলকধাঁধাঁয় ঘুরে প্রাণ
চেষ্টা করে সমাজ জাতি সময় সৃষ্টি সঠিক বুঝে নিতে।
সকল প্রয়াণ সফল হবে গ্লাশিয়ারের দীপ্তি আসার আগে;
এখন রৌদ্রে আজন্মকাল অনুষ্ঠানের দিন;
সফল হতে ইতিহাসের অনেক দিন লাগে।
সে সফলতা এই পৃথিবী— হয়তো সৃষ্টি চূর্ণ হ'লে হবে;
আমি অনেক দূরের থেকে তাহার কারণধ্বনি
নদীর জলে সমস্ত দিন ক্রন্দসী উজ্জ্বল;
তোমায় আমি ভালোবাসি— এই সত্য স্বভাব পৃথিবীর
দানের মতন নিজেরই ফলাফল।

পূর্বাশা
১৩৬০ বৈশাখ

দেখা যাচ্ছে, *পূর্বাশা*-র ও *কৃত্তিবাস*-র কবিতায় কত তফাৎ! কেন এমন হ'ল?

কবিতাটি *পূর্বাশা*-র বৈশাখ সংখ্যায় ৩, ৪ ও ৫ পৃষ্ঠায় ছাপা হয়েছিল। এই ৪০ লাইনের কবিতার— কবিতার শিরোনাম ও কবির নাম সহ প্রথম ১০ লাইন ছাপা হয় ৩-এর পাতার শেষ দিকে, অন্য একটি কবিতার শেষে। *পূর্বাশা*-র ঐ সংখ্যার পুরা ৪-এর পাতায় ছাপা হয় শুধু কবিতার ২৬ লাইন। আর ৫-এর পাতায় প্রথমে একজনের একটি কবিতার উপরে ছাপা হয় এই কবিতার শেষ ৪ লাইন।

সুব্রতবাবু অথবা তাঁর নিযুক্ত এই কবিতার নকলকারী ঐ সংখ্যা *পূর্বাশা* থেকে এই কবিতাটি নকল করতে গিয়ে অমনোযোগবশত বা অসতর্কতাবশত ৩-এর পাতা

থেকে কবিতা নকল করে, পাতা উল্টে বাঁদিকে ৪-এর পাতাটা সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে ৫-এর পাতার কবিতা নকল করেন। তাও তখন আবার এই পাতার প্রথম লাইনটা নকলের সময় কীভাবে বাদ দিয়ে দেন। ফলে সুব্রতবাবু অথবা তাঁর নিযুক্ত নকলকারীর নকলে এই কবিতার মাঝের একেবারে একটানা ২৭ লাইন বাদ পড়ে যায়। পরে এইভাবে নকল করে আনা ঐ ২৭ লাইন বাদ দেওয়া কবিতা 'এই পৃথিবীর' নামেই *কৃত্তিবাস*-এ ছাপা হয়।

জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ তাঁর *আলো পৃথিবী* বইয়ে, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ* গ্রন্থে, আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর প্রকাশিত-*অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র ঃ জীবনানন্দ দাশ* গ্রন্থে *কৃত্তিবাস*-এ প্রকাশিত ঐ ২৭ লাইন বাদ দেওয়া কবিতা 'এই পৃথিবীর' নিয়ে হুবহু দেওয়ায়, এঁদের সকলেরই বইয়ে ঐ গুরুতর ভুলটা এসে গেছে।

মূল কবিতায় দশম লাইনের পর দ্বাদশ লাইনে এসে কবি তাঁর এই অংশের বক্তব্য সম্পূর্ণ করেছেন এবং দ্বাদশ লাইনের শেষে পূর্ণচ্ছেদ বা '।' দিয়েছেন। কৃত্তিবাসে এই কবিতায় দশম লাইনের পর শেষের ৩ লাইন দেওয়া হয়েছে, তাতে দশম লাইনের পর ঐ শেষের ৩ লাইনের প্রথম লাইনটা বসায় এখানে কবিতা অর্থহীন এবং কিছুটা উদ্ভট হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর মূল কবিতাব ২য় পংক্তির 'বিষয় বিষের' শব্দটা দেবীপ্রসাদবাবুর বই বাদে আলোচ্য অন্য বইপত্র সব ক'টিতেই হয়েছে— বিষয়া বিষের।

উপলব্ধি

যা পেয়েছি সে সবের চেয়ে আরো স্থির দিন পৃথিবীতে আসে,
আসে না কি?
চারিদিকে হিংসা দ্বেষ কলহ রয়েছে;
সময়ের হাত এসে সে সবের অমলিন, মলিন প্রেরণা
তবুও তো মুছে দিয়ে যেতে পারে,— ভাবি।

সেই আদি কাল থেকে আজকের মুহূর্ত অবধি
মানুষের কাহিনীর যতদূর হয়ে গেছে তাতে
প্রান্তে ঠেকে দেখেছি কেবলি :
মলিন বালির দান নিয়ে তার মরুভূমি সূর্যের কিরণে দাঁড়াতে
শিখেছে অনেক দিন;
শিখেছিল-দেখেছিল অনাদির সরীসৃপদের রণ
কেলি কাম বিচরণ,—

যুগে যুগে ক্ষুধা লোভ লালসার হানাহানি অপমৃত্যু, অন্ধকার স'য়ে
মাঝে মাঝে দিগন্তের অন্নপূর্ণা মরীচিকা হয়ে
জলের লেখার মত বুদবুদে হারাতে শিখেছিল—
তবুও তো
মানুষের কাছে মানুষে দাবী র'য়ে গেছে মনে ভেবে হৃদয়ে কুয়াশা
করুণ প্রশ্নের মত খেলা ক'রে গেছে ঢের দিন।
আমাদের পায়ে চলা পথ ঘিরে অব্যক্ত ব্যথার
কবেকার নচিকেতা— আজকের মানুষের হাড়
প্রাণের সমুদ্রে সুবে ফেনশীর্ষ ঢেউয়ের উপরে
সূর্যের দিগন্তে দেশে আমাদের তুলে নিতে চায়;
নিঃসহায় ডুবুরির মত ডুবে মরে;
সমুদ্রপাখীর শাদা, বিরহীর মতন ডানায়
সেই শূন্য অন্ধকার, দিকের ভিতরে
আমাদের ইতিহাস পিরামিড ভেঙ্গে ফেলে;—

লণ্ডন— ক্রেমলিন গড়ে।
কেবলি আশঙ্কা, ব্যথা নিরাশার সম্মুখীন হয়ে
মানুষের মরণের সমুদ্রের ঢেউ
রূপান্তরিত করে নিতে চেয়ে মানুষের জীবনের সুর
জেনেছি কোথাও ভয় নেই— নেই— নেই।
তবুও কোথাও ধর্মমন্দিরের অভয়পাণির সফলতা
আবার ভোরের সূর্যে সমুখে রবে না কোনো দিন।
কবের প্রথম অবপ্রাণনায় জেগে
শাদা পাতা খুলেছিল যারা,
গল্প লিখে গিয়েছিল ঢের,
আদি রৌদ্র দেখেছিল,
সিন্ধুর কল্লোল শুনে গিয়েছিল ঢের, দিয়ে গিয়েছিল,
আকাশের মুখোমুখি অন্য এক আকাশের মত যারা নীল হয়ে
রাত্রি হয়ে নক্ষত্রের মত হয়ে মিশে গিয়েছিল :
তারা আর তাদের মরণ আজ আমাদের
পায়ের পথের নীচে যতদূর ভুল
তাহাদের অস্তসূর্য ততদূর আমাদের উদয়ের মতন অরুণ;
শ্বেতাশ্বতর থেকে দীপঙ্কর অবধি সবই সাদা স্বাভাবিক
মনে হয় ব'লে মৃত স্বভাবের মতন করুণ।

বিকেলের ক্ষয়ের ভিতরে এসে আজ তবে আমাদের দিন
অনিবার ইতিহাস অঙ্গারের প্রতিভাবে সঞ্চয়ের মত মনে ভেবে
মরণকে যা দেবার— জীবনকে যা দেবার সব
কঠিন উৎসবে— দীন অন্তঃকরণে দিয়ে দেবে।

উত্তরসূরী
১৩৬১ পৌষ-ফাল্গুন

১৩৬১ সালের পৌষ-ফাল্গুন সংখ্যা *উত্তরসূরী* পত্রিকায় 'উপলব্ধি' নামে জীবনানন্দের ৪৯ লাইনের এই কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। *কৃত্তিবাস*-এ সুব্রতবাবুর সংকলনে এই কবিতার প্রথম ১০ লাইনের পর টানা ৫ লাইন বাদ দিয়ে উদ্ধৃত হয়েছে। কবিতার ষোড়শ লাইনকে একাদশ লাইন করে বাকি অংশটা ছাপা হয়েছে।

৫ লাইন বাদ যাওয়া এই কবিতাকে সঠিক ভেবে অশোকানন্দবাবু, দেবীপ্রসাদবাবু এবং সৈয়দ সাহেব এঁদের নিজ নিজ বইয়ে দিয়েছেন।

এই কবিতার ৮ম লাইনের 'দেখেছি' শব্দটা আবার অশোকানন্দবাবু এবং দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে হয়েছে 'দেখছি'।

উত্তরসূরী-তে মূল কবিতায় স্তবকের ন্যায় যে ক'টা ভাগ ছিল, *কৃত্তিবাস*-এ এবং আলোচ্য ৩টি গ্রন্থে তা আর নেই।

গতিবিধি

সবর্দাই প্রবেশের পথ র'য়ে গেছে;
এবং প্রবেশ ক'রে পুনরায় বাহির হবার;—
অরণ্যের অন্ধকার থেকে এক প্রান্তরের আলোকের পথে;
প্রান্তরের আলো থেকে পুনরায় রাত্রির আঁধারে;
অথবা গৃহের তৃপ্তি ছেড়ে দিয়ে নারী, ভাঁড়, মক্ষিকার বারে।

এই সব শরীরের বিচরণ।
ঘুমায়ে সে যেতে পারে।
(সচেতন যাত্রার পথ তবু আরো প্রসারিত।
আলো অন্ধকার তার কাছে কিছু নয়।)
উট পাখি সারাদিন দিবারৌদ্রে ফিরে
বালির ভিতরে মাথা রেখে দিয়ে আপনার অন্ধ পরিচয়
হয়তো বা নিয়ে যায়,— হয়তো তা' পাখির বিনয়।

কোনো এক রমণীকে ভালোবেসে,
কোনো এক মড়কের দেশে গিয়ে জোর পেয়ে,
কোনো এক গ্রন্থ প'ড়ে প্রিয় সত্য পেয়ে গেছি ভেবে,
অথবা আরেক সত্য সকলকে দিতে গিয়ে অভিভূত হ'য়ে,
শরতের পরিষ্কার রাত পেয়ে সব চেয়ে পোষাকী, উজ্জ্বল—
অথবা সবের চেয়ে দূরতম নক্ষত্রকে অকৃত্রিম বুঝে
চিন্তা তবু বর্ষারাতে দ্বার থেকে দ্বারে
ভিজে কুকুরের মত গাত্রদাহ ঝাড়ে।

সমাধির ঢের নিচে— নদীর নিকটে সব উঁচু উঁচু গাছের শিকড় গিয়ে নড়ে।
সেইখানে দার্শনিকদের দাঁত ক্বাথ পান করে
পরিত্যক্ত মিঠে আলু, মরা মাস, ইঁদুরের শবের ভিতরে;—
জেনে নিয়ে আমরা প্রস্তুত ক'রে নেই নিজেদের;
কেননা ভূমিকা ঢের র'য়ে গেছে,—
বোঝা যাবে (কিছুটা বিনয় যদি থেকে থাকে চোখে)—
সুশ্রী ময়ূরেরা কেন উটপাখি সৃষ্টি ক'রেছিল
টানাপোড়েনের সুরে— সূর্যের সপ্তকে।

১৩৪৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা *নিরুক্ত* পত্রিকায় 'গতিবিধি' নামে জীবনানন্দের এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় 'জীবনানন্দ দাশের অগ্রন্থিত কবিতা'র মধ্যে এই কবিতাটিও ছাপা হয়েছে। সুব্রত রুদ্র *নিরুক্ত* থেকে কবিতাটি নিয়ে *কৃত্তিবাস*-এ দিতে গিয়ে এই কবিতার উদ্ধৃতিতে কয়েকটা ভুল করেছেন।

১. মূল কবিতায় ১৮ সংখ্যক পংক্তি 'অথবা সবের চেয়ে দূরতম নক্ষত্রকে অকৃত্রিম বুঝে'— এইটা *কৃত্তিবাস*-এ বাদ পড়েছে।
২. মূল কবিতার ১২. সংখ্যক পংক্তি 'হয়তো বা নিয়ে যায়,— হয়তো তা' পাখির বিনয়'— এই পংক্তির দ্বিতীয় 'হয়তো'টা *কৃত্তিবাস*-এ নেই।
৩. মূল কবিতার শেষ লাইনের আগের লাইনের 'সুশ্রী ময়ূরেরা' *কৃত্তিবাস*-এ হয়েছে— সুশ্রী ময়ূরও।

অশোকানন্দবাবু, দেবীপ্রসাদবাবু এবং সৈয়দ সাহেবও এঁরা *নিরুক্ত* পত্রিকায় প্রকাশিত মূল কবিতা না দেখে *কৃত্তিবাস*-এ প্রকাশিত এই কবিতা নিয়ে নিজেদের বইয়ে দিয়ে ঐ একই সব ভুল করেছেন।

পটভূমি

আকাশ ভ'রে যেন নিখিল বৃক্ষ ছেয়ে তারা
জেগে আছে কূলের থেকে কূলে;
মানবজাতির দু-মুহূর্তের সময়-পরিসর
অধীর অবুঝ শিশুর শব্দ তুলে
চেয়ে দেখে পারাপারের ব্যাপ্ত নক্ষত্রেরা
আগুন নিয়ে বিষম, তবু অক্ষত স্থির জীবনে আলোকিত।
ওদের চেয়ে অনেক বেশি স্বাধীন হ'য়ে তবু
মানুষ আজো স্বাধীনতার মূল্য শেখে নি তো।

মানুষ যেদিন প্রথম এই পৃথিবী পেয়েছিল
সেই সকালের সাগর সূর্য অনমনীয়তা
আমাদের আজ এনেছে যেই বিষম ইতিহাসে—
সেখানে গ্লানি হিংসা উত্তরাধিকারের ব্যথা
মানুষ ও তার পটভূমির হিসেবে গরমিল
রয়েছে ব'লে কখনো পরিবর্তনীয় নয়?
মানুষ তবু সময় চায় সিদ্ধকাম হ'তে :
অনেক দীর্ঘ অসময়— অনেক দুঃসময়।

চারিদিকে সৈন্য বণিক কর্মী সুধী নটীর মিছিল ঘোরে;
তাদের সবের সহগামীর মতো
ইতিহাসের প্রথম উৎস থেকে
দেখেছি মানুষ কেবলি ব্যাহত
হয়েও তবু ভবিষ্যতের চক্রবালের দিকে
কোথাও সত্য আছে ভেবে চলেছে আপ্রাণ ঃ
পটভূমির থেকে নদীর রক্ত মুছে মুছে
বিলীন হয় যেমন সেসব পটভূমির স্থান।

১৩৬০ সালের ফাল্গুন সংখ্যা *ক্রান্তি* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'পটভূমি' নামের এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়। *ক্রান্তি* পত্রিকা থেকে এই কবিতা নিয়ে *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় 'জীবনানন্দ দাশের অগ্রন্থিত কবিতা'র মধ্যে ছাপা হয়েছে। কিন্তু সংকলক *ক্রান্তি* পত্রিকা থেকে এই 'পটভূমি' কবিতা সংকলন করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত কিছু ভুল করেছেন। সেই ভুলই *কৃত্তিবাস*-এ ছাপা হয়েছে। ভুল হচ্ছে :

১. মূল কবিতার ৮ম লাইন 'মানুষ আজো স্বাধীনতার মূল্য শেখে নি তো'— *কৃত্তিবাস*-এ নেই।

২. মূল কবিতায় ১২ সংখ্যক লাইন— 'সেখানে গ্লানি হিংসা উত্তরাধিকারের ব্যথা'— এর 'সেখানে' শব্দ *কৃত্তিবাস*-এ হয়েছে 'যেখানে'।
৩. মূল কবিতা ৮ পংক্তি করে ৩টি স্তবকে *ক্রান্তি* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। *কৃত্তিবাস*-এর সংকলনে ঐ স্তবক ভাগ নেই। টানা ছাপা হয়েছে।
৪. কবিতার ১৭ সংখ্যক পংক্তির পর, *কৃত্তিবাস*-এ একটা পংক্তি আছে— 'মুখ ফেরাবার আগে'। সংকলক এ পংক্তি কোথায় পেলেন কে জানে! *ক্রান্তি* পত্রিকায় মূল কবিতায় এ পংক্তি নেই।

দেবীপ্রসাদবাবু, অশোকানন্দবাবু এবং সৈয়দ সাহেব এঁদের নিজেদের বইয়ে *কৃত্তিবাস*-এর এই 'পটভূমি' কবিতাকে সঠিক ভেবে দিয়ে ঐ মারাত্মক ভুলগুলো করেছেন।

জার্মানীর রাত্রিপথে : ১৯৪৫

সে এক দেশ অনেক আগের শিশুলোকের থেকে
সাগরগামী নদীর মত স্বরে
আমার মনের ঘুঘুমরালস্রংসী ঝাউয়ের বনে
আধো আলোছায়াচ্ছন্ন ভাবে মনে পড়ে
টিউটনের গল্পে ছড়ায় সাগায় সূর্যালোকে
থেকে থেকে আভাস দিয়ে যেত;—
গ্রিমের থেকে হীগেল শিলার সানুজ দানবীয়
গ্যেটের সে দেশ সূর্য অনিকেত?

মাঝে মাঝে আমার দেশের শিপ্রা, পদ্মা, রেবা, ঝিলম, জলশ্রীকে আমি
সর্পীবোনের মতন কোথাও পাহাড় অবধি
অথবা নীল ভূকল্লোলে সাগর সুভাষিত
করতে গিয়ে শুনেছিলাম রাইনের মত নদী
কি এক গভীর হ্লাইমারী মেঘ সূর্য বাতাস নিয়ে
নর-নারী নগর গ্রামীণতায় ব্যাপ্ত রীতি
লক্ষ্য ক'রেই সবিতাসাধ জানিয়েছিল; তিন দশকের পরে
এ-সব স্বপ্নমিশেল কি এক শূন্য অনুমিতি।

যদিও আমি আজো বেশি সূর্য ভালোবাসি
তবুও যারা মনের নীহারিকার পথে ঠাণ্ডা অমল দিন
জাগিয়ে সূর্যপ্রতিম আকাশ সমাজ নিয়ে যাত্রা ক'রেছিল

সে সব হৃদয়গ্রাহী টোলার রিলকে হ্যোল্ডার্‌লিন
সবংশে কি হারিয়ে গেছে রাইখ্‌শরীবের থেকে?—
ব্যক্তি স্বাধীনতায় ঘুরে অনাথ মানবতার লেন্‌দেন
শুধতে ভুলে গিয়ে কি ভয় রক্ত গ্লানি রিরংসা ফুঁপায়ে
বেখে গেছে অমোঘ বর্বরতার বেল্‌জেন্‌?
বর্বরতা কোথায় তবু নেই?— তবু এই প্রশ্ন-আতুর মনে
গভীরতর হৃদয়ব্যাধির ঈষৎ সমাধান
আজকে ভীষণ নিরুদ্দেশের অন্ধকারে রয়েছে টিউটন?
রোন্‌কে চিনি,— ইউরোপের হৃদয়ে রাইন্‌যান
সহোদরার মতন রৌদ্র আকাশ মাটি যব গোধূমের পাশে
যুগে যুগে উত্তরণের লক্ষ্যে প্রবেশ ক'রে
এনেছিল কাণ্ট কাথিড্রাল দৈবতদের ঊষাপ্রদোষ অখল ভাগনেরের
অভিনিবেশ-বলয়িত গ্যেটের সূর্যকরে।

যদিও তা ব্যক্তিকতার মায়ার মৃগতৃষ্ণাতীত,— তবু
চমৎকৃত হয়েছিল ইউরোপের ভাবনাধূসর মন;
সৌরকরভ্রমে ঊনবিংশ শতকীরা
হয়তো তাকে ঘরের বহিরাশ্রয়িত দিব্য বাতায়ন—
বাতায়নের বাইরে মেঘের সূর্য ভেবেছিল;
আমরা আজো অনেক জেনে এর বেশি কি ভাবি?
ইতিহাসের ভূমায় সীমাস্বল্পতাকে যাচাই করার রীতি
গ্যেটের ছিল;— তবুও সীমার কী ভয়ঙ্কর বৈনাশিকী দাবী!

সেই তো' পায়ের নিচে রাখে পরমপ্রসাদগভীর তনিমাকে
সময়পুরুষ বলে : 'তুমি নিজের কালের ভার
ব'য়েছিলে লীলায়িত সৌরতেজে;— এ যুগ তবু অন্য সকলের;
আরেক রকম ব্যতিক্রমের,— হে কবি, হ্বাইমার!'
সময় এখন জ্যোতির্ময়ী অমেয়তার প্রবাস থেকে ফিরে
নিরিখ পেয়ে গেছে নিজের নিঃশ্রেয়সের পথে :
সেইখানে কাল লোকাতীত হতে গিয়ে কোথাও থেমে যায়
ক্রান্তি আলোর বয়স বেড়ে গেলে কঠিন রীতির জগতে

নবজাতক অর্থনীতি সমাজনীতি কলের কণ্ঠে কি প্রাণ কাকলী?
এই পৃথিবীর আদিগন্ত ব্যক্তি শবের শেষে
দেখা দেবে হয়তো নতুন সুপরিসর নাগর সভ্যতায়
মানবতার নামে নবীন ব্যক্তিহীনতাকে ভালোবেসে;

হয়ত নগর রাষ্ট্র সফল হয়ে গেলে নাগরিকের মন
হৃদয়প্রেমিক হয়ে যাবে সবার তরে— উচিত অনুপাতে;
জড়-রীতির-অর্থনীতির সনির্বচন মেসিন ভেনে এসব যদি হয়
তা হলে তা অমিয় হোক আন্তরিকতাতে।

জীবনানন্দের এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৩ সালের ভাদ্র সংখ্যা মাসিক *বসুমতী* পত্রিকায়।

১৩৮৫ সালের আশ্বিনে প্রকাশিত *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় সুব্রত রুদ্র *বসুমতী* পত্রিকা থেকে এই কবিতাটি নিয়ে 'জীবনানন্দ দাশের অগ্রন্থিত কবিতা'র মধ্যে দিয়েছেন। তিনি *বসুমতী* পত্রিকা থেকে এই কবিতা নিয়ে *কৃত্তিবাস*-এ দিতে গিয়ে এই কবিতার ৭ম পংক্তি করেছেন—

'গ্রিমের থেকে...শিলার সানুজ দানবীয়' অর্থাৎ যে কোনো কারণে হোক তিনি মূল কবিতার 'হীগেল' শব্দটা না দিয়ে, সেখানে '...' দিয়েছেন।

তৃতীয় শব্দ 'ঘুঘুমরালস্রংসী'কে সুব্রত রুদ্র করেছেন 'ঘুঘুমরালস্রংসী' দেবীপ্রসাদ করেছেন 'ঘুঘুমরালহংসী'— কিন্তু জীবনানন্দ *স্রংসী* নামে কোনো ভুল শব্দ ব্যবহার করেন নি। 'স্রংসী' অর্থ স্খলিত, ভ্রষ্ট, চ্যুত, শিথিল। (*বঙ্গীয় শব্দকোষ* (২), হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।)

এই কবিতায় ২য় স্তবকের ৬ষ্ঠ পংক্তির 'ব্যাপ্তরীতি' *কৃত্তিবাস, আলোপৃথিবী*-তে এবং *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ*-য় হয়েছে, 'ব্যস্তরীতি'। সৈয়দ সাহেব তাঁর ওখানকার বাংলা একাডেমিতে ঐ সংখ্যা *বসুমতী* দেখেছিলেন বলেই তাঁর বইয়ে এই কবিতার পাঠ 'ব্যাপ্তরীতি'ই রেখেছেন। এবং এইজন্যই তিনি এই কবিতায় তৃতীয় স্তবকের ৭ম পংক্তিতে উপরোক্ত *কৃত্তিবাস* প্রভৃতিতে 'ফুঁপিয়ে' থাকলেও তিনি মূল অনুযায়ী 'ফুঁপায়ে' করেছেন।

কিন্তু এ সব সত্ত্বেও সৈয়দ সাহেব তাঁর বইয়ে এই কবিতার মূল পাঠ থেকে বিচ্যুত হয়ে *কৃত্তিবাস* প্রভৃতির পাঠের ন্যায় ৩য় স্তবকের ৮ম পংক্তির 'রেখে গেছে'কে করেছেন 'রেগে গেছে', আর ৬ষ্ঠ স্তবকের ৭ম পংক্তিকে করেছেন—

সেইখানে কাল লোকাতীত হতে গিয়ে কোথাও থেমে গিয়ে—

মূল কবিতার 'থেমে যায়' হয়েছে— থেমে গিয়ে।

মহাজিজ্ঞাসা

ছিলাম কোথায় যেন নীলিমার নীচে;
সৃষ্টির মনের কথা সেইখানে আবছায় কবে
প্রথম রচিত হতে চেয়েছিল যেন।
সে ভার বহন ক'রে চ'লে
আজ কাল অনন্ত সময়
সেকেণ্ডে মিনিট পলে বার বার ক্ষয়
পেয়েছে; তবুও এই সময়ের অহরহ ক্ষমাহীন গতি
থামিয়ে এ পৃথিবীতে স্থির কিছু এনেছে কি?—
যে স্থিরতা বারবার দিয়ে যায় রাত্রির নিয়তি,
পৃথিবীর দিন যে দাহন দেয়,— সেই সব ছাড়া
আরো বড় মানে এক— মহাপ্রাণসাগরের সাড়া?

নিরন্তর বহমান সময়ের থেকে খসে গিয়ে
সময়ের জালে আমি জড়িয়ে পড়েছি;
যতদূর যেতে চাই এই পটভূমি ছেড়ে দিয়ে—
চিহ্নিত সাগর ছেড়ে অন্য এক সমুদ্রের পানে

ইতিহাস ছেড়ে দিয়ে ইতিহাসহীনতার দিকে—
মনে হয় এই আধ কণা জল দিয়ে দ্রুত রক্ত নদীটিকে
সচ্ছল অমল জলে পরিণত করতে চেয়েছি।
মানুষের কত দেশ কাল
চিন্তা ব্যথা প্রয়াণের ধূসর হলুদ ফেনা ঘিরে
সংখ্যাহীন শৈবাল জঞ্জাল
সে নদীর আঘাটার জলে
তমসার থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে সময়ের অন্ধ মর্মস্থলে
অন্ধকারে ভাসে।
তবু তারা নীলিমার তপনের অমৃতত্ব বুকের আকাশে
ধরে নিতে চেয়েছিল বুঝি;—
সাহস সাধনা প্রেম আনন্দের দিক লক্ষ্য ক'রে
আমরাও সূর্য খুঁজে নিতে গিয়ে গ্রহণের সূর্য কি খুঁজি?

এঁকেবেঁকে প্রজাপতি রৌদ্রে উড়ে যায়—
আলোর সাগর ডানে— আনন্দসমুদ্র তার বাঁয়ে;
মহাশূন্যে মাছরাঙা আগুনের মত এসে জ্বলে,
যেন এই ব্রহ্মাণ্ডের শোকাবহ রক্তে অনলে
মানে খুঁজে পেয়েছে সে অন্তহীন সূর্যের ঋতুর :
জ্ঞানের অগম্য এক অহেতুক উৎসবের সুর
জাগিয়ে বুদ্ধির ধাঁধাঁ দু মুহূর্ত দীপ্ত ক'রে পাখি
মানুষকে ফেলে গেল তবু তা চেতনার ভিতরে একাকী।
শূন্যকে শূন্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে শেষে
কোথায় সে চ'লে গেল তবে।

কিছু শীত কিছু বায়ু আবছা কিছু আলোর আঘাতে
ক্ষয় পেয়ে চারিদিকে শূন্যের হাতে
নীল নিখিলের কেন্দ্রভার
দান ক'রে অন্তর্হিত হ'য়ে যেতে হয়?

শূন্য তবু অন্তহীন শূন্যময়তার রূপ বুঝি;
ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস;—
যদি না মানব এসে তিন ফুট জাগতিক কাহিনীতে হৃদয়ের নীলাভ আকাশ
বিছিয়ে অসীম ক'রে রেখে দিয়ে যায় :
অপ্রেমের থেকে প্রেমে গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়।

আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া, ১৩১৬ আশ্বিন

আলোচ্য *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় ৬৪ পৃষ্ঠায়, *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ* গ্রন্থের ৬৩৪ পৃষ্ঠায় এবং *কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* বইয়ের ৩৮৬ পৃষ্ঠায় এই কবিতাটি আছে। *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় এবং উপরোক্ত বই দুটিতে উল্লেখ আছে যে এই কবিতাটি ১৩৬১ সালের শারদীয় সংখ্যা *আনন্দবাজার পত্রিকা* থেকে সংগৃহীত।

ঐ সংখ্যা *আনন্দবাজার পত্রিকা* থেকেই সংগ্রহ করা এই কবিতার একটি নকল আমার কাছে আছে। তাতে দেখছি— কবিতার ৭ম পংক্তি 'পেয়েছে; তবুও এই সময়ের অহরহ ক্ষমাহীন গতি'-র 'ক্ষমাহীন' শব্দটি *কৃত্তিবাস* প্রভৃতিতে নেই, বাদ পড়েছে।

আর এই কবিতার ২য় পংক্তির 'সেইখানে আবছায় কবে' ঐ *কৃত্তিবাস* প্রভৃতিতে হয়েছে— 'সেইখানে আবছায়া করে'। এবং ১০ম পংক্তির 'দাহন' শব্দটা *কৃত্তিবাস*-এ ও *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ* বইয়ে, সৈয়দ সাহেবের বইয়েও হয়েছে 'দহন'।

যাত্রী

মানুষের জীবনের ঢের গল্প শেষ
হ'য়ে গেল র'য়ে যায় চারিদিক ঘিরে এই দেশ;
নদীমাঠ পাখিদের ওড়াউড়ি গাছের শিয়রে
কমলা রঙের ঢেউয়ে এসে কিছুক্ষণ খেলা করে।

মনে হয় কোথাও চিহ্নিত এই রৌদ্র ছিল কবে;
মানুষ সার্থক নয়— তবুও সার্থকতর হবে :
মনে হ'ত কাজ ক'রে কথা ব'লে গ্রন্থ মিলিয়ে,
মননের তীর থেকে আরো দূর তীরতটে গিয়ে।

সময় নিজেই তবু সব চেয়ে গভীর বিপ্লবী
ফুরিয়ে ফেলেছে সেই দিনরাত্রি সেরা সত্য উদ্‌ঘাটন সবি,
সেদিনের হৃদয়ের উষ্ণ উত্তেজিত রক্ত স্থির
ক'রে ফেলে অন্য নব কলেবরে গড়েছে শরীর।

বাহিরে ভিতরে লীন হয়ে থাকে মন,
শান্ত— আরো শান্ত হয় অন্তঃকরণ;
পুরোনো দিনের স্তম্ভ দুচারটে পশ্চিমের আঁধারের কাছে;
নব সূর্যে সম্মেলন-যাত্রা— যাত্রা যাত্রা যাত্রা আছে।

১৩৫৯ সালের চৈত্র সংখ্যা *কবিতা* পত্রিকায় এই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। *ঐ সংখ্যা কবিতা পত্রিকা থেকে এই কবিতাটি নিয়ে কৃত্তিবাস পত্রিকায় দিতে গিয়ে*

সংকলক কবিতার ৩য় স্তবকের ৩য় লাইনে একটু ভুল করেছেন। *কবিতা* পত্রিকায় ঐ ৩য় লাইন আছে— 'সেদিনের হৃদয়ের উষ্ণ উত্তেজিত রক্ত স্থির'। সংকলকের উদ্ধৃতিতে এই পংক্তির 'রক্ত' শব্দ বাদ পড়েছে। হয়েছে :

সেদিনের হৃদয়ের উষ্ণ উত্তেজিত স্থির।

কৃত্তিবাস-এর এই কবিতা— অশোকানন্দবাবু তাঁর বই-এর ৭০ পৃষ্ঠায়, দেবীপ্রসাদবাবু তাঁর বইয়ের ৬০৬ পৃষ্ঠায়, সৈয়দ সাহেব তাঁর বইয়ে ৩৮২ পৃষ্ঠায় ছেপেছেন। এঁদেরও সকলের বইয়েই এই কবিতার 'রক্ত' শব্দটা বাদ পড়েছে।

দিনরাত্রি

সমস্ত দিন
সমস্ত পৃথিবীই যেন আকাশ।
চারিদিকে রৌদ্রেব ভিতর রয়ে গেছে নির্মল জলের অনুভূতি,
জল আকাশ ও আগুনের থেকে এই সব রাত্রির জন্ম হয়;
অন্তহীন শুভ্র বিবেকী নক্ষত্রের;
এই সব স্থায়ী জিনিষ চল-বিশ্বলোকের;
মানব জীবনের; এদের অনবচ্ছিন্ন উজ্জ্বল প্রবাহে ধৌত হয়ে
সমস্ত গৃহযুদ্ধের গৃহবলিভূকদের রক্তের
শেষ বিন্দুও খুঁজে পাবে না কোথাও,
কোথাও থাকবে না আন্তর্জাতিক অন্যায়ের ছায়া আর।

দেখা যাবে দিন সূর্যশরীরী;
যাযাবর হাঁসকে নিয়ে চলেছে মেঘের
ফেনা ওড়ানো দূরতর নীলিমায়;
জেগে উঠবে বিকেলের শিয়রে
সাগরের বাতাস যেন— দূর ময়দানের;
অন্তহীন নক্ষত্রের চলা ফেরার দেশে পাওয়া যায় তাকে;
ঐ ঝাউ গাছের আঁধারের ভিতরেও;
বন্দরে নগরে
মানুষের হিংস্র বেড়ালের মত গর্জনকে বিনমিত ক'রে
করুণার রাত্রিঋতুর মত
পাওয়া যায় তাকে— পাওয়া যায় তাকে।

আজকের মলিনতা রক্ত কোথায় লীন হয়ে যাচ্ছে

সময়ের মনে— নিরবচ্ছিন্ন বিসরণে-
দিন ও রাত্রির অন্তহীন
জলঝর্ণার শুশ্রূষার শব্দের ভিতর।

পূর্বাশা
ফাল্গুন, ১৩৫৬

এই কবিতাটি অশোকানন্দবাবুর এবং দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে আছে। এঁদের উভয়ের বইয়েই এই কবিতার ২য় স্তবকের নবম পংক্তির 'মানুষের হিংস্র বেড়ালের মত গর্জনকে' হয়েছে— 'মানুষের হিংস্র বেড়ালের গর্জনকে'। 'মত' শব্দটা বাদ গেছে। ৩য় স্তবকের ৩য় পংক্তি 'দিন ও রাত্রির অন্তহীন' অশোকানন্দবাবুর বইয়ে ঠিক থাকলেও, দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এই পংক্তির 'রাত্রির' হয়েছে 'রাত্রিরে'।

কৃত্তিবাস-এ সুব্রতবাবুর সংকলনে এ কবিতা নেই। সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এ কবিতা ঠিক আছে। তবে তিনি তাঁর বইয়ের শেষে 'পত্রিকার প্রকাশিত কবিতা' অধ্যায়ে *পূর্বাশা*-য় প্রকাশিত জীবনানন্দের কবিতাবলীর তালিকায় এই কবিতা প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'দিনরাত্রি'। ফাল্গুন ১৩৬২।— এটা ভুল। হবে ফাল্গুন ১৩৫৬।

মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল

মৃত্যু আর মাছরাঙা ঝিলমিল পৃথিবীর বুকের ভিতরে
চারিদিকে রক্ত ঋণ গ্লানি ধ্বংসকীট নড়ে চড়ে।
তবুও শিশির সূর্য নক্ষত্র নিবিড় ঘাস নদী নারী আছে;
হারিযে যেতেছে প্রায় আজ।
মানুষের সাথে মানুষের প্রিয়তর পরিচয়
নেই নেই আর;
আলো আছে তবুও— আলোয় ভ'রে রয়েছে অনন্ত অন্ধকার।

জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ গ্রন্থে ৬১০ পৃষ্ঠায় এই কবিতা আছে। এই কবিতা প্রাপ্তির সূত্র হিসাবে ঐ বইয়ে 'কবিতা নাম ও প্রকাশসূচী' অধ্যায়ে ৮৬৮ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে— *ময়ূখ*, আশ্বিন ১৩৬০।

ঐ সংখ্যা *ময়ূখ* থেকে আমিও এই কবিতাটি সংগ্রহ করি। আমার সংগ্রহের এই কবিতার শেষ পংক্তি হ'ল,

'আলো আছে, তবুও আলোয় ভ'রে রয়েছে অনন্ত অন্ধকার'

দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এই কবিতার শেষ পংক্তির 'অনন্ত অন্ধকার' এর 'অনন্ত'টা নেই।

সৈয়দ সাহেবের বইয়ে ৪৫৬ পৃষ্ঠায় এ কবিতা আছে। তাঁর বইয়েও এই কবিতার শেষ পংক্তির 'অনন্ত' বাদ গেছে। এ কবিতা প্রথম কবে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধেও তিনি তাঁর 'পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা' অধ্যায়ে লিখেছেন : *ময়ূখ*, শরৎ ১৩৬০।

কৃত্তিবাস-এ এবং অশোকানন্দবাবুর বইয়ে এ কবিতা নেই।

নবপ্রস্থান

শীতের কুয়াশা মাঠে; অন্ধকারে এইখানে আমি।
আগত ও অনাগত দিন যেন নক্ষত্রবিশাল শূন্যতার
এই দিক— অথবা অপর দিক; দুয়েরি প্রাণের
বিচিত্র বিষয়জ্ঞানে মিলে গেছে;— তবুও প্রেমের
অমর সম্মতিক্রমে। পৃথিবীর যে কোনো মানব
দেশ কাল যে কোনো অপর দেশ সময় ও মানুষের তরে
সেবা জ্ঞান শৃঙ্খলার অবতার হয়ে সব বাধাব্যথাহারা
নবীন ভূগোললোকে মিশে গেছে;— দিকভ্রান্তিহীন
সারসের মত,— নীল আকাশকে ঈষৎ ক্রেংকারে
খুলে ফেলে। যা হয়েছে যা হয়নি সবই ঐ নক্ষত্রবীথির
একজন অথবা অপর জন;— নিজেদের হৃদয়যন্ত্রের
নিকটে সত্যের মত প্রতিভাত হয়ে উঠে তারা
অনন্ত অমার পটভূমির ভিতরে
অনিমেষে সময়ের মত জ্বলে;— মনে হয় আশা
অথবা নিরাশা যদি শতাব্দীর জীবনকে খেয়ে শেষ করে
পবিত্রতায় তবু দিক ও সময় মিলে একজন অমলিন তারা
অমিলের ঊর্ণা ধোঁয়া ছায়া কেটে মিলনের পথে
জ্ব'লে যায়; যায় না কি?— নিভু নিভু হয়ে শীতকালের দেয়ালে
ফুটে ওঠে; কথায় কারণে কামে অগণন ক্লেদে কনফারেনসে
বাতির অভাব হ'লে পৃথিবীর মানচিত্রে অন্ধকারে পথ
দেখাবার মত কোনো কাউকে না পেলে ঐ তারাবলী তারা
প্রাণের ভিতরে জড় মূল্যের অধিক ব্যাপ্তি;— চারিদিকে এই
অবিচ্ছিন্ন পাতা ছায়া শিশিরের নগরের হৃদয়কম্পনে ব'সে আমি
তোমাকে জাগায়ে দিয়ে, প্রিয়, সব কালীন জনীন
মানুষের এক জাতি এক দেশ এক মৃত্যু একটি জীবন এক
গহন আলোকে দেখি না কি? প্রেতের রোলের ভিতরে বাঙালীর

ঘর ভেঙে ঝ'রে গেলে জেনিভার অমেয় প্রাসাদ
ম'রে যায়;— ফ্ল্যাণ্ডাস, ভাডুন, ভিমি রিজ, উক্রেইন
হোয়াংহো নীপার রাইন চিনদুইনের পরে সব শব
কালকাতা হাওড়া মেদনীপুর ডায়মনহারবারে বাংলায়
অগণন মানবের মৃতদেহ প্রমাণিত হয়ে
কিরকম শুক্র সৌভ্রাত্রের মত, চেয়ে দেখ, ছড়ায়ে র'যেছে।
নতুন মৃত্যুর বীজ নয়— ওরা নতুন নেশন—
বীজ নতুন বঞ্চনা-ধ্বংস-মৃগতৃষ্ণাবীজ নয়; নব নব প্রাণনের
সংযমে পৃথিবী গ'ড়ে সফলতা পাবে মনে হয—
মানুষের ইতিহাসভনিতার দিন শেয ক'রে তার স্থির
প্রকৃতিস্থ আত্মার আলোর বাতায়নে।

আমার ব্যাহত ঘরে এ ছাড়া অপর কোনো বাতি
নেই আর, আমার হৃদয়ে নেই, এইখানে মৃত পোল্যাণ্ডের
সীমান রাইনের রোলে মিশে গিয়ে মরণকর্কশ জার্মেনির
হৃদয়ে পরে হিমধুমোজ্জ্বল অলিভ-বনের
আন্দোলনে এম্পিডোক্লেসের স্মৃতি বারবার জয় ক'রে নিয়ে
নবীন লক্ষ্যের গ্রীস্ নতুন প্রাণের চীন আফ্রিক্ ভারত প্যালেস্টাইন।
পৃথিবীর ভয়াবহ রাষ্ট্রকূট অন্ধকারে অন্তহীন বিদ্যুৎ-বৃষ্টিব
জ্যোতির্ময় ব্রেজিল পাথরে আমি নবীন ভূগোল
এরকম মানবীয় হয়ে যেতে দেখি;— ইতিহাস
মানবিক হয়ে ওঠে;— যাযাবর শ্রীজ্ঞানের মত
এখন অকুতোভয় উদাত্ত আবেগে
সঞ্চারিত হয়ে যাওয়া অর্বাচীন জেনে নিয়ে তবু
নতুন প্রাণের নব উদ্দেশের অভিসারী হতে
চায় নাকি— চায় না কি জনসাধারণ পৃথিবীর?
দেয়ালে ট্রামের পথে নর্দমায় ট্রাকের বিঘোরে হৃণিতের
অস্ফুট সিংহের শব্দে সবিস্ময় উত্তরচরিত্রে
ক্রমেই উজ্জ্বল হয়ে যেতে পারে বাংলার লোকশ্রুত বিবর্ণ চরিত।
আমার চোখের পথে আবর্তিত পৃথিবীর আঁকাবাঁকা রেখা
যতদুর চ'লে গেছে: কলকাতা নতুন দিল্লী ইয়াঙ্কী আফ্রিক্
দান্তের ইটালী শেক্স্পীরিয় ইংল্যাণ্ড মেঘ-পাতাল মর্ত্যের গল্পের
বিভিন্ন পর্বের থেকে উঠে এসে রবীন্দ্র লেনিন মার্কস ফ্রয়েড রোলাঁয়
আলোকিত হ'য়ে ওঠে; মুমুক্ষার অবতার বুদ্ধের চেয়েও
সমুৎসুক চোখ মেলে আপামর মানবীয় ঋণ—

রিরংসা-অন্যায়-মৃত্যু-আঁধারে উজ্জ্বল
পথিকৃত সাঁকোর মতন সব শতকের ভগ্নাংশকে শেষ
ক'রে দিয়ে পবিত্র সময় পথে মিশে গেছে;— সব অতীতের
মথিত বিষের মত শুদ্ধ হয়ে সহজ কঠিন দক্ষিণ-ভবিষ্যতে
মিলে গিয়ে মানবের হৃদয়ের গভীর অশোক
ধ্বনিময়তার মত তুমি হে জীবন, আজ রাতে অন্ধকারে আনন্দ সূর্যের
আলোড়নে আলোকিত ব'লেই তো মানব চলেছে।

যুগান্তর শারদীয়, ১৩৫৩ আশ্বিন

এই কবিতাটি *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় এবং *আলোপৃথিবী*, *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ* ও *কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* এই তিনটি বইয়েও আছে। কিন্তু *কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* বইটি বাদে ঐ সব বই পত্রে মূল এই কবিতার সঙ্গে কিছু পাঠান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যেমন :

১. কবিতার ৭ম পংক্তির 'বাধাব্যথাহারা' শব্দটি *কৃত্তিবাস*-এ, *আলোপৃথিবী* ও *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ* গ্রন্থে হয়েছে— বাধ্যব্যথাহারা।
২. ১০ম পংক্তির 'সবই ঐ' এর 'ঐ' *কৃত্তিবাস*-এ এবং আলোচ্য বই দুটিতে বাদ পড়েছে।
৩. ২১শ পংক্তির প্রথম শব্দ 'দেখাবার' উপরোক্ত পত্রিকা ও বই দুটিতে হয়েছে দেখবার।
৪. ২৬শ পংক্তির আলোক হয়েছে 'আলোকে'।
৫. ৩৬শ পংক্তির 'ক'রে' হয়েছে করে।

সৈয়দ সাহেবের *কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* বইয়ে এই পাঠান্তর বা ভুলগুলো নেই।

সমুদ্রচিল

সমুদ্রচিলের সাথে আজ এই রৌদের প্রভাতে
কথা ব'লে দেখিয়াছি আমি;
একবার পাহড়ের কাছে আসে,
চকিতে সিন্ধুর দিকে যেতেছে সে নামি;
হামাগুড়ি দিয়ে ভাসে ফেনার উপরে
মুছে যায় তরঙ্গের ঝড়ে।
দাঁড়ায়েছি শতাব্দীর ধূলো কাচ হাতে।।

তরঙ্গের তাড়া খেয়ে চ'লে যায় আরো দূর তরঙ্গের পানে—
ফেনার কান্তারে,
সৃষ্টির প্রথম রোদ যেইখানে
তাহার সোনালি ডানা ঝাড়ে;
যেখানে আকাশ নীল কোলাহলময়,
সমুদ্র করিছে দূর সমুদ্র সঞ্চয়
দিগন্ত হারায়ে যায় দিগন্তের প্রাণে।।

চঞ্চল ধবল বুকে নাচিতেছে ফেনার আঙুল;
ধানের শিষের মত দু'পায়ের শিরা
নাচিছে স্পানিশ টাঙ্গো নীল ঢেউয়ে;
হৃদয় করিছে পান মালাবার হাওয়ার মদিরা;
ট্রম ট্রম্ ট্রাম্ ট্রাম্— ড্রামের মতন
শৈলে শৈলে সমুদ্রের রুক্ষ আন্দোলনে;
রৌদ্রে রৌদ্রে ঝলসায় ঝিনুকের ফুল।।

বিজ্ঞান কি মস্তিষ্কের বাক্সের মতন একাকী?
তোমার শরীরে জল— দ্রাক্ষার আঘ্রাণ;
তোমার হৃদয়ে পেকে ঝরিতেছে রৌদ্রের ক্ষেত।
জাগিতেছে নব নব শস্যের সন্তান;
আমরা বন্দরে ফিরি— জনতায়— ঘূর্ণিস্রোতে কুকুরের মুণ্ডে
লোল আঁখি
পাবে নাকি লেজ তার? হো-হো— পাবে নাকি!
পাবে নাকি লেজ খুঁজে কুকুরের মত লোল আঁখি।।
ছেড়ে দিয়ে উত্তরের বাতাসের প্রাণে
জন্মেছে তোমার ডানা— জেগেছে হৃদয়;

সহস্র শতাব্দী-গিট কাটায়েছি পথ আর ঘরের আঘ্রাণে—
আনন্দের পাইনিক' তবু পরিচয়;
জন্মেনি ধবল ডানা বিজ্ঞানের অগ্রসর চিরি;
ভেঙ্গে গেছে আকাশের— নক্ষত্রে সিঁড়ি;
উৎসব খুঁজেছি রাতবিরেতের গানে।।
পৃথিবীর দিকে দিকে ছড়ায়েছি মনোবীজ, আহা,
আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্গ সন্তান;
অথবা ঘাসের দেহে শুয়ে শুয়ে কুয়াশায়
শুনেছি ঝরিতে আছে ধান;

অথবা সন্ধ্যার নীল জানালায়
অদৃশ্য কোকিল এসে গায়
এইসব বেদনার কর্কট-রেডিয়ামে মারেনাক' তাহা।

মাঝে মাঝে একবাব ধরা দেই নক্ষত্রের হাতে
চ'লে আসি সমুদ্রের পাশে,
যে ক্ষেত ফুরাতে আছে— ফুরাইয়ে গেছে
তাব তৃষ্ণা মিটিছে আকাশে;
চেযে দিখি সেই নীল আকাশেব ছবি :
সমুদ্রের অজান্তব জানালার গন্ধের সুরভি;
রৌদ্রের ডানায় ভেসে সেইখানে পৃথিবী হারাতে
চাই আমি; সমুদ্রচিলের খেলা তুলে নিয়ে হাতে।।

।। ২।।

রঙিন বিস্তৃত বৌদ্রে প্রাণ তার করিছে বিলাস;
কোনোদিন ধানক্ষেতে পৃথিবীর কৃষকের প্রাণ
এই বৌদ্রে পায় নাই;— জলপাই পল্লবের ফল,
জ্যৈষ্ঠের দুপুবে মাছি যে উল্লাসে গেয়ে গেছে গান,
কুমারী কোমল ঘাড় নুয়ে চুপে যেই পক্ক রৌদ্রে বেশি কবেছে বিন্যাস
নীল হয়ে বিছায়েছে পৃথিবীর মধুকূপী ঘাস,
তরমুজ ক্ষেতে শুয়ে স্বপন দেখেছে চৈত্রমাস,
তার চেয়ে আরো ঘন গাঢ় মদে প্রাণ তার করিছে বিলাস।।

পৃথিবীতে সেই রূপ কোনোদিন দেখি নাই কেউ :
সিংহলের হীরা রত্ন নারী লুটে নাবিকের দল
ভারত সমুদ্রে নেমে নক্ষত্রের রজনীতে
তারপর ভোরবেলা দেখছিল স্ফটিকের মত যেই জল;
তরঙ্গের পরে ঘন তরঙ্গের মধু আর দুধ,
মেঘের গোলাপী মুখ— রৌদ্রের বুদ্বুদ;
তবু তারা দেখে নাই পুরুভুজ-বিছানায় নূপুর বাজায়ে নাচে ঢেউ
বারুণীর জানালায়: সিন্ধুচিল— মক্ষিকারা ছাড়া তাহা জানে নাক' কেউ।
ধ্বনিত ঢেউয়ের অগ্নি বয়ঃসন্ধি-দিবসের স্তন হয়ে রক্তে নেমে আসে!
তরঙ্গের উষ্ণ নীল তরমুজ ক্ষেতে
আমারে খুঁজিয়া পায় মৃত্যু যেন;

বিস্মৃতির পথে যেতে-যেতে
সমস্ত পৃথিবী যেন মিশে যায় রৌদ্রের সাগরে;
সিন্ধুচিল আর তার বনিতা যেখানে খেলা করে :
মরণ আমারে যেন পায় সেই দারুচিন হাওয়ার আকাশে।।

এই কবিতা আলোচ্য *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় আছে। সংকলক লিখেছেন— ১৩৪৪ সালের কার্তিক সংখ্যা *পরিচয়* পত্রিকা থেকে কবিতাটি সংগৃহীত।

কিন্তু সংকলক কবিতাটি *পরিচয়* থেকে নিয়ে *কৃত্তিবাস*-এ দিতে গিয়ে কয়েক জায়গায় ভুল করেছেন। যেমন :

১. *কৃত্তিবাস*-এ এই কবিতার ১০ম পংক্তি হয়েছে :

বৃষ্টির প্রথম রোদ যেইখানে

'সৃষ্টির' বদলে হয়েছে 'বৃষ্টির'।

২. *কৃত্তিবাস*-এ এই কবিতার ৪২ সংখ্যক পংক্তি হয়েছে :

এই সব বেদনায় কর্কশ-রেডিয়ামে সারেনাক তাহা

'কর্কট-রেডিয়ামে'র বদলে হয়েছে 'কর্কশ রেডিয়ামে', মারেনাক' হয়েছে সারেনাক'

৩. কবিতার ॥ ২ ॥ অংশে অর্থাৎ শেষ দ্বিতীয়াংশে ৮ম পংক্তি *কৃত্তিবাস*-এ আছে—

তার চেয়ে আরো দান গাঢ় মদে প্রাণ তার করিছে বিলাস।।
মূল কবিতার 'ঘন গাঢ় মদে' হয়েছে 'দান গাঢ় মদে'

৪. এই কবিতার শেষ পংক্তি *কৃত্তিবাস*-এ ছাপা হয়েছে এইভাবে :

মরণ আমারে যেন পায় সেই দারুচিনি হাওয়ার আশ্বাসে।

পরিচয়-এ এই কবিতার শেষ পংক্তি হ'ল :

মরণ আমারে যেন পায় সেই দারুচিনি হাওয়ার আকাশে।

জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দ দাশ জীবনানন্দের কিছু অগ্রন্থিত কবিতা নিয়ে যে *আলোপৃথিবী* সংকলন গ্রন্থটি করেছেন, তার প্রথমেই তিনি এই 'সমুদ্রচিল' কবিতাটি দিয়েছেন। তিনি যে *কৃত্তিবাস* থেকে এই কবিতা এবং আরও কিছু কবিতা নিয়ে তাঁর গ্রন্থে দিয়েছেন, এ কথা তিনি তাঁর ঐ বইয়ের দিতে গিয়ে তিনিও উপরোক্ত ভুলগুলি করেছেন। তবে তিনি এই কবিতার '॥ ২ ॥' অংশের *কৃত্তিবাস*-এর 'তার চেয়ে আরো দান গাঢ় মদে'কে করেছেন— 'তার চেয়ে আরো দামী গাঢ় মদে'— এটাও ভুল।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ* গ্রন্থে *কৃত্তিবাস*-এর এই কবিতাই দিয়েছেন, এবং তিনিও অশোকানন্দবাবুর মতো শুধু 'আরো দান গাঢ় মদে'কে করেছেন 'আরো দামী গাঢ় মদে'।

আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর *কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* বইয়ে *কৃত্তিবাস*-এ প্রকাশিত এই কবিতা একেবারে হুবহু ছেপে ঐ সব ভুলই করেছেন।

কৃত্তিবাস-এ এই কবিতার শেষে *পরিচয়* ১৩৪৪ কার্তিক, লেখা থাকলেও অশোকানন্দবাবু প্রভৃতি কেউই ঐ সংখ্যা *পরিচয়* দেখেননি। ফলে এঁরা সকলেই ঐ ভুল করেছেন।

প্যারাডিম

সময়ের সুতো নিয়ে কেটে গেছে ঢের দিন
এক আধবার শুধু নিশিত ক্ষমতা
এসেছিল—- তারপর নিভে— মিশে গেছে,
হৃদয় কাটাল কাল।
বালুঘড়ি বলে গেল: সময় রয়েছে ঢের
সেই সুব দুব এক আশ্চর্য যক্ষের
চোখের ভিতরে গিয়ে স্বর্ণ দীনারের
অমোঘ বৃত্তের মত রূপ— নিয়ে নড়ে।

বালুঘড়ি ব'লে যায়: সময় রয়েছে ঢের
সময় রয়েছে ঢের ইহাদের— উহাদের;
সমুদ্রের বালি আর আকাশে তারার ভিতরে
চ'লেছে গাধার পিঠ— সিংহ, মেষ, বিদূষক,
মূর্খ আর রূপসীর বিবাহে কটক
ক্রীতদাস কাফ্রিরা তেল ব'য়ে আনে।
সময় রয়েছে ঢের— সময় রয়েছে ঢের
সরবরাহের সব অগণন গণিকরা জানে।

চারিদিকে মৃগয়ার কলরব— সময়ের বীজ।
অনেক শিকারী আজ নেমেছে আলোকে।
আমিও সূর্যের তেজ দেখে গেছি বহুক্ষণ
ভারুই পাখির মত চোখে;
ঘুরুনো আলোয় ঘুরে সংস্কারে;— উড়িবার হেতু
যদিও নেইক' কিছু ক্ষিতিজ রেখার পথে আর।
বহু আগে রণ ক'রে গিয়েছিল বুদ্ধ আর মার;
অগ্নির অক্ষরে তবু গঠিত হতেছে আজো সেতু।

ব্রহ্মার ডিমের মাঝে একসাথে জন্মেছিল যারা ভালোবসে
সেই স্বর্গ নরককে আবার স্খালন ক'রে— প্রামাণিক দেশে
তারাই তো রেখে দেবে,— মাঝখানে যদিও র'য়েছে আজ বিরক্ত সাগর,
বিশ্ববাসীরা চোখ বুজে ব'যে নেয় মুণ্ড আর কংকালের কেতু।

সম্রাটের সৈনিকেরা পথে পথে চ'রে
খুঁজে ফেরে কোনো এক শুভলাঞ্ছন;
সফেন কাজের ঢেউয়ে মৃত্যু আছে— জানে;
তারো আগে র'য়ে গেছে জীবন-মৃত্যুর অমিলন;
যেন কোনো নরকের কর্ণিশের থেকে ধীরে উঠে
কোনো এক নিম্নতর আঁধারের বিজৃম্ভিত কাক
আবার সাজাতে পারে দু'মুহূর্ত ময়ূরের মতন পোষাক,—
সৈকতে বালির কণা নক্ষত্রের রোলে যদি একসাথে জুটে
আবছায়া, অগ্নিভয়, অন্ধকার— সময়ের হাতে ঠেলে ফেলে
অনাবিল অন্তঃসার নিতে দেয় খুঁটে।

সৈনিকের সম্রাটেরা স্থিরতর— তবু;
চারিদিকে মাতালের সাবলীল কাজ শেষ হ'লে
প্রতিধ্বনিও আর থাকে নাক' যখন আকাশে
জলের উপরে হেঁটে মায়াবীর মত যায় চ'লে।
(গভীর সৌকর্য দেখে মানবীয় আত্মা জাগে জন্তুদের ভিড়ে;)
অবিস্মরণীয় সব ইতিহাস পর্যায়ের দিকে
চেয়ে দেখে সর্বদাই পৃথিবীর প্রবীণ জ্ঞানীকে
ডেকে আনে তারা নিত্য নতুন তিমিরে;
'নিপুণ ছেলের হাতে লাটিমের মত ঘোরে' দ্বৈপায়ন বলে
ঘুরায়ে নিবিড় সেই প্যারাডিমটিরে:

'যখন চিনির দাম বেড়ে গেছে ভয়ঙ্কর
তারা খায় স্বেচ্ছায় নুনের পরিজ।
সমস্ত ভণ্ডুল হয়ে গেলে সব পৃথিবীর,
মসৃণ টেবিলে ব'সে খেলে যায় ব্রিজ।
জীবনকে স্বাভাবিক নিঃশ্বাসের মত মেনে নিয়ে
মঞ্চে বক্তৃতা দেয় কর গুণে— কুকুর ক্ষেপিয়ে।'
ব'লে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মত হেসে।

'সমস্ত সভার মাঝে তারপর

দম আর থাকে নাক' কোনো কুকুরের;
একটি মাছিও আর বসে নাক' বক্তার নাকে
একটি মশাও তাকে পায় নাক' টের;
এবং পায়ের নিচে পৃথিবীরো মাটি আর নেই
তবু সবি পাওয়া যাবে চালানির মাল ছাড়লেই।'
ব'লে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মত হেসে।

'আমরা সকলে জানি বাণরাজা নক্ষত্রের থেকে
সে জাহাজ এসে গেছে মৃগশিরা তারকার দিকে;
হয়তো সরমা তাকে তুলে ধ'রে সারমেয়দের
নিকটে পাঠায়ে দেবে নির্জন তারিখে।
সম্প্রতি রুটিন তবে শেষ ক'রে— ঘুমাবার পরে
আবার সে দেখা দেবে আমাদের স্বাভাবিক সুবিধার তরে।'
ব'লে গেল অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপিব্যবসায়ী নেমে এসে;
যেখানে সম্ভ্রম করা সমুচিত সেখানে ভাঁড়ের মত হেসে।

এই কবিতাটি একটি ৮ স্তবকের কবিতা। এর ৩য় স্তবক ১২ লাইনের, ৪র্থ ও ৫ম স্তবক ১০ লাইনের, বাকি স্তবকগুলি ৮ লাইনের করে।

এখানে এই যে 'প্যারাডিম' কবিতাটি উদ্ধৃত করলাম, এই কবিতা পূর্বোক্ত *কৃত্তিবাস* পত্রিকার ২৭-২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল।

কৃত্তিবাস-এ 'জীবনানন্দ দাশের অগ্রন্থিত কবিতার' সংকলক ১৩৪৭ সালের আশ্বিন সংখ্যা *পরিচয়* পত্রিকায় প্রকাশিত এই কবিতা নিয়ে *কৃত্তিবাস*-এ দিয়েছেন। কিন্তু তিনি *পরিচয়* থেকে এই কবিতা নিতে গিয়ে কয়েক জায়গায় নকলে ভুল করেছেন। যেমন—

১. কবিতার প্রথম স্তবকের ৬ষ্ঠ লাইনের 'সেই সুর দূর এক আশ্চর্য যক্ষের'কে করেছেন— 'সেই সুর দূর এক আশ্চর্য কক্ষের।'
২. পরিচয়ের কবিতার ২য় স্তবকের ৫ম লাইন 'মুর্খ আর রূপসীর বিবাহে কটক' হয়েছে 'মূর্খ আর রূপসীর বিবাহে ঘটক।'
এখানে অবশ্য মূল কবিতায় 'বিবাহে কটক' *ঠিক* কিনা একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। জীবনানন্দ কি 'কটক' লিখেছিলেন? না *পরিচয়*-এ ছাপার ভুল 'ঘটক' 'কটক' হয়ে গেছে? অভিধানে 'কটক' শব্দের এই অর্থগুলিও পাওয়া যায়— ১. করভূষণ, বলয় ২. চক্র ৩. গজদন্ত মণ্ডল ৪. সৈন্য।
'চলেছে গাধার '*পিঠ*' অর্থাৎ গাধার পশ্চাতে চলেছে— সিংহ, মেষ, বিদূষক, কটক— হলেও হতে পারে।

৩. এই কটক বা ঘটকের পরের লাইন *পরিচয়*-এ আছে 'ক্রীতদাস কাফ্রিরা তেল বয়ে আনে।' এই লাইনের কাফ্রিরা *কৃত্তিবাস*-এ হয়েছে 'কাফ্রী।'
৪. তৃতীয় স্তবকের নবম লাইন পরিচয় আছে— 'ব্রহ্মার ডিমের মাঝে একসাথে জন্মেছিল যারা ভালোবেসে'। এই লাইনের 'ডিমের মাঝে' *কৃত্তিবাস*-এ হয়েছে 'ডিমের সাথে'।
৫. *পরিচয়*-এ ৩য় ও ৪র্থ স্তবকের মধ্যে যে ফাঁক আছে, *কৃত্তিবাস*-এ তা নেই। সেখানে এই দুটিই যেন একটা দীর্ঘ স্তবক হয়েছে।
৬. ৫ম স্তবকের ৩য় লাইন *পরিচয়*-এ আছে এই— প্রতিধ্বনিও আর থাকে নাক' যখন আকাশে— এই লাইনের 'প্রতিধ্বনিও' *কৃত্তিবাস*-এ হয়েছে 'প্রতিধ্বনিত'।

অশোকনন্দবাবু, দেবীপ্রসাদবাবু এবং সৈয়দ সাহেবও তাঁদের নিজ নিজ বইয়ে *কৃত্তিবাস*-এ প্রকাশিত এই কবিতা অবিকল দেওয়ায়, তাঁদের বইয়েও এই ভুলগুলো এসে গেছে।

সূর্যকরোজ্জ্বলা

আমরা কিছু চেয়েছিলাম প্রিয়;
নক্ষত্র মেঘ আশা আলোর ঘরে
ঐ পৃথিবীর সূর্যসাগরে
দেখেছিলাম ফেনশীর্ষ আলোড়নের পথে
মানুষ তাহার ছায়ান্ধকার নিজের জগতে
জন্ম নিল— এগিয়ে গেল;—
কত আগুন কত তুষার যুগ
শেষ করে সে আলোর লক্ষ্যে চলার কোন শেষ
হবে না আর জেনে নিয়ে নির্মল নির্দেশ
পেয়ে যাবে গভীর জ্ঞানের— ভেবেছিলাম,
পেয়ে যাবে প্রেমের স্পষ্ট গতি
সত্য সূর্যালোকের মতন;— বলে গেল মৃত
অন্ধকারের জীবিতদের প্রতি।

জীবিত, মানে আজ সময়ের পথে
বালি শিশির ধূলোর মত কণা
মিলিয়ে তাদের প্রাণের প্রেরণা
ক্রমেই চরিতার্থ হতে চায়।

চার দিকে নীল অপার্থিবতায়
সোনার মতন চিলের ডানায় কোনো
খাদ মেশানো নেই, তবু তার প্রাণে
কোটি বছর পরে কোনো মানে
বার করেছে মন কি প্রকৃতির?
মানুষ তবু পাখির চেয়ে ঢের
অমৃতলোক হাতের কাছে পেয়ে
তবু কি অমৃতের?

মানুষ আমি,— মানুষ আমার পাশে,
হৃদয়ে তার হৃদয় মেশালেও
ব্যক্তি আমি, ব্যক্তিপুরুষ সে-ও;
দ্বীপের মতন একা আমি তুমি;
অনন্ত সব পৃথক দ্বীপের একক মরুভূমি :
যে বার পরিপূর্ণ অবিশ্বাসে
র'য়ে গেছে;— সেখানে থেকে ব্যাজস্তুতি
কপট প্রণয় ভয়
দেখ কেমন উৎসারিত হয়;
প্রাণের প্রয়াস রয়েছে তবু, তাই
দেখেছি মানুষ অনর্গল অন্ধকার ম'বে
মানবকে তার প্রতিনিধি রেখে গেছে—
হয়তো এক দিন
সফলতা গেয়ে যাবে ইতিহাসের ভোরে।
চারদিকেতে সব মানুষের ব্যথা মধুরতা
নির্মলতার সাগরসূর্যে ঝরে।
বন্ধু আমার ভোরে এলে দেয়ালে ছায়া পড়ে
তবুও কি আজ ম্যামথ-পৃথিবীর?
সে কোন যুগের সরীসৃপের অব্যক্ত শরীর
কামনা ভুল কুজ্ঝটিকায় যে সব অসংগতি
এনেছিল— তাদের তুমি সহিষ্ণুতায় শুদ্ধ ক'রে নিয়ে
ইতিহাসের অন্ধকারে প্রথম শিশু মানুষ জাগিয়ে
চলছ আজো একটি সূর্য হঠাৎ হারিয়ে ফেলার ভয়ে;
হয়তো মানুষ নিজেই স্বাধীন, অথবা তার
দায়ভাগিনী তুমি;

ওরা আসে, লীন হয়ে যায়; হে মহাপৃথিবী,
সূর্যকরোজ্জ্বল মানুষের প্রেম চেতনার ভূমি।

আলোচ্য *কৃত্তিবাস* পত্রিকার ৫২ পৃষ্ঠায় এই 'সূর্যকরোজ্জ্বলা' কবিতাটি আছে। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৫৬ সালের ফাল্গুন সংখ্যা মাসিক *বসুমতী* পত্রিকায়। সেখান থেকে নিয়ে *কৃত্তিবাস*-এ দিতে গিয়ে সংকলক দু-এক জায়গায় একটু আধটু ভুল করেছেন।

১. এই কবিতাব ১৩শ পংক্তি *বসুমতী*-তে আছে—
অন্ধকারের জীবিতদের প্রতি
কৃত্তিবাস-এ *হয়েছে*— অন্ধকারে জীবিতদের প্রতি
২. মূল কবিতায় ২৭ সংখ্যক পংক্তি — *হৃদয়ে* তার হৃদয মেশালেও— *কৃত্তিবাস*-এ এই পংক্তির মেশালেও হযেছে— মেলালেও
৩. ৪৩শ পংক্তি *বসুমতী*-তে আছে—
কামনা ভুল কুজ্ঝটিকায় যে সব অসংগতি
কৃত্তিবাস-এ এই পংক্তিব যে সব হয়েছে 'সে সব'
৪. ৪৬ সংখ্যক পংক্তি *বসুমতী*-তে আছে—
চলছ আজো একটি সূর্য হঠাৎ হারিয়ে ফেলার ভয়ে
এই পংক্তির 'চলছ' *কৃত্তিবাস*-এ হযেছে— চলছে

কৃত্তিবাস থেকে এই কবিতা নিয়ে অশোকানন্দবাবু তাঁর *আলোপৃথিবী* বইয়ে ৫৯ পৃষ্ঠায়, দেবীপ্রসাদবাবু তাঁর *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ* গ্রন্থের ৫৮৩ পৃষ্ঠায় এবং সৈয়দ সাহেব তাঁর *কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* বইয়ে ৪২৩ পৃষ্ঠায় ছেপেছেন। এঁরা সকলেই *কৃত্তিবাস*-এ প্রকাশিত এই কবিতা নিয়ে নিজ নিজ বইয়ে দিয়ে ঐ সব ভুল কবেছেন, তবে সৈয়দ সাহেব 'হৃদয় মেশালেও' ঠিকই লিখেছেন। দেবীপ্রসাদবাবু ৪৬ সংখ্যক পংক্তির ভুল 'চলছে'-র বদলে 'চল্‌ছ' দিয়ে ঠিক করেছেন। তিনি এই অংশে কবিতার বাক্যে 'তুমি' কর্তা দেখে ক্রিয়া 'চল্‌ছ' ঠিকই করেছেন।

এখন রাতের শেষে

এখন রাতের শেষে আবার প্রান্তর আছে শ্যাম হয়ে প্রান্তরে ছড়ায়ে;
উর্ণনাভের জালে আবার নেমেছে ব্রহ্মা হৃদয়ের কাজ বুঝে নিয়ে;
সেইখানে শান্ত সব শিশিরের সূপে
ভোরবেলা থেকে-থেকে জ্ব'লে ওঠে আধ ফুট সূর্যের রূপে;
ঘাসের উপরে সব ভূতেরা গিয়েছে খেলে— জ্যোৎস্নার রাতে

মহেঞ্জোদড়োর থেকে এসে—
তাদের গায়ের ঘ্রাণ এখনো বাতাসে লেগে আছে মনে হয়;
একটি ধবল ঘোড়া সন্দেহ আতুর হয়ে পলনিপলের অবলেশে
তাকায়ে রয়েছে দূর চক্রবাল নীলিমার কুয়াশার দিকে :
সেইখানে কারা তবু আছে :
অনেক ধূসর ঘোড়া খেলে যেত যদি কোনো মেহগনি-অরণ্যে সেখানে,
সোনালি সবুজ শাদা কাকাতুয়াগুলি জটিল শিকড়শীল গাছে
অসংখ্য ভাষায় হেসে খুন হয় কমলারঙীন রৌদ্র ঘিরে,
তাহলে এ-পৃথিবীর রাজনীতিবিদ যোদ্ধা নেতারা এখন
ডুবে যাক সমুদ্রের পুরুভুজ— পাললিক মলের ভিতরে,
যদিও তাদের দেশে জন্মেছিল অপরূপ নারীমুণ্ড— শঙ্খের মতন শুভ্র স্তন।

উত্তরসূরী
কার্তিক-পৌষ, ১৩৬৭

এই কবিতা আলোচ্য *কৃত্তিবাস* পত্রিকায়, *আলোপৃথিবী* বইয়ে এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে নেই। আছে দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে। এই বইয়ে মূল কবিতার ৫ম পংক্তির 'ভূতেরা গিয়েছে খেলে' হয়েছে— ভূতেরা গিয়েছে থেমে। ৮ম পংক্তির 'পলনিপলের অবলেশে' হয়েছে— 'পল বিপলের অবলেশে'

১৩শ পংক্তির 'কমলারঙীন' হয়েছে 'কমলরঙীন', আর ১৫শ পংক্তির 'পাললিক মলের ভিতরে' হয়েছে— 'পাললিক মনের ভিতরে'।

এখানে একটা কথা— এই কবিতায় জীবনানন্দ লিখেছিলেন— পলনিপলের, সেটাকে দেবীপ্রসাদবাবু করেছেন 'পলবিপলের'। আমার ধারণা— দেবীপ্রসাদবাবুর 'পলবিপলের' লেখাটা ভুল নয়, বরং ঠিক। কারণ বাংলা ভাষায় নিপল বলে কোনো শব্দ নেই।

তবে জীবনানন্দ যেমন অনেক সময় নিজে শব্দ তৈরি করতেন, সেইভাবে— বাত নিবাত, রত নিরত, হত নিহত-র মত পল নিপল করেননি তো?

জীবন ভালবেসে

দেখা হ'ল অনেক রক্ত রৌদ্র কোলাহল;
চারিদিকে অধোমুখে মানুষেরা শব বহন করে;
আজকে শতাব্দীতে মৃত্যু প্রথম কথা, তবু
এ-সব মৃত অবশেষে ঘুমের ভিতরে
জুড়োয় গিয়ে দূর পৃথিবীর ঘাস শিশিরে জলে;

এরা নদী সূর্য প্রেমের দিন ফুরিয়ে ফেলে
মাটি, তোমার নিজের মনের কথা হয়ে ধীরে
তোমার সাথে ঘুরছে কেমন অজ্ঞান শরীরে।

এখানে খড়ে ভরে আছে দু-চার মাইল কামিনী ধানের ক্ষেত;
ঘুঘুর ডাকে আদিম শান্তি আরো অনেক ক্ষণ;
মিছরি-গুঁড়ির মতন বৃষ্টি রোদ্দুরে উজ্জ্বল :
আকাশে চাতক : ওর এক রাশি আত্মীয় স্বজন;—
এ সব ছাড়া ঐ মৃতদের ফুরিয়ে গেছে সবি;
সময়ের এই কার্যকলাপ গভীর মনে হয়,
জীবন ভালোবেসে হৃদয় বুঝেছে অনুপম
মূল্য দিয়ে আসছে চুপে মৃত্যুর সময়।

'শারদীয়', *আনন্দবাজার পত্রিকা*— ১৩৬৩

কৃত্তিবাস-এ, *আলোপৃথিবী*-তে এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এ কবিতা নেই। আছে দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে। সেখানে এই কবিতায় ৮ম পংক্তির 'তোমার সাথে' হয়েছে 'তোমার কাছে' ৯ম পংক্তির 'এখানে খড়ে ভরে আছে' হয়েছে— 'এখন খড়ে ভরে আছে' আর ১৩শ পংক্তির 'এসব ছাড়া' হয়েছে— 'এসব সাড়া"।

নিবিড়তর

হৃদয়ে যে স্রোত আছে অন্ধকারে লীন
হয়ে আছে ভেবে মন উড়ে যায় যেন নভোহাঁস;
শাদা-বালিরঙা ডানা অনন্ত রোদ্দুরে
মেলে দিয়ে হতে চায় আকাশে আকাশ।

হয়ে যাক একরাশি অগ্নি আর নীল,
কোনো দিকে নেই কোনো বাধা:
হয়ে যাক দুপুরের সূর্যপুরুষের
মতো অগ্নি— অন্তহীন অগ্নিজন্মদাতা।

শীত সমীচীনতায় ঘর বেঁধে, তবু
সময়ের অন্ধকার গ্রন্থি খুলে ফেলে
নব নব ক্রান্তি বলয়ে কি উজ্জ্বল প্রাণ?
অথবা কি মৃত্যু তার সূর্যে শূন্যে শেলে?

রাত্রির আঁধার ভেঙে তবুও প্রাণের এই বিদ্যুৎ গতির
শব্দই নিবিড়তর শব্দ ইতিহাসে :
মৃত্যু আছে, তবু সেই মৃত্যু ভেদ করে উড়ে যাওয়া,
সূর্য নেই, তবু সেই অয়নের সূর্যের বিশ্বাসে।

'শারদীয়' *দেশ পত্রিকা*, ১৩৫৯

এই কবিতা *কৃত্তিবাস* এ এবং *আলোপৃথিবী* বইয়ে নেই। আছে দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে। এঁরা এঁদের বইয়ে মূল কবিতার ৪র্থ পংক্তি—

মেলে দিয়ে হতে যায় আকাশে আকাশ— কে করেছেন—
জ্বেলে দিয়ে হ'তে যায় আকাশে আকাশ

আর ৮ম পংক্তির 'মতো অগ্নি— অন্তহীন অগ্নিজন্মদাতা'— কে করেছেন 'মনে অগ্নি— অন্তহীন অগ্নিজন্মদাতা'।

কখনো নক্ষত্রহীন

কখনো নক্ষত্রহীন কুয়াশার রাতে
বাইরের ঝড়ের ঝাপসা আলোড়নের
অন্ধকার থেকে পাখি বাতির আলোয় উজ্জ্বল
ঘরের ভিতর ঢুকে দু মুহূর্ত ব্যথা চিন্তা ভালোবাসা-ভরা
মেঝেয় লক্ষ্মীর আলপনা মেয়েদের
দেয়ালে ফ্রেস্কোর মূল্য বুঝে নিতে চেয়ে
ধুক ধুকে বুকের অনন্ত শূন্যে তার
টের পায়— টের পায় যদি
একটি বিদ্যুৎ শুধু মানুষের মতো চেতনার
দেখা দিয়ে মিলেবার আগে
ব্যক্ত ক'রে যায় যুদ্ধ পতঞ্জলি জানে নি যে মানে;—
আমিও অনেকদিন পরে আজ তেমনই সজ্ঞানে;
তোমার-আমার— এই পৃথিবীর কারণের দিকে চেয়ে আছি,
ফল নয়— কোনো নিরসন নয়— দু'জনের খুব কাছাকাছি
আসা নয়,— শুধু সময়ের শাদা-কালোর সাগরে
জল যেন ক্রমে শূন্য অন্ধ হয়ে ঝরে:
তোমাকে আমাকে স্থির নিঃশব্দ করে।

এই কবিতাটি ১৩৬১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা *পূর্বাশা* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতা আলোচ্য *কৃত্তিবাস* পত্রিকায়, *আলোপৃথিবী* বইয়ে এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে নেই। আছে দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে।

পূর্বাশা পত্রিকায় এই কবিতার শিরোনামে এবং প্রথম পংক্তিতে 'কখনো' থাকলেও, দেবীপ্রসাদবাবু লিখেছেন— কখনও। এটা কিছুই নয়, কিন্তু মূল কবিতার সঙ্গে দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে উদ্ধৃত কবিতায় কয়েকটা অমিল বা ভুল চোখে পড়ে। সেগুলি হ'ল :

১ম মূল কবিতায় ২য় পংক্তির 'বাইরের ঝড়ের' দেবীপ্রসাদবাবুর বইযে হয়েছে— 'বাইরের ঝাড়ের'। ৪র্থ পংক্তির 'ঘরের ভিতর' হয়েছে 'ঘরের ভিতরে', ১২শ পংক্তির 'সজ্ঞানে' হয়েছে 'সকালে', আর কবিতাব শেষ পংক্তির 'নিঃশব্দ করে'— হয়েছে 'নিঃশব্দ ক'রে'।

কার্তিক-অঘ্রাণ ১৯৪৬

পাহাড়, আকাশ, জল, অনন্ত প্রান্তর :
সৃজনের কী ভীষণ উৎস থেকে জেগে
কেমন নীরব হয়ে রয়েছে আবেগে;
যেন বজ্রবাতাসের ঝড়
ছবিব ভিতবে স্থির— ছবির ভিতর আরো স্থির।
কোথাও উজ্জ্বল সূর্য আসে:
জ্যোতিষ্কেরা জ্ব'লে ওঠে সপ্রতিভ রাতে
আদি ধাতু অনাদির ধাতুর আঘাতে
নারীশিখা হ'ত যদি পুরুষের পাশে :
আকাশ প্রান্তর নীল পাহাড়ের মত
নক্ষত্র সূর্যের মত বিশ্ব-অন্তর্লীন;
উজ্জ্বল শান্তির মত আমাদের রাত্রি আর দিন
হবে নাকি ব্রহ্মাণ্ডের লীন কারুকার্যে পরিণত।

দেশ, 'শারদীয়', ১৩৫৪

এই কবিতা *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় ৪৮ পৃষ্ঠায়, *আলোপৃথিবী* গ্রন্থে ৫১ পৃষ্ঠায়, *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ* গ্রন্থে ৫৭২ পৃষ্ঠায় এবং কবিতা *সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* গ্রন্থে ৩৮২ পৃষ্ঠায় আছে। এই কবিতার ৫ম পংক্তি— 'ছবির ভিতরে স্থির— ছবির ভিতর আরো স্থির' উপরোক্ত বইপত্র সব ক'টিতেই হয়েছে— 'ছবির ভিতরে স্থির— ছবির ভিতরে আরো স্থির।'

আর ৯ম পংক্তির প্রথম শব্দ 'নারীশিখা' *কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* বই অর্থাৎ সৈয়দ সাহেবের বই বাদে উপরোক্ত সব ক'টিতেই হয়েছে 'নারীশিক্ষা'।

পটভূমি বিসার

কবের সে বেবিলন থেকে আজ শতাব্দীর পরমায়ু শেষ
কি এক নিমেষ শুধু মানুষের অন্তহীন সহিষ্ণুতায়?
নক্ষত্রের একরাত্রি— একটি ধানের গুচ্ছ— একবেলা সূর্যের মত?
কেবলি মূষলপর্ব শেষ করে নব শান্তি বাচনের পথে
মানবের অভিজ্ঞতা বেড়ে মানুষেরই দোষে হতাহত

কলঙ্কিনী সংখ্যা বাড়ে। অতীতের স্মরণীয় ইতিহাস থেকে
যা কিছু জানার আছে না জানার আছে যত শ্লোক
সবাকে দেখাতে গিয়ে বারবার অন্ধকার বেশি করে দেখে।
তবু এই স্বভাবের প্রতিশোধে আগামীর সমাজ অশোক

হয়তো বা হতে পারে। হে তুমি গভীর ইতিহাস
আমরা মধ্যম পথে; তোমাকে সকল করে দিতে
ব্যক্তি বিসর্জন দিয়ে মানবের প্রাণনের সাগরে চলেছি;
মহানির্বাণের দিকে কিশাগোতমীর অজানিতে

আমরা চলেছি নাকি? তা' নয়তো। আজকের চেয়ে বেশি ভালো
প্রাণসূর্য উদয় হয়েছে কবে? এ রকম অশোক গভীর
শিশিরে উজ্জ্বল দেখে ভুল ব'লে প্রকৃতিকে আজো মনে হ'লে
মনের বিজ্ঞানে তবে শুভ্র হোক মানবীয় নিখিল ও নীড়।

মেঘনা, সংকলন, ১৩৫৪

১. এই 'পটভূমি বিসার' কবিতার দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম পংক্তির 'কলঙ্কিনী সংখ্যা বাড়ে' *কৃত্তিবাস*-এ, *আলোপৃথিবী*-তে, *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ*-য় এবং *কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* বইয়ে সবত্রই হয়েছে— 'কলঙ্কিনী সংখ্যা গড়ে'।
২. আর এই স্তবকের তৃতীয় পংক্তির 'সবাকে দেখাতে' *কৃত্তিবাস*-এ এবং উপরোক্ত সব ক'টি গ্রন্থেই হয়েছে— 'সবাকে দেখতে'।
৩. ৩য় স্তবকের ২য় পংক্তি *কৃত্তিবাস*-এ, *আলোপৃথিবী*-তে এবং দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে আছে— আমরা মধ্যম পথে; তোমাকে সফল করে দিতে

সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এই পংক্তি হ'ল :

আমরা মধ্যম পথে; তোমাকে সকল করে দিতে

১৩৫৪র *মেঘনা* সংকলন থেকে সংগ্রহ করা এই কবিতার একটি নকল আমার কাছে কাছে। সৈয়দ সাহেবের লেখার সঙ্গে আমরা সংগৃহীত কবিতার এই পংক্তি একই। অর্থাৎ এখানে 'সফল' নয় 'সকল'।

৪. এই স্তবকের ৪র্থ পংক্তির 'কিশাগোতমীর' শব্দটা *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ* গ্রন্থে হয়েছে— 'কিসা গোতমীর'।

জীবন সঙ্গীত

স্ট্রেচারের 'পরে শুয়ে কুয়াসা ঘিরিছে বুঝি তোমার দুচোখ :
ভয় নেই, মৃত্যু নয় কোনো এক অপদার্থ অন্যায় আলোক ;
তা'হলে কি এত লোক ম'রে যেত মশালের লালসায়— মাছির মতন?
অমৃতের সিঁড়ি ব'লে মানুষেরা গড়িত কি এত শাদা শ্লোক।

আজ মৃত্যু; এর আগে ম্যাটেডরদের মৃত্যু ছিল নাকি স্পেনে?
লড়েছে বীরের মত, রাঙা রৌদ্রে আপনারে সব চেয়ে হাম্বড়া জেনে
খেয়েছে আঁধার রাত্রি অকস্মাৎ। তবু এক হরিয়াল : বাংলার পাখি
শিকারীব-গুলি-সার-নীলাকাশ ভেবে নয় মরণকে মেনে।

তবু মোরা দিবালোকে উত্থাপন করি রোজ শৌণ্ডিকের মত ;
গেলাস ভরিয়া দেই;— মনে হয় কম্পাশ, সিন্ধু, রৌদ্র,— জীবন ফলত
ধীমান মৃত্যুর চেয়ে। মরে গেছে ভূস্তরের অন্ধকারে চূর্ণ তারা।
কিন্তু আমাদের আয়ু সানস্পট গিলে ফেলে সূর্যের মতন ব্যক্তিগত।

এই কবিতা *আলোপৃথিবী* গ্রন্থে নেই। *কৃত্তিবাস*-এ এবং *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ* ও *কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ গ্রন্থে* আছে। ঐ তিন জায়গাতেই কবিতার প্রথম পংক্তির 'কুয়াসা ঘিরিছে' হয়েছে— 'কুয়াশা ঘিরিছে'।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে জীবনানন্দের 'হেমন্ত কুয়াসায়' নামে একটি কবিতা আছে। *কৃত্তিবাস* প্রভৃতি সর্বত্রই ঐ কবিতার নাম 'হেমন্ত কুয়াসায়'ই লেখা হয়েছে— 'হেমন্ত কুয়াশায়' নয়।

এই কবিতায় ২য় স্তবকের শেষ পংক্তি *কৃত্তিবাস*-এ হয়েছে— 'শিকারীর-গুলি-সার নীলাকাশ ভেবে [ে] নয় মরণকে মেনে'। এই পংক্তির 'ভেবে নয়' *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ* গ্রন্থে হয়েছে— 'ভেবে নেয়'। সৈয়দ সাহেবের বইয়ে হয়েছে— *কৃত্তিবাস*-এর অনুরূপ— 'ভেবে [ে] নয়'।

কবিতার তৃতীয় স্তবকের তৃতীয় পংক্তি *কৃত্তিবাস*-এ হয়েছে :

ধীমান মৃত্যুর চেয়ে। মরে মেছে ভূস্তরের অন্ধকার চূর্ণ তাবা।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ্ বইয়ে এই পংক্তি হয়েছে :

ধীমান মৃত্যুব চেয়ে। মবে গেছে: ভূস্তরের অন্ধকার চূর্ণ তারা

সৈয়দ সাহেবের বইয়ে হয়েছে :

ধীমান মৃত্যুর চেয়ে। মরে গেছে; ভূস্তবের অন্ধকারে চূর্ণ তারা

কবিতার শেষ পংক্তির 'সানস্পট' কেবল *কৃত্তিবাস*-এই ছাপার ভুলে হয়েছে 'মানস্পট'।

কৃত্তিবাস থেকে শুরু করে আলোচ্য উপরোক্ত দুটি গ্রন্থেও বলা হয়েছে— এই জীবন সংগীত কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়— ১৩৪৫ সালের পৌষ সংখ্যা *চতুরঙ্গ* পত্রিকায়। সেখান থেকে কবিতাটি সংগ্রহ। কিন্তু তা নয়। ঐ সংখ্যা *চতুরঙ্গ*-এ জীবনানন্দেব কোনো কবিতাই প্রকাশিত হয় নি। এই জীবন সংগীত কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল— ১৩৪৫ সালের চৈত্র সংখ্যা বা ১ম বর্ষের ৩য় সংখ্যা *চতুরঙ্গ* পত্রিকায়।

নিরীহ, ক্লান্ত ও মর্মান্বেষীদের গান

আমরা বিশেষ কিছুই চাই না এবার।
আমাদের অন্ধকার আলো
এনেছে অনেক কিছু অবিশেষ, অকিঞ্চিৎকর।
এমন অনেক দিন কেটেছে এমনভাবে,— তবে
আবার অনেক দিন তবুও কাটাতে চাই এ রকমই।
হেমন্তে আশ্চর্য শাঁস ফ'লে গেছে কালো জলে, পানিফলে, জাউয়ের ভিতবে,
অথবা ফলেনি কিছু;
ভাসুর পীড়িত হয়ে অতএব ভাদ্রবৌকে দেখে বকে,
চোখ মেলে, চোখ বুজে দেখেছি অনেকবার সে রকম রুগ্ন দুর্ভিক্ষকে;
সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে অবশেষে ঘরে
চ'লে গেছি;— হেমন্তের নীরবতা এ রকমভাবে
আবার আসুক তবু;—
আকাশের নক্ষত্রেরা যেমন নিরীহভাবে ঘুরে যায়
বিচ্ছেদ, মরণ, ভয় কলের চাকার মত তেমনি ঘুরাবে
আমাদের সকলকে— আমাদের সকলকে নিয়ে;

তেমনি নীরবে;
সাদাসিদে ভাবে।
আমরা জলুষ, জোব, কুকুর বা সিংহের সুরে
বাধা পাই;
পেঁচা যে খড়ের চালে নেমে আসে পৌষের রাত্রির দুপুরে
সেই সুরে শান্তি আছে— শেষ আছে— মৃত্যু আছে জানি,
তবু সেই সুর ভালো।
উনিশতিবিশ থেকে উনিশচল্লিশ সাল তবু ভালো ছিল;
আজ একচল্লিশে পৌষ মাসে কেমন অসাধ যেন।
মশা মেরে, ধান ভেনে, ইঁদুর তাড়িয়ে
মহাজনদের কাছে ঋণ নিয়ে— ঋণ খেয়ে— ঋণ ভুলে গিয়ে,
হাতুড়েব কাছে গিয়ে শিশিবের মত শাদা শিশি—
যা সবের কাছে যা নেবার আছে— নিয়ে যাব,
যা সবের কাছে যা দেবার আছে দিয়ে যাব;
ক্রমাগত পায়ে হেঁটে আমাদের সন্তান ও সন্তানের সন্তানকে পৃথিবী হাঁটাব।
সন্ধ্যায় ঠাণ্ডা খুব বেড়ে গেলে হুক্তেল ঘুঘুদের ঘরে
অথবা ভিটেয় যেই গুণোপেত একটি বা দুটো ঘুঘু চরে—
সেইখানে অসংসর্গ অনুভব ক'রে যাব;— হেমন্তের নীরবতা এ রকমভাবে
আবার আসুক তবু।
আকাশের নক্ষত্রেরা যেমন নিরীহভাবে ঘুরে যায়—
বিচ্ছেদ মরণ ভয় কলের চাকার মত তেমন ঘুরাবে
আমাদের সকলকে— আমাদের সকলকে নিয়ে।

(২)

এখানে বিশেষ কিছু হয়নি অনেকদিন।
ক্রমাগত মানুষের মরণ হয়েছে।
গরীব, বেচারা, বুড়ো, বিকলাঙ্গ, মহৎ পার্ষদ সব
কি ক'রে কেবলি খ'সে ধূলোসাৎ হয়ে যায়
দেখেছি উদাস, ক্লান্ত— অন্তরঙ্গভাবে;
দেখে দেখে ঘরে ফিরে অন্ধকারে বিকল হতাম—
যদি না রাত্রির শেষে ভোর, সূর্য, সময়ের পরিস্রুত হাত
মুছে ফেলে দিয়ে যেত সব।
এই সব ছাড়া
এখানে বিশেষ কিছু হয়নি অনেকদিন।

সমুদ্রের বুদ্বুদের মত অগণন সমুচ্ছ্বাস
তেমনি প্রবল কিছু চেয়ে গেছে,— পেয়ে গেছে?— রাতে
ফিরেছে বিবিক্তভাবে সুত মিত রমণীর সমাজ জুড়াতে;
ফেরে নি কি?
আমরাও ঘুরে গেছি : আমাদের হৃদয়ের রুচি
আমাদের জীবনের উতরোল অপপ্রতিভাকে
ঘাই হরিণীর মত যে রকম সৃষ্টির জ্যোৎস্নায়
যেমন সহিষ্ণুভাবে ডেকে গেছে,
যেমন নিবিড়ভাবে ডাকে,—
সেই সুরে সাড়া দিয়ে।
কখনো নদীর জলে অদলবদল ক'রে ভেসে গেছে মেঘ, রাজহাঁস
পুনরপি মেঘগুলো— জলগুলো— আশ্বিনের মাস;
ডুবে গিয়েছিল সব,— নেই ব'লে মনে হয়েছিল :
সুরের ছোঁয়াচে সুর যে রকম হয়ে যেতে চায়
অর্থহীনভাবে অনুপ্রাস।
কখনো ধানের ক্ষেতে ধান নেই।
কখনো ধানের ক্ষেতে কৃষাণের হাসি কোলাহল;
গোলায় গোলায় গঞ্জে ইঁদুরের বৌকাঁটকীর মত কলরব;
বন্দর বেতার তার টের পায় সব।
কখনো পাটের ক্ষেত লক্‌লক্ করে ওঠে বাসুকির মত;
আল কেউটেরা সব কৃষককে কাটে ইতস্তত;
কখনো পাটের জমি চিত্রগুপ্ত বুঝে নিয়ে গেছে;
একটি মুলেও কোনো ভুল নেই, আহা।
তবুও চড়কপূজা, ভাদুপূজা— কত না গাজন গান এল গেল;
কত চাঁদ বড় হয়ে চালার পিছনে রাতে তারপর ছোট হয়ে এল;
গৃহস্থ, কৃষাণ মিলে ধোঁয়াটে জলের শ্যাম পানফল—
পোষলার পিঠে আর মিঠে তাড়ি খেল।
এ সব উৎসব তবু মৃত ইতিহাস;
এ সব উৎসব কিছু নয়।
সর্বদা উৎকণ্ঠা এক জেগে আছে সকল ঘনায়মান পার্বণের মাঝে,
মৃত্যুর উদ্বেগ ছেপে— আরো বেশি কূট;
যে যার নিজের স্থানে উঠে চ'লে ব'সে
কেবলি জীবন, যৌন, নিরাশা, বিরংসা, অর্থ দশ কথা ভেবে
তবুও একটি কথা ভাবে তারপর

নিজের মনের মুদ্রাদোষে।
প্রৌঢ়েরা এখন আরো বুড়ো,
যুবকেরা প্রৌঢ় হয়ে গেছে,
বালকেরা এখন যুবক;
নারীর দেশের থেকে ঢের নারী হারায়ে যেতেছে;
সকলি ভৃত্যের দেশ।
এই সব স্বাভাবিক— সাধারণ কথা;
এখন মানুষ তবু স্বাভাবিকভাবে কথা ভেবে নিতে গিয়ে
কোথায় পেয়েছে সফলতা?
আজ এই চতুঃসীমানার মুখে আমাদের প্রাণে যদি আত্মপ্রত্যয় থেকে থাকে
ঘাই হরিণীর মত জীবনের হরিণকে তবে সে জ্যোৎস্নার পানে—
প্রেতজ্যোস্নার পানে ডাকে।
ডাকে নাকি?
নিতান্তই কোনো কিছু ভয়াবহ ভয় যদি আমাদের দিকে
ক্রমে ক্রমে চ'লে আসে আজ,
তবুও তা' ভয় ব'লে মনে হতে দেরী—
যতদিন দেরী হয়— ততদিন ভালো।
আমরা সকালবেলা পেয়ে গেছি সূর্যের আলো,
আমরা রাত্রিবেলা পেয়ে গেছি বাতি;
গণেশ যে সব কূট শ্লোক নিয়ে একদিন বিবেচনা ক'রে গিয়েছিল,
সহজ স্ফূর্তির মত সে সব তোমার প্রাণে জন্মেছিল, ব্যাস,
স্বভাব সুখের মত রাত্রির ফুটপাতে একদিন অগনি গ্যাস
জ্বলেছিল— মনে হয়েছিল;—
আমরা সকলে
যে যার নিবিষ্ট জন্ম, প্রসন্নতা, মরণের কাজে
অজানিতে ঘুরে গেছি; কথা
ব'লে ব'লে হয়রাণ মলিন জনতা
হয়ে গেছি;
কেউ তবু হাড়ে-হাড়ে আমাদের অল্পপ্রাণতাকে
চিনে জেনে নিতে গিয়ে ব্যথিত করে নি।
কি এক সম্পূর্ণ ঈর্ষা কেবলি নিকটে নেমে আসে তবু আজ;
কখনো ধানের ক্ষেতে— কখনো নদীর ভুয়ো জলে
নিরন্ন বছর নামে;—
বর্গাদার— মহাজন— প্রজার মহলে

হুলস্থুল প'ড়ে যায়,
এখানের ভাগচাষ— শহরের হুণ্ডী— ঠিকাদার
ভূশণ্ডির মাঠ— ঘাঁটি— বারভূএ্যাদের ভূত— ব্যবচ্ছেদাগার— শব—
হাতুড়ে ডাক্তার—
ফিসফিস ষড়যন্ত্র— রাস্তার কাণাচ,—
এই সব সূর্যের চেয়েও বেশি-বালুকার-আঁচ;
এরা সব হুলুস্থুল ক'রে যায়।
কোনো কোনো প্রৌঢ় এসে অত্যাচার করে;
অগণন যুবকের ভিড়ে কোনো কাজ নেই,— চিন্তার কুশল র'য়ে গেছে;
চারিদিকে সর্বগ্রাসী দরিদ্রতা;
জনমানবের মুখে নিজ নিজ শোকাবহ গোপনীয় কথা;
নিজেরই ঘরের জন্যে ঘরণ্ডী শক্তির নির্মর্মতা;
মুর্খ দেশ, মেয়ে দেশ, প্রভু দেশ, ভৃত্য দেশ, পাগলের দেশ রয়ে গেছে,
র'য়েছে বালির দেশ ;
দার্শনিকদের দ্বিধা— মনীষীর হৃদয়ের প্রেম
সে সব বালির পরে দাগ কেটে অন্তহীন স্বপ্নসৌধ গড়ে ;
হৃদয়বিহীন ভাবে ধূর্ত সমুদ্রের কাছে,
প্লোভারের, পায়রার বিষ্ঠার ভিতরে।
সবেরই স্বতন্ত্র বেদনা র'য়ে গেছে।
এক বেদনার মাইল-মাইল জুড়ে তিল
ধারণের স্থান আছে— আছে কিনা অপর ব্যথার?
আমাদের সকলের বেদনা কি মিলেমিশে যেতে চেয়েছিল—
অথবা যে যার প্রাণে চেয়েছে কি— পেয়েছে কি ভীষণ স্বাধীন অন্ধকার?
দেখি না— জানি না— তবু অনুভব ক'রে কোনো সূর্যালোকে অতিমৃত্যু পেলে
পুনরায় ঊষালোক হয় তো বা জীবনে পেতাম;
আমরা পেতাম নাকি?
তবুও অনেক ঊষা এসে গেছে ইতিহাসে,— ঊষা সব নয় ;
জনসাধারণ ভাবে আজ আমাদের একাকী হৃদয়
অনেক জেনেছে,— তবু অমেয় বিপ্লব শুরু শেষ হয়ে গেলে
রুটিনের সৌন্দর্য ও আত্মপ্রত্যয়
মানবজাতির কাছ থেকে চেয়ে নিখিলের মানবেরা পাবে ;
না হ'লে মানুষ জ্ঞান, অভিজ্ঞা ও সন্দেহের দিব্যতায় কোথায় দাঁড়াবে।

১. এই কবিতাটি *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় এবং *আলোপৃথিবী, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ*

ও *জীবনানন্দ দাশের কবিতা সমগ্র* তিনটি বইয়েই আছে। *কৃত্তিবাস*-এ লেখা হয়েছে: এই কবিতাটি প্রথম ১৩৪৯ সালের শারদীয় *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। *আলোপৃথিবী*-তে এ সম্বন্ধে কোনো কথা লেখা না থাকলেও, যেহেতু এ কবিতা *কৃত্তিবাস* থেকে *আলোপৃথিবী*-তে নেওয়া, সেহেতু ধরা যেতে পারে আলোপৃথিবীর মতো ঐ শারদীয় *দেশ* পত্রিকাই। সৈয়দ সাহেবও এ কবিতার উৎস ঐ শারদীয় *দেশ*-ই বলেছেন। কিন্তু দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহে* বলেছেন— এ কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৫০ সালের ১৭ই বৈশাখ তারিখের সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায়। দেবীপ্রসাদবাবুর কথাটাই ঠিক, অন্যগুলো ভুল।

২. এই কবিতার চতুর্দশ পংক্তি— 'বিচ্ছেদ, মরণ, ভয় কলের চাকার মতো তেমনি ঘুরাবে'— এর 'তেমনি ঘুরাবে' *কৃত্তিবাস*-এ এবং *আলোপৃথিবী* প্রভৃতি আলোচ্য তিনটি বইয়েই হয়েছে— 'তেমনি ঘুরবে।'
৩. কবিতার (২) অংশের ৬ষ্ঠ পংক্তি— 'দেখে দেখে ঘরে ফিরে অন্ধকারে বিকল হতাম'— এর 'ঘরে ফিরে' ঐ *কৃত্তিবাস* প্রভৃতি সবেই হয়েছে— 'ঘুরে ফিরে'।
৪. কবিতার এই (২) অংশেই দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পংক্তি হ'ল :

তেমনি প্রবল কিছু পেয়ে গেছে, পেয়ে গেছে? রাতে
ফিরেছে বিবিক্তভাবে সূত মিত রমণীর সমাজ জুড়াতে।

এখানে দ্বাদশ পংক্তির শেষ শব্দ 'রাতে' *কৃত্তিবাস*-এ এবং আলোচ্য *আলোপৃথিবী* প্রভৃতি গ্রন্থে হয়েছে— 'রাত'।
এই (২) অংশের ২৭ সংখ্যক পংক্তি হচ্ছে :

গোলায় গোলায় গঞ্জে ইঁদুরের বৌকাঁটকীর কত কলরব:

এই পংক্তির 'গঞ্জে' শব্দ উপরোক্ত তিনটি বই ও *কৃত্তিবাস*-এ হয়েছে— 'গঞ্জের'।
৫. কবিতার (২) অংশের ৬৫ সংখ্যক পংক্তি হ'ল—
'স্বভাব সুখের মত রত্রির ফুটপাথে একদিন অগনি গ্যাস'— এই পংক্তির 'অগনি' *কৃত্তিবাস*-এ হয়েছে 'অগনি', *আলোপৃথিবী*-তে হয়েছে 'অগণন', *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ* বইয়ে হয়েছে— 'অগণিত', আর সৈয়দ সাহেবের বইয়ে হয়েছে— 'অগণন'।
৬. কবিতার এই (২) অংশে ৮৬ সংখ্যক পংক্তি— 'অগণন যুবকের ভিড়ে কোনো কাজ নেই— চিন্তার কুশলে রয়ে গেছে'-এর শেষ দুটি শব্দ 'রয়ে গেছে' *কৃত্তিবাস*-এ এবং *আলোপৃথিবী* বইয়ে হয়েছে— 'হয়ে গেছে'।
৭. *দেশ*-এ প্রকাশিত জীবনানন্দের এই মূল কবিতায় দেখা যাচ্ছে, কবি কবিতার প্রথম ৩৭ পংক্তির পর (২) দিয়ে কবিতার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ বা অধ্যায়ের মতো করেছিলেন।

কৃত্তিবাস-এ, *আলোপৃথিবী*-তে, দেবীপ্রসাদবাবুর এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে (২) নেই।

৮. মূল কবিতা জীবনানন্দের লেখা মতো যেভাবে সাজিয়ে *দেশ* পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল, *কৃত্তিবাস* প্রভৃতি কোনটিতেই সেভাবে সাজিয়ে ছাপা হয়নি। হয়েছে এইভাবে—

আমরা বিশেষ কিছুই চাই না এবার।
আমাদের অন্ধকার আলো
এনেছে অনেক কিছু অবিশেষ, অকিঞ্চিৎকর।

৯. এই কবিতার শেষ পংক্তির 'জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা ও সন্দেহের দিব্যতায়' *কৃত্তিবাস*-এ এবং আলোপৃথিবী প্রভৃতি ৩টি বইয়েই হয়েছে :

জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও সন্দেহের বিদ্যুতায়।

জীবনানন্দের একটি ইংরাজি কবিতা

আগে বলেছি, জীবনানন্দ বিভিন্ন সময়ে তাঁর কয়েকটি কবিতার ইংরাজি অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর *বনলতা সেন* কবিতার ইংরাজি অনুবাদটি এখানে দি লাম—

BANALATA SEN

Long I have been a wanderer of this world
Many a night
My route lay across the sea of Ceylon somewhere winding to
The ocean of Malaya.
I was in the dim world of Vimvisar and Asok, and further off
In the mistiness of Vidarbha.
At moments when life was too much a sea of sounds–
I had Banalata Sen of Natore and her wisdom.
I remember her hair dark as nights at Vidisha,
Her face: image of Sravasti; the pilot
Undone in the blue milieu of the sea
Never twice sees the earth of grass before him.
I have also seen her, Banalata Sen of Natore.
When day is done, no fall somewhere but of dews
Dips into the dusk; the smell of the sun is gone

Off the Kestrel's wings. Light is your wit now
Fanning fireflies that pitch the wide things around
I am ready with my stock of Tales
For Banalata Sen of Natore.

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ* বইয়ের এই কবিতা আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর *প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* বইয়েও আছে। তবে সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এই কবিতার ১ম স্তবকের ৩য় পংক্তি হয়েছে :

My route lay across the sea of Ceylon somewhat winding to

৪র্থ পংক্তি হয়েছে :

The seas of Malaya

৫ম পংক্তি *Vimvisar* বানানে হয়েছে *Bimbisar*
দ্বিতীয় স্তবকের ২য় পংক্তি হয়েছে :

Her face an image of Sravasti as the pilot,

৩য় পংক্তিতে *Sea*-র শেষে— , — বসেছে।
৪র্থ পংক্তি হয়েছে :

Never twice saw the earth of grass before him,

৫ম পংক্তি হয়েছে :

I have seen her, Banalata Sen of Natore

আর ৩য় স্তবকের ৪র্থ পংক্তি হয়েছে :

Fanning fireflies that pitch the wide things around

৫ম পংক্তি সম্পূর্ণ বাদ গেছে।

এবার জীবনানন্দের পুরো কবিতা উদ্ধৃত না করে কার সংকলনে জীবনানন্দের কোন্ কবিতায় ভুল হয়েছে, সে সম্পর্কে আলোচনা করছি

১. কলকাতার *বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড* দু-খণ্ডে *জীবনানন্দ দাশের কাব্য গ্রন্থ* প্রকাশ করেছেন। ২য় খণ্ডে আছে— *ঝরা পালক, সাতটি তারার তিমির* এবং *বেলা অবেলা কালবেলা*, এই তিনটি গ্রন্থ। কিন্তু এঁদের এই সংকলনে *ঝরা পালক* গ্রন্থের বহু কবিতায় বহু ভুল ছাপা হয়েছে। এখানে কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিচ্ছি— বইয়ে প্রথম কবিতাতেই 'সাঁঝের আঁধার' হয়েছে 'সাজের আঁধার', 'কাজের বেলায়' হয়েছে 'কাছের বেলায়'। ২য় কবিতা 'নীলিমা' এর 'তপ্তশ্বাস মাখা' হয়েছে 'তপ্তশ্বাস মাথা', আর 'গৌরী দীপশিখা' হয়েছে 'গৌর দীপ লিখা।' ৩য় কবিতা 'নব নবীনের লাগি' এর 'চোখের ঠুলি' হয়েছে 'চোখের ধূলি'। ৪র্থ কবিতা 'কিশোরের প্রতি'। এর 'ধবল কাশের দলে' হয়েছে 'ধবল কালোর দলে।' এইরূপ প্রচুর ভুল আছে। শুনেছি, প্রকাশক নাকি তাঁদের এই সংকলন গ্রন্থের ২য় সংস্করণে ঐ সব ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। কিন্তু যাঁরা আগেই এঁদের এ বই কিনেছেন, তাঁরা কি আবার এঁদের ২য় সংস্করণ বই কিনবেন? তাছাড়া আগের ক্রেতাদের সকলেই জানবেনই বা কি ক'রে যে এঁদের বই-এর ২য় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে এবং তাতে ভুল সংশোধন হয়েছে।

২. জীবনানন্দের *ঝরা পালক* গ্রন্থের 'চলছি উধাও' কবিতায় এক জায়গায় আছে :

জীবন-বীণার তারে তারে আগুন-ছড়ি টানি
গুলজরিয়া এল গেল কত গানের রাণী।

বেঙ্গল পাবলিশার্স-এর বইয়ে এই অংশের গুলজরিয়া হয়েছে— গুলজারিয়া। সৈয়দ সাহেবের বইয়েও ঐ 'গুলজারিয়া'-ই হয়েছে। দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে হয়েছে গুঞ্জরিয়া। বাংলা অভিযানে গুলজার শব্দ আছে। যার একটা মানে মুখর।

৩. *ঝরা পালক* গ্রন্থের 'মরুবালু' কবিতার প্রথমেই আছে :

হাড়ের মালা গলায় গেঁথে অট্টহাসি হেসে

উল্লাসেতে টলছে তারা— জ্বলছে তারা খালি।
ঘুরছে তাবা লাল মশানে কপাল-কবর চেযে

এই উদ্ধৃতির 'কপাল-কবর চেষে' *বেঙ্গল পাবলিশার্স*-এর বইয়ে হয়েছে 'কপাল কবর চেয়ে'। সৈয়দ সাহেবের বইয়ে হয়েছে— কপাল কবর ঘেঁষে। মূল অনুযায়ী দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে হয়েছে— কপাল-কবর চেযে। 'চেষে' বলে বাংলায় কোনো শব্দ নেই, তবে 'চাষ' শব্দ থেকে আগত চষে শব্দটা আছে।

কেউ কোনো কাজ নিয়ে অনবরত ছোটোছুটি করতে থাকলে, আমরা কখনো কখনো বলে থাকি— লোকটা যেন এ নিয়ে চষে বেড়াচ্ছে। এখানেও 'ঘুরছে তারা' থাকায় মনে হয় 'চেষে' নয়, 'চষে'-ই হবে।

ঝরা পালক বইয়ে বেশ কয়েকটি ছাপার ভুল আছে। যেমন— 'নাবিক' কবিতায়— ঊর্মি নাগবালা— হয়েছে 'ঊমি নাগাবালা'।

'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' কবিতায়— আমি দেখিয়াছি তারে— হয়েছে— আমি দেখিয়াছি তরে। ইত্যাদি।

তেমনি এখানে 'চষে' 'চেষে' হয়েছে বলে মনে হয়।

এবার অন্য একটা কথা— আগে এই বইয়ে 'জীবনানন্দের কবিতায় স্বদেশী ও বিদেশী প্রভাব' অধ্যায়ে এক জায়গায় জীবনানন্দের 'অবসরের গান' কবিতায় শেক্সপিয়রের *হ্যামলেট* নাটকের কবর খননকারীদের অংশের প্রভাবের কথা বলেছি। এখানেও 'মশানে কপাল কবর' থাকায় এতেও শেক্সপিয়রের *হ্যামলেট* নাটকের ঐ অংশের প্রভাব আসে নি তো?

৪. ১৩৩৪ সালের মাঘ সংখ্যা *প্রবাসী* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'কবি' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ঐ কবিতার এক জায়গায় আছে :

আমি কবি,— পথে পথে গেয়ে যাব গান;
পদে পদে মৃত্তিকারে মঞ্জীরের মত
বাজায়ে চলিব আমি,—

কৃত্তিবাস-এ এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এখানে উদ্ধৃত কবিতাংশের 'মঞ্জীরের মত' হয়েছে 'মঞ্জরীর মত'। আর কবিতার প্রথমের :

বীণা হাতে আমি তবে সিংহাসন তলে
কালে কালে আসি কবি...
এর 'আসি কবি' কৃত্তিবাসে হয়েছে— আমি কবি।

৫. ১৩৩৩ সালের শ্রাবণ মাসের *বঙ্গবাণী* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'ভারতবর্ষ' কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতার ৫ম পংক্তি :

মধুমান সূর্য সোম ঢালিয়াছে জ্যোতি

কৃত্তিবাস-এ ছাপার ভুলে এর সূর্য সোম হয়েছে— সূর্য মোম আর ১৩শ পংক্তি

বিতরি প্রেমের চরু সর্ব চরাচরে

কৃত্তিবাস-এ হয়েছে :

বিতরি প্রেমের চরু স্বর্গ চরাচরে

এই পংক্তি সৈয়দ সাহেবের বইয়েও হয়েছে :

বিতরি প্রেমের চরু স্বর্গ চরাচরে

দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এ কবিতা নির্ভুল।

৬. জীবনানন্দের *ধূসর পাণ্ডুলিপি* গ্রন্থের 'কয়েকটি লাইন' কবিতার একটা জায়গা হ'ল :

অন্ধকারে নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আন প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা।
রুধিরে পিপাসা
যেতেছে জাগায়ে।

এখানের এই 'রুধিরে পিপাসা'র বদলে 'রুধিবে পিপাসা' হয়ে সিগনেট প্রেসের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বইয়ে বিভিন্ন সংস্করণের ছাপা হয়ে আসছে।

সিগনেট সংস্করণের এই বই দেখে *বেঙ্গল পাবলিশার্স* তাঁদের প্রকাশিত *জীবনানন্দের কাব্য* গ্রন্থাবলীতে ঐ কবিতাটি দিতে গিয়ে ঐ 'রুধিবে পিপাসা'ই দিয়েছেন।

প্রগতি পত্রিকায় এই কবিতাটি যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন সেখানে 'রুধিরে' ছিল। এই প্রসঙ্গে ১৩৩৬ সালের ভাদ্র সংখ্যা *প্রগতি*ও দেখা যেতে পারে। কেননা, একটি প্রবন্ধে এই কবিতাটির যতটুকু উদ্ধৃত হয়েছে তাতেও দেখছি 'রুধিরে'ই আছে।

৭. জীবনানন্দের *মহাপৃথিবী* গ্রন্থের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার এক জায়গায় আছে :

আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার;
কোনো দিন জাগিবে না আর।
কোনো দিন জাগিবে না আর
জাগিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম— অবিরাম ভার
সহিবে না আর—

এই উদ্ধৃতির 'জাগিবার গাঢ় বেদনার' পংক্তিটি দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে হয়েছে— 'জানিবার গাঢ় বেদনার'। সৈয়দ সাহেবের বইয়ে ঠিকই আছে।

৮. ১৩৬৪ সালের বৈশাখ-আষাঢ় সংখ্যা *কবিতা* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'চিঠি এল' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতার একটা জায়গায় আছে—

সমুদ্র যখন (শীতের শেষে) আকাশকে ভালোবাসে
শত শত স্ফীত খোঁপার প্রেমিকা নারীর জন্ম দেয় সে তার জলের ভিতরে

এই অংশটা দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে হয়েছে :

সমুদ্র যখন (শীতের শেষে) আকাশকে ভালোবাসে
শত শত স্ফীত খোঁপার প্রেমিকা নারীর জন্ম দেয়। তাব জলের ভিতরে।

এখানে মূল কবিতার 'জন্ম দেয় সে' এর 'সে' বাদ গেছে। এবং 'দেয়' এর পর ভুল করে পূর্ণ ছেদ '।' দেওয়া হয়েছে।

৯. আমার সংকলিত ও সম্পাদিত *সুদর্শনা* বইয়ে ৭ ও ৮ এর পাতায় জীবনানন্দের 'অন্ধকারে' নামে একটি কবিতা আছে। কবিতাটি ১৩৫৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা পূর্বাশা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, বইয়ে এ কথা বলেওছি। এটি ৮ লাইন করে ৫টি স্তবকের একটি কবিতা। বই এর এই কবিতাটি ছাপাখানার মেসিনে ছাপার সময় কিভাবে ৩য় স্তবকের ১ম লাইনের ১ম শব্দ 'সূর্যে' উঠে যায়। মেসিনম্যান ঐ শব্দ আর না বসিয়ে ফাঁকা জায়গায় 'কোয়ারেট' ভরে দিয়ে ফর্মা ছাপা শেষ করে। 'সূর্যে' শব্দ উঠে গিয়েছিল বা টাইপ ভেঙ্গে গিয়েছিল, ঐ ফর্মা ছাপার একেবারে শেষ দিকে, অর্থাৎ অল্প কয়েকটি কাগজেই ঐ 'সূর্যে' বাদ গিয়েছিল।

এই শব্দ বাদ পড়ার কথাটা জানা যায় অনেক পরে, তার আগেই ঐ অবস্থায় কিছু বই বিক্রিও হয়ে যায়। দেবীপ্রসাদবাবু কোথাও আমার ঐরূপ একটা বই পেয়ে তা থেকে এই 'অন্ধকারে' কবিতাটি দেওয়ায় তাঁর বইয়ে এই 'সূর্যে' শব্দটা বাদ পড়েছে।

কবিতায় সমান আরম্ভের লাইনের প্রথম শব্দটা উঠে যাওয়ায় এই লাইনের প্রথমেই যে ফাঁক পড়েছে, একটু ভাল করে দেখলেই তা বোঝা যায়।

সৈয়দ সাহেব আমার বইয়ে নির্ভুল ছাপা এই কবিতা পেয়ে তাঁর বইয়ে দেওয়ায় (অন্য কোথা থেকে নিয়ে দেওয়াও হতে পারে) তাঁর বইয়ে এই কবিতায় 'সূর্যে' রয়েছে।

১০. ১৩৪৬ সালের বিশেষ পূজা সংখ্যা কার্তিক *কবিতা* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'হেমন্ত' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতা *কৃত্তিবাস*-এ, *আলোপৃথিবী*-তে, দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়েও আছে।

মূল কবিতার প্রথম দু পংক্তি হ'ল :

আজ বাতে মনে হয়
সর্ব কর্ম ক্লান্তি অবশেষে কোন এক অর্থ শুষে গেছে।

কৃত্তিবাস-এ এবং উপরোক্ত সব ক'টি গ্রন্থেই ঐ কবিতায় ২য় পংক্তি হয়েছে :

সব কর্ম ক্লান্তি অবশেষে কোন এক অর্থ শুষে গেছে।

এই কবিতার ১৩শ পংক্তি মূল কবিতা পত্রিকায় আছে—
সুষুপ্ত হরিণ— লোষ্ট্র ; মৃত্য আজ ; ব্যাঘ্র মৃত ; মৃত্যুর ভিতরে অমায়িক
কৃত্তিবাসে এবং সৈয়দ সাহেবের বই বাদে এই পংক্তি হয়েছে :

সুষুপ্ত হরিণ— লোষ্ট্র ; মৃত আজ ; ব্যাঘ্র মৃত ; মৃত্যুব ভিতবে অমাযিক

১১. ১৩৪৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা নিরুক্ত পত্রিকায় 'গরিমা' নামে জীবনানন্দের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতাটি *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ* গ্রন্থে ৫৩৪ পৃষ্ঠায় আছে। এই কবিতায় ৯ম পংক্তি :

তবুও আজ আকাশেব মতো আবও বৃহৎ একাকী

এর 'তবুও' উপরোক্ত বইয়ে হযেছে— 'তবু'
শেষ পংক্তি— ফট্‌কা বাজার সব সেয়ানে সেয়ানে এসে মেলে।
এর ফট্‌কা হয়েছে— ফাট্‌কা। ফট্‌কা ঠিক।

১২. ১৩৪৮ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা *পরিচয়* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। (দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে ১৩৪৮ সাল হয়েছে ১৩৪৭ সাল) এই কবিতায় ৯ম পংক্তিতে জীবনানন্দ লিখেছিলেন :

তাকাতে তাকাতে সেই প্রাসাদেব মেধাবী দেয়ালে

কৃত্তিবাস জীবনানন্দ সংখ্যায় এবং দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে ও সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এই লেখার 'প্রাসাদের মেধাবী দেয়ালে' হয়েছে 'প্রাসাদের মাধবী দেয়ালে।'

কৃত্তিবাস-এ, দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে, সৈয়দ সাহেবেরও বইয়ে মূল কবিতার ৮ম পংক্তি :

হযতো বা আমাদের মর্ত পৃথিবীতে ফিরে আসে।

হয়েছে— হয়তো বা আমাদের মর্ত পৃথিবীতে নেমে আসে।

২৬ ও ২৮ পংক্তির 'দাঁড়ায়ে' *কৃত্তিবাস*-এ ও দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে হয়েছে— দাঁড়িয়ে। তবে সৈয়দ সাহেবের বইয়ে হয়েছে— দাঁড়ায়ে।

১৩. দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে 'মানুষ চারিয়ে' নামে একটি কবিতা আছে। 'কবিতা নাম ও প্রকাশ সূচী' অধ্যায়ে দেবীপ্রসাদবাবু লিখেছেন— কবিতাটি ১৩৫০ সালের শারদীয় *দিগন্ত* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

দিগন্ত পত্রিকা থেকে ঐ কবিতার একটি নকল আমার সংগ্রহে আছে। তাতে দেখছি— এই কবিতার ৩য় পংক্তি :

স্ট্র্যাণ্ডের পথে ফিরে হাতুড়ে কামিন'

দেবীপ্রসাবাবুর বইয়ে হয়েছে— স্ট্র্যাণ্ডের পরে ফিরে হাতুড়ে কামিন'

১৪. ১৩৫২ সালের ফাল্গুন সংখ্যা মাসিক *বসুমতী* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'হেমন্ত কুয়াসায়' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হযেছিল।

এই কবিতা আলোচ্য *কৃত্তিবাস*-এ পত্রিকায়, অশোকানন্দ দাশের *আলোপৃথিবী* বইয়ে এবং দেবীপ্রসাদবাবুর ও সৈয়দ সাহেবেরও বইয়ে আছে।

বসুমতী-তে প্রকাশিত মূল কবিতায় ২য় ও ৩য় পংক্তি হ'ল :

তারপর ঢের দিন পৃথিবীর সেই শাদা সাধারণ কথা
ছোট বড় জিনিষের বিসরণে ক্রমে ভুলে গেছি।

উপরোক্ত সব ক'টি বইয়ে ও পত্রিকায় এই কবিতার ৩য় পংক্তি ছাপা হয়েছে এইভাবে :

ছোট বড় জিনিষের বিস্মরণে ক্রমে ভুলে গেছি।

এখানে এঁরা 'বিসরণে'র জায়গায় 'বিস্মরণে' লিখে ভুল করেছেন। জীবনানন্দ 'বিসরণে' ঠিকই লিখেছিলেন। বিসরণ শব্দের অর্থ— বিস্তার, প্রবাহ, উৎপত্তি।

১৫. ১৩৫৩ সালের আষাঢ় সংখ্যা মাসিক *বসুমতী* পত্রিকায় 'চেতনা-লিখন' নামে জীবনানন্দের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। এই কবিতা কৃত্তিবাসে, *আলোপৃথিবী*-তে, দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এবং সৈয়দ সাহেবেরও বইয়ে আছে। এই কবিতার মাঝের একটা পংক্তি হ'ল :

আবছায়াতে ক্লান্তি-কলকাকলীময় প্রেতের পরিভাষা

কৃত্তিবাস-এ এই পংক্তিটি হয়েছে :

আবছায়াতে ক্লান্তি-কলকাকলীর প্রেতের পরিভাষা

এই কবিতা *কৃত্তিবাস*-এ থেকে নিয়ে নিজেদের বইয়ে দিতে গিয়ে অশোকানন্দবাবু, দেবীপ্রসাদবাবু এবং সৈয়দ সাহেব সকলেই ঐ ভুল করেছেন।

কৃত্তিবাস-এ এই কবিতা প্রাপ্তির উৎস মাসিক *বসুমতী* ১৩৫৩ আষাঢ় লেখা থাকলেও এঁরা *বসুমতী* না দেখায় ঐ ভুল করেছেন।

১৬. জীবনানন্দের 'পৃথিবী ও সময়' কবিতাটি *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় নেই, তবে *আলোপৃথিবী, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ* এবং *কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* বই তিনটিতে আছে। *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ* গ্রন্থে 'কবিতা নাম ও প্রকাশ সূচী' অধ্যায়ে এই কবিতার উল্লেখ থাকলেও কবিতাটি কবে কোথায় প্রকাশিত

হয়েছিল তার উল্লেখ নেই।

আমার কবিতাটির একটি নকল কাছে আছে। কবিতাটি *ক্রান্তি* পত্রিকার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যায় অর্থাৎ ১৩৫৪ সালের কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

আমার সংগ্রহের এই কবিতায় ৭ম, ৮ম ও ৯ম পংক্তি হ'ল :

জীবনের ফেনশীর্ষ সিন্ধুর কল্লোলে একদিন
মানুষকে পেয়েছিল;— না-ধর্মী মানুষ সেইদিন
ভয় পেত, গুহায় লুকাত, তবু সূর্যকরোজ্জ্বল

আলোপৃথিবী বইয়ে, দেবীপ্রসাদবাবুর এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এই কবিতার ৮ম পংক্তি হয়েছে :

মানুষকে পেয়ে : না-মর্মী মানুষ সেইদিন

১৭. ১৩৫৫ সালের শারদীয় *যুগান্তর* পত্রিকায় 'চেতনা সবিতা' নামে জীবনানন্দের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থে এই কবিতাটি আছে। সেখানে এই কবিতার ৭ম পংক্তি হয়েছে '

পথের প্রমাণ সূর্যের ত্বকে রক্তে ঘুরছে কী যে।

মূল কবিতার 'সূর্যের ধ্বকে' ঐ কাব্যসংগ্রহ গ্রন্থে হয়েছে— 'সূর্যের ত্বকে', আর 'রক্তে ঘুরেছে' হয়েছে— 'রক্তে ঘুরছে'।

এ কবিতা সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এবং *কৃত্তিবাস*-এ নেই। *আলোপৃথিবী* গ্রন্থেও নেই।

১৮. ১৩৫৮ সালের বৈশাখ-আষাঢ় *একক* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'আশা অনুমিতি' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়।

এই কবিতা আলোচ্য *কৃত্তিবাস*-এ পত্রিকায় ৫৭ পৃষ্ঠায়, *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ* গ্রন্থের ৫৯০-৯১ পৃষ্ঠায়, *আলোপৃথিবী*-তে ৬৭ পৃষ্ঠায় ও *কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* বই-এর ৪৭২ পৃষ্ঠায় আছে।

এই কবিতার শেষ পংক্তির আগের পংক্তি— 'আলোর নক্ষত্রে রাত্রির নগরীর জ্ঞানের'। *কৃত্তিবাস*-এ এবং অন্য সব ক'টি বইয়েই এই পংক্তি হয়েছে— আলোর নক্ষত্রেরা রাত্রির নগরীর জ্ঞানের

১৭ লাইনের এই কবিতা *একক*-এ দুটি স্তবকে ছিল, *কৃত্তিবাস*-এ ও *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র* বইয়ে এই কবিতার স্তবক ভাগ নেই— টানা ছাপা হয়েছে।

১৯. 'পৃথিবী জীবন সময়' কবিতাটি দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ* গ্রন্থে যথাযথই উদ্ধৃত হয়েছে। তবে তিনি তাঁর বইয়ের শেষে 'কবিতা নাম ও প্রকাশ সূচী' অধ্যায়ে এই কবিতার প্রথম প্রকাশ সম্বন্ধে যে লিখেছেন— শারদীয় *গণবার্তা* ১৩৫৯, এটা ঠিক নয়, হবে ১৩৫৮।

গণবার্তা-য় এই কবিতা ছাপানোর সময় তখন কবিতার নামকরণ নিয়ে যে ঘটনা ঘটেছিল, তা বলি—

গণবার্তার পক্ষ থেকে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একদিন জীবনানন্দের বাড়িতে গিয়ে কবিতাটি নিয়ে আসেন। কবিতা নিয়ে আসার দুদিন পরে বীরেনবাবু জীবনানন্দের কাছ থেকে এই চিঠিটি পান :

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা-২৬
১৪.৯.৫১

প্রীতিভাজনেষু,

বীরেনবাবু, আমার কবিতার নাম হবে 'সুদর্শনাকে' কিংবা 'পৃথিবী, জীবন, সময়।' প্রথম নামটাই ঠিক হবে। কবিতাটির প্রুফ (শেষ প্রুফের আগে) পাঠালে খুশি হব। চিঠি পেলেন কিনা জানাবেন দয়া করে। প্রীতি নমস্কার।

ইতি— জীবনানন্দ দাশ

এর দুদিন পরেই বীরেনবাবু আবার এই চিঠিটি পান :

১৬.৯.৫১

প্রীতিভাজনেষু,

বীরেনবাবু, ভেবে দেখলাম যে আমার কবিতাটির নাম 'পৃথিবী জীবন সময়' রাখলেই ভাল হবে। তাই করে দেবেন। যথা সময়ে প্রুফ পেলে খুশি হব। নমস্কার।

ইতি— জীবনানন্দ দাশ

কয়েকদিন পরে বীরেনবাবু আবার এই চিঠিটি পান :

২৩.৯.৫১

প্রীতিভাজনেষু,

আমার কবিতাটির নাম 'মানব পৃথিবীকে' 'কাল-কল্লোল' 'পূর্ব ভূমিকা' বা 'নিরবচ্ছিন্ন' এই চারটির ভেতর যেটা আপনাদের খুশি রাখতে পারেন। নমস্কার।

ইতি— জীবনানন্দ দাশ

এ সম্পর্কে বীরেনবাবু একদিন বর্তমান গ্রন্থকারকে বলেছিলেন— কবিতাটি আমাকে দেবার সময় জীবনানন্দ তখন এর কি নাম দিয়েছিলেন, তা আজ আর আমার মনে নেই। তাঁর শেষ চিঠি পাওয়ার আগেই কবিতাটি ছাপা হয়ে যাওয়ায় আর নাম পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি।

এই কবিতার প্রথম নাম কি ছিল, বীরেনবাবু বলতে না পারলেও আমার অনুমান এ কবিতার প্রথম নাম ছিল— উপলব্ধি। কারণ, জীবনানন্দের হস্তাক্ষরে উপলব্ধি। শিরোনামে এই কবিতার প্রথম ১২ পংক্তি সুব্রত রুদ্র *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় তাঁর সংকলিত 'জীবনানন্দ দাশের অগ্রন্থিত কবিতা'র মুখপত্র হিসাবে মুদ্রিত করেছেন।

এ থেকে অনুমান হয়, এ কবিতার প্রথম নাম ছিল— 'উপলব্ধি'। এই 'উপলব্ধি' 'পৃথিবী জীবন সময়' কবিতার হুবহু প্রথম বার পংক্তি হলেও দেবীপ্রসাদবাবু এই কবিতাটি জীবনানন্দের 'উপলব্ধি' নামের আর একটি পৃথক কবিতা ভেবে তাঁর বইযে দিয়েছেন। এবং এই কবিতা প্রাপ্তির উৎস হিসাবে তিনি যেমন তাঁর বইয়ের শেষ 'কবিতা নাম ও প্রকাশ সূচী' অধ্যায়ে কোন্ কবিতা কবে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল দিয়েছেন, তেমনি এই কবিতা সম্বন্ধেও লিখেছেন— *কৃত্তিবাস*-এ ১৩৬০ আশ্বিন।

সুব্রতবাবু *কৃত্তিবাস*-এ পত্রিকায় জীবনানন্দের যে সব কবিতা দিযেছেন, সে সব কবিতা কবে কোথায় প্রকাশিত হযেছিল, তা তিনি প্রত্যেক কবিতার শেষে উল্লেখ করে গেছেন। অবশ্য দু একটা ক্ষেত্রে ঐ উল্লেখ সঠিক হয়নি। যেমন— সুব্রতবাবু তাঁর সংকলনের অন্তর্গত 'জীবন সংগীত' কবিতাটি সম্বন্ধে লিখেছেন— *চতুরঙ্গ*। ১৩৪৫ পৌষ। এটা ঠিক নয়। কারণ, *চতুরঙ্গ* ঐ সংখ্যা দেখলে দেখা যাবে, সেখানে এ কবিতা নেই। যাই হোক, সুব্রতবাবু তাঁর সংকলিত প্রত্যেক কবিতার শেষে প্রথম প্রকাশের নির্দেশিকা দিয়ে গেলেও এই উপলব্ধি কবিতা কবে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই বলেননি। সুব্রতবাবু কবিতাটি কোথায় পেয়েছিলেন, সে কথা না বললেও, দেবীপ্রসাদবাবু তাঁর বইয়ে এই কবিতা দিয়ে লিখেছেন— তিনি *কৃত্তিবাস*-এ থেকে পেয়েছেন।

দেবীপ্রসাদবাবু *কৃত্তিবাস* থেকে সুব্রতবাবুর দেওয়া কবির হস্তাক্ষরের এই কবিতাটি উদ্ধৃত করতে গিয়ে অসাবধানতাবশত দুটো ভুল করেছেন। যেমন— কবিতার ৩য় পংক্তির 'দেখে'কে করেছেন 'থেকে', আর ৫ম পংক্তির 'না' কে করেছেন 'বা'।

২০. ১৩৬০ সালের বার্ষিক *আনন্দবাজার পত্রিকায়* 'শতাব্দীর মানবকে' নামে জীবনানন্দের একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তার প্রথম স্তবকটি এই :

চারিদিকে কঠিন পটভূমি ;
তার ভিতরে চলেছ আজও তুমি ;
দু হাত দিয়ে মরণ নদীর জল
সরিয়ে তুমি দেখছ তার ফল ;
আবার আদি মরণে গিয়ে মেশে।

দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে ৬১৮ পৃষ্ঠায় এই কবিতা আছে। তবে সেখানে ৪র্থ পংক্তির 'তুমি দেখছ' হয়েছে— তুমি দেখেছ। সৈয়দ সাহেবের বইয়ে ৪৮৩-৮৪ পৃষ্ঠায় এ কবিতা আছে। সেখানেও হয়েছে ঐ 'তুমি দেখেছ'।

২১. দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে ৬২৩ পৃষ্ঠায় এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে ৫৮৯ পৃষ্ঠায় 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি কবিতা আছে। কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল— ১৩৬১ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা *উষা* পত্রিকায়।

দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এই কবিতার শেষ পংক্তি হয়েছে :

মানুষের চেতনায় আশার প্রয়াসে

কিন্তু ঊষা পত্রিকায় এই পংক্তি হ'ল :

মানুষের চেতনায় আশায় প্রয়াসে

সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এই পংক্তি মূল ঊষা পত্রিকার মত আছে।

২২. *আলোপৃথিবী, জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ, কবিতাসমগ্র : জীবনানন্দ দাশ*— এই তিনটি বইয়েই 'লক্ষ্য' নামে একটি কবিতা আছে। এই কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল— ১৩৬১ সালের শারদীয় *জয়শ্রী* পত্রিকায়।

মূল কবিতায় অর্থাৎ *জয়শ্রী*-তে এই কবিতার শেষ পংক্তি হ'ল :

না হয়ে এ স্নিগ্ধ রাত্রি— শান্তপথ হয়ে যেত যদি

কবিতার এই পংক্তি উপরোক্ত ৩টি গ্রন্থেই হয়েছে :

না হয়ে এ স্নিগ্ধ রাত্রি— শান্তিপথ হয়ে যেত যদি

২৩. দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে ৬৫৫ পৃষ্ঠায় 'মহাযুদ্ধ শেষ হয়ে গেছে' নামে যে কবিতাটি আছে, সেই কবিতার প্রথম প্রকাশ সম্বন্ধে দেবীপ্রসাদবাবু তাঁর বই-এর 'কবিতা নাম ও প্রকাশ সূচী' অধ্যায়ে লিখেছেন— *দেশ*, শারদীয় ১৩৬২।

এই কবিতার একটি নকল আমার সংগ্রহে আছে। তাতে এই কবিতার ৮ম পংক্তি হ'ল :

এসো রাত্রি, আলোর সহোদরা তুমি

দেবীপ্রসাবাবুর বইয়ে ঐ ৮ম পংক্তি হয়েছে :

এসো রাত্রি, অজানার সহোদরা তুমি

সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এ কবিতা আছে। তিনি ঠিকই লিখেছেন, 'অজানার সহোদরা' নয়, 'আলোর সহোদরা'।

কৃত্তিবাসে এ কবিতা নেই। আলোপৃথিবী গ্রন্থেও নেই।

২৪. দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে ৬৬৩-৬৬৬ পৃষ্ঠায় এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে ৪৩২-৪৩৪ পৃষ্ঠায় জীবনানন্দের 'আশার আস্থার আধার নিজেই মানুষ' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা আছে। এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল— ১৩৬২ সালের মাঘ-চৈত্র সংখ্যা *চতুরঙ্গ* পত্রিকায়।

দেবীপ্রসাদবাবু তাঁর বইয়ে এই কবিতা প্রাপ্তির সূত্র বা উৎস হিসাবে লিখেছেন— *চতুরঙ্গ*— চৈত্র ১৩৬২।

চতুরঙ্গ পত্রিকা তখন ছিল ত্রৈমাসিক, তাই ঐ সংখ্যা ছিল মাঘ-চৈত্র ১৩৬২।

মূল কবিতায় ৩০ সংখ্যক পংক্তি হ'ল :

এখন শতাব্দী অন্ধ-অবসন্ন ব্যর্থ

উপরোক্ত দুটি বইয়েই এই পংক্তি হয়েছে :

তখন শতাব্দী অন্ধ-অবসন্ন ব্যর্থ

এই কবিতার একটা পংক্তি (শেষ থেকে ৪ পংক্তি আগে) হ'ল :

মৃত দৃঢ় এরিয়েল ও বেতারের ব্যর্থতায়

দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এই পংক্তি হয়েছে :

মৃত মূঢ় এবিয়েল ও বেতারের ব্যর্থতায়

২৫. ১৩৬২ সালের কার্তিক-পৌষ সংখ্যা *উত্তরসূরী* পত্রিকায় 'কবি' নামে জীবনানন্দের একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়। দেবীপ্রসাদবাবুর *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ* গ্রন্থের ৬৫৮-৬০ পৃষ্ঠায় এই কবিতা ছাপা হয়েছে। সেখানে এই কবিতার ৩য় পংক্তি :

আনন্দের কবিতা একাদিক্রমে লিখে চলেছে

হয়েছে— *আনন্দের কবিতা একাধিক্রমে লিখে চলেছে।*

৭ম পংক্তি— *ব্যবসার মার প্যাঁচ বোঝে না সে*

হয়েছে— *ব্যাবসার মার প্যাঁচ বোঝে না সে*

৪২ পংক্তির— *ষ্ট্রেপ্‌টোকোকাস*

হয়েছে— *ষ্ট্রেপ্‌টেকোকাস*

আর শেষ পংক্তির আগের পংক্তির, টইটুম্বুর— হয়েছে *টইটম্বুর*

সৈয়দ সাহেবের বইয়ে ৩৯০-৩৯২ পৃষ্ঠায় এই কবিতা আছে। সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এ কবিতা নির্ভুল, *উত্তরসূরী* পত্রিকার পাঠ অনুযায়ীই কবিতাটি ছাপা হয়েছে।

২৬. ১৩৬৪ সালের শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা *অনুক্ত* পত্রিকায় 'কনেভেনশন' নামে জীবনানন্দের একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটি প্রকাশ করে অনুক্ত সম্পাদক কবিতার শেষে লিখেছেন— রচনাকাল ১৯৪০, পরে কবি কর্তৃক পরিমার্জিত।

এই 'কনভেনশন' কবিতা আলোচ্য *কৃত্তিবাস*-এ পত্রিকায় বা *আলোপৃথিবী* গ্রন্থে নেই। আছে দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এবং সৈয়দ সাহেবেরও বইয়ে। এই কবিতা প্রাপ্তির উৎস হিসাবে এঁরা উভয়েই লিখেছেন— অনুক্ত ১৩৬৪ শ্রাবণ-আশ্বিন সংখ্যা।

ঐ সংখ্যা অনুক্ত পত্রিকা থেকেই সংগ্রহ করা এই কবিতার একটি নকল আমার কাছে আছে। তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখছি— দেবীপ্রসাদবাবু এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এই কবিতার পাঠের সঙ্গে মূল কবিতার পাঠের কিছু অমিল হয়েছে। যেমন—

১. মূল কবিতার ২য় পংক্তি হ'ল— জন্ম হয়েছিল বটে শূকরীর পেটে ;

এই পংক্তি উপরোক্ত দুটি বইয়েই হয়েছে :

জন্ম হয়েছিল বটে শূকরের পেটে ;

মূল কবিতার ২২ সংখ্যক পংক্তি হ'ল :

আমাদের মর্মরেব মত সিলিঙ

এই পংক্তি উপরোক্ত দুটি বইয়ে হয়েছে :

আমাদের মর্মরের মতন সিলিঙ

'অনুক্ত'য় কবিতার ২৯ সংখ্যক পংক্তি হ'ল :

সময় গিয়েছে কেটে বিবেকের গোলালো তৃপ্তিতে

উপরোক্ত বই দুটিতে এই পংক্তির 'বিবেকের গোলালো' হয়েছে— আমাদের গোলালো।

২৭. ১৩৬৭ সালের ৩১শে বৈশাখ তারিখের সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'মাঝে মাঝে' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। সেই কবিতার প্রথম দু-পংক্তি ছিল :

মাঝে মাঝে অন্য সব সত্য থেকে ছুটি
নিয়ে মন জল হয়ে মিশে যেতে চায়।

দেশ-এ প্রকাশিত এই কবিতার ২য় পংক্তির 'মন' দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে হয়েছে— 'সব'।

এই কবিতা *কৃত্তিবাস*-এ, *আলোপৃথিবী*-তে সৈয়দ সাহেবের বইয়ে নেই।

২৮. 'জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ' বইয়ে ৭১৭ পৃষ্ঠায় 'বিকেলের আলোয়' নামে একটি কবিতা ছাপা হয়েছে। এই কবিতা প্রাপ্তির উৎস হিসাবে ঐ বইয়ে 'কবিতা নাম ও প্রকাশ সূচী' অধ্যায়ে ৮৭২ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে— পূর্বপত্র, অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

পূর্বপত্র ছিল *ত্রৈমাসিক* পত্রিকা। তাই ঐ সংখ্যাটি ছিল আশ্বিন-অগ্রহায়ণ ১৩৬৭

এই কবিতার একটি নকল আমার সংগ্রহে আছে। তাতে এই কবিতার ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পংক্তি হ'ল :

কোন এক সুদূর মরুভূমিতে চলে গেছি
সেখানে গভীর জ্যোৎস্না রাত
বালির গায়ে বালুকণার শব্দ

জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ গ্রন্থে এই কবিতার উদ্ধৃতিতে ৩য় ও ৪র্থ পংক্তিতে সামান্য ভুল লক্ষ্য করা যায়। সেখানে 'কোন এক' হয়েছে 'কোন্ এক', আর 'গভীর

জ্যোৎস্না রাত' হয়েছে 'গভীর জ্যোৎস্না রাতে'। এ কবিতা *কৃত্তিবাস*-এ, *আলোপৃথিবী* গ্রন্থে এবং *কবিতা সমগ্র : জীবনানন্দ দাশ* বইয়ে নেই।

২৯. *শতাব্দীর শত কবিতা* গ্রন্থে জীবনানন্দের 'আমাদের বুদ্ধি আজ' নামে যে কবিতা প্রকাশিত হয়, সেই কবিতা দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে (১ম সংস্করণ) ৭২৩-২৪ পৃষ্ঠায় এবং সৈযদ সাহেবের বইযে (২য় সংস্করণ) ৪০৩-৪ পৃষ্ঠায আছে। এই কবিতার ৩৯ সংখ্যক পংক্তি হ'ল—

জন্মেব আগে যেই কুজ্‌ঝটিকা ছিলো ·

এই পংক্তির 'যেই কুজ্‌ঝটিকা' দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে হয়েছে— সেই কুজ্‌ঝটিকা। সৈয়দ সাহেবের বইয়ে ঠিক আছে।

৩০. ১৩৬০ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ তারিখের সাপ্তাহিক *দেশ* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'নব নব সূর্যে' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। *দেশ*-এ এই কবিতাব ৩য় স্তবকের ১ম পংক্তি এবং ২য় পংক্তির প্রথমটা ছিল এইরূপ ·

সাধনার হয়তো বা সত্য শুভ লাভ
হতে পারে

দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এই 'নব নব সূর্যে' কবিতা আছে। কিন্তু সেখানে কবিতার উপরোক্ত অংশটা হয়েছে :

সাধনার হযতো বা সত্য শুভ লাভ
হতে পাবে

'দেশ'য়ে এই কবিতার ৫ম স্তবকের ১ম পংক্তি হ'ল :

অপ্রেম বেদনা রক্ত ভয়ে ভুলে বিলোড়িত হযে

দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এই পংক্তির 'ভুলে' নেই। বাদ পড়েছে।

এই 'নব নব সূর্যে' কবিতা *কৃত্তিবাস*-এ, *আলোপৃথিবী*-তে এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে নেই।

৩১. ১৩৫৮ সালের ২৬শে মাঘ সংখ্যা *দেশ* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'জীবনবেদ' নামে একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ কবিতার ৫ম ও ৬ষ্ঠ পংক্তি হ'ল—

অনেকে চিহ্নিত গাছ মাঠ স্তম্ভ জনতা বন্দর
আছে, তবু কাছে নেই আর ;

আলোচ্য *কৃত্তিবাস*-এ এই কবিতাটি আছে। সেখানে কবিতার শেষে লেখা হয়েছে— *দেশ*। মাঘ ১৩৫৮। *দেশ* তখন সাপ্তাহিক পত্রিকা হলেও ২৬শে মাঘ বলা হয়নি। এটা তেমন কিছু নয়। কিন্তু *কৃত্তিবাস*-এ ঐ কবিতার ৬ষ্ঠ পংক্তির শেষ শব্দ 'আর' হয়েছে— তার।

দেবীপ্রসাদবাবু এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে ঐ কবিতা আছে। তাঁরা তাঁদের বইয়ে 'তার' এই ভুলটা সংশোধন করে 'আর' করেছেন। তবে তাঁরাও ২৬শে মাঘ না লিখে, শুধু 'মাঘ' লিখে গেছেন।

৩২. 'কুজ্ঝটিকায় আকাশ মলিন' নামে জীবনানন্দের একটি কবিতা ১৩৬১ সালের কার্তিক সংখ্যা (তৃতীয় বর্ষ-নবপর্যায়) *ক্রান্তি* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। *ক্রান্তি*-সম্পাদক তাঁর পত্রিকায় এই কবিতাটি প্রকাশ করে কবিতার শেষে লেখেন—

অপ্রকাশিত এই কবিতাটি পাণ্ডুলিপিতে নামহীন অবস্থায় ছিল। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী প্রথম পংক্তির প্রথম অংশের সাহায্যে একে চিহ্নিত করা হ'ল। তৃতীয় স্তবকের তৃতীয় পংক্তিতে খানিকটা শূন্য স্থান লক্ষণীয়। এই অংশটুকু পূর্ণ করার কোনো ইচ্ছা কবির ছিল কিনা তা আর জানবার উপায় নেই। সম্পাদক— *ক্রান্তি*।

সম্পাদক এই কবিতার ৩য় স্তবকের ৩য় পংক্তিতে শূন্য স্থানের কথা বলেছেন। *ক্রান্তি*-তে প্রকাশিত ঐ ৩য় পংক্তি এবং ৪র্থ পংক্তি হ'ল :

জানি না কোন্   নিকেতনের দিকে
অন্ধকারে ফেলে গেছে মানব পৃথিবীকে।

দেবীপ্রসাদবাবুর এবং সৈয়দ সাহেবেরও বইয়ে ঐ ৩য় পংক্তির শূন্য স্থান না রেখে বা না দেখিয়ে করা হয়েছে :

জানিনা কোন্ নিকেতনের দিকে

কৃত্তিবাসে এবং আলোপৃথিবী-তেও এই হয়েছে।

৩৩. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *জীবনানন্দ দাশের কাব্য সংগ্রহ* গ্রন্থে 'জীবনে অনেক দূর' নামে জীবনানন্দের একটি কবিতা আছে। কবিতাটি ১১ পংক্তির। দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে ঐ কবিতার ৯ম পংক্তি হ'ল :

কোথায় ফুরিয়ে যায় তারা সব— [....?]

এই কবিতা আলোচ্য *কৃত্তিবাস* পত্রিকায়, *আলোপৃথিবী* বইয়ে এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়েও আছে। ঐ সবগুলিতেই ঐ কবিতার ৯ম পংক্তি হ'ল :

কোথায় ফুরিয়ে যায় তারা সব— থেকে সফল

এই পংক্তির শেষ দুটা শব্দ 'থেকে সফল' যে হতে পারে না, এটা দেবীপ্রসাদবাবু ঠিকই ধরেছেন। তবে 'থেকে সফল' এর পরিবর্তে কি হ'তে পারে তা না লিখে, [....?] দিয়েছেন। অথচ 'থেকে সফল' এর বদলে তিনি 'কেমন সফল' অতি সহজেই দিতে পারতেন। কেন পারতেন, সেই কথাটা বলি—

কৃত্তিবাস-এ ঐ কবিতার সংকলক কবিতাটি দিয়ে কবিতার শেষে কবিতা প্রাপ্তির উৎস হিসাবে লিখেছেন— *ব্রাত্য*, ১৩৬০ আশ্বিন [দ্রঃ প্রাণবৃক্ষ]

'প্রাণবৃক্ষ' কবিতা কবে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল— সংকলক এ কথা না বললেও দেবীপ্রসাদবাবু তাঁর বইয়ে 'কবিতা নাম ও প্রকাশসূচী' অধ্যায়ে এই কবিতা প্রাপ্তির উৎস— ব্রাত্য আশ্বিন ১৩৬০ লিখে এ প্রসঙ্গে পাদটীকায় লিখেছেন :

'পরে প্রাণবৃক্ষ নামে অনুক্ত চৈত্র ১৩৬৩ সংখ্যায় পুনরায় মুদ্রিত। অনুক্তের পাঠে তৃতীয় স্তবকের এই ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়—

কোথায় ফুরিয়ে যায় তাবা সব— কেমন সফল।

৩৪. জীবনানন্দের প্রথম গ্রন্থ *ঝরা পালক*-এর কথায় আবার ফিরে আসি— জীবনানন্দ তাঁর *ঝরা পালক* গ্রন্থে 'ডাহুকী' কবিতায় লিখেছেন :

নিদাঘের রৌদ্র তাপে একা সে ডাহুকী
বিজন তরুর শাখে ডাকে ধীরে ধীরে
বনচ্ছয়া অন্তরালে তরল তিমিরে।

...

সে কোন্ পিপাসা কোন্ ব্যথা তার মনে!
হারায়েছে প্রিয়েরে কি?

দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এবং সৈয়দ সাহেবেরও বইয়ে এই উদ্ধৃত কবিতাংশের 'হারায়েছে প্রিয়েরে কি?'— হয়েছে— 'হারায়েছে প্রিয়ারে কি?'— এটা ভুল।

এই প্রসঙ্গে ঐ *ঝরা পালক* গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'আমি কবি— সেই কবি'— কবিতাটির কথা মনে পড়ছে। এই কবিতার শেষ স্তবকের প্রথম দুটি পংক্তি হ'ল :

বিজন তারার সাঁঝে
আমার প্রিয়ের গজল-গানের রেওয়াজ বুঝি বা বাজে!

এখানে 'আমার প্রিয়ের' না হয়ে 'আমার প্রিয়ার' হবে বলেই মনে করি।

৩৫. ১৩৬৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা *কবিতা* পত্রিকায় 'জীবনের মানে ভালো', 'জোনাকি' এবং 'মরালীরা' নামে জীবনানন্দের ৩টি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। এই কবিতা ৩টির নকল আমার সংগ্রহে আছে। তাতে দেখছি— 'জীবনের মানে ভালো' কবিতায় ১ম পংক্তি আছে :

এখানে নিবিড় ঘাসে শুয়ে আছি— পাশে নদী— নদীতে স্টীমার;

সৈয়দ সাহেবের বইয়ে 'জীবনের মানে ভালো' কবিতার ১ম পংক্তি এই-ই আছে। কিন্তু দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে ঐ পংক্তি হয়েছে :

এখানে ঘাসের কোলে শুয়ে আছি— পাশে নদী— নদীতে স্টীমার;

দেবীপ্রসাদবাবু তাঁর বইয়ে এই কবিতা প্রাপ্তির উৎস হিসাবে লিখেছেন *কবিতা*— আশ্বিন, ১৩৬৩। অথচ *কবিতা* পত্রিকায় এই কবিতার পাঠান্তরের কোনো উল্লেখ নেই।

৩৬. জীবনানন্দের *বনলতা সেন* গ্রন্থের 'ঘাস' একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা। সিগনেট সংস্করণ বনলতা সেন গ্রন্থে, ভারবী থেকে প্রকাশিত *জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠা কবিতা* গ্রন্থে এবং দেবীপ্রসাদবাবুর *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ* গ্রন্থে এই কবিতার ৭ম পংক্তি হ'ল :

এই ঘাসের শরীর ছানি— চোখে চোখ ঘসি

সৈয়দ সাহেবের জীবনানন্দ দাশের *প্রকাশিত অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র* বইয়ে এই পংক্তি হয়েছে :

এই ঘাসের শরীর ছানি— চোখে ঘষি

মনে হয়, সৈয়দ সাহেবের বই-এর লেখাটাই ঠিক।

৩৭. সিগনেট সংস্করণ *বনলতা সেন* গ্রন্থের 'দুজন' কবিতার এবং সৈয়দ সাহেবেরও বইয়ে ঐ কবিতার ৬ষ্ঠ পংক্তি হ'ল :

আজ এই মাঠ সূর্য সহধর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে

দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে ঐ পংক্তি হয়েছে :

আজ এই মাঠ সূর্য সহমর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে

১৩৫৭-র বৈশাখ সংখ্যা *কবিতা* পত্রিকায় প্রকাশিত এই কবিতায় আছে, সহধর্মী।

৩৮. দেবীপ্রসাদবাবু তাঁর বইয়ে নির্জন হাঁসের ছবি, বড়ো বড়ো গাছ এবং মনকে আমি নিজে নামে জীবনানন্দের ৩টি কবিতা দিয়েছেন। এই কবিতা ৩টির প্রাপ্তির উৎস হিসাবে তিনি তাঁর বইয়ে লিখেছেন-- ১৩৬৬ আশ্বিন, *কবিতা* পত্রিকা।

১৩৬৬ সালের আশ্বিনের কবিতায় প্রকাশিত ঐ ৩টি কবিতা সৈয়দ সাহেব তাঁর বইয়ে দিয়েছেন। কবিতায় প্রকাশিত ঐ কবিতা ৩টির নকল আমার সংগ্রহেও আছে।

সৈয়দ সাহেবের বইয়ে দেওয়া ঐ কবিতা ৩টির পাঠ এবং আমার সংগ্রহেরও ঐ কবিতা ৩টির পাঠ হুবহু এক। কিন্তু দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে ঐ ৩টি কবিতার পাঠ কম বেশি অন্যরূপ। কবিতা প্রাপ্তির সূত্র যখন ৩ জনেরই এক, তখন দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ের পাঠে অন্যরূপ হ'ল কেন?

এ সম্বন্ধে আমার মনে হয়,— জীবনানন্দ যেমন কখন কখন কবিতা লিখে মনঃপূত না হওয়া পর্যন্ত, আবার তার সংশোধন ও পরিবর্তন করতেন, এই কবিতা ৩টির ক্ষেত্রেও হয়ত ঐরূপ করেছিলেন।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পর ঐ ৩টি কবিতার একবারের লেখা বুদ্ধদেব বসু এনে তাঁর কবিতা পত্রিকায় প্রকাশ করেছিলেন, আর একবারের লেখা দেবীপ্রসাদবাবু তাঁর বইয়ে প্রকাশ করেন।

কিন্তু তা হলেও দেবীপ্রসাদবাবু ঐ কবিতা ৩টির প্রাপ্তির উৎস পরিষ্কার কবিতা

পত্রিকা থেকে পাওয়া বললেন কেন? একথা বললেও, তিনি কবিতায় প্রকাশিত ঐ ৩টি কবিতার অন্য পাঠ আছে, তা বললে ভাল করতেন। কেন না, দেবীপ্রসাদবাবু 'কবিতা' থেকে সংগৃহীত বললেও, *কবিতা* পত্রিকায় তো ও পাঠ নেই।

আমি বলছি— দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে ঐ ৩টি কবিতার পাঠ কমবেশি অন্যরূপ। কি রকম কমবেশি অন্যরূপ, এখানে তার একটু নমুনা দেখাচ্ছি। *কবিতা* পত্রিকায় 'বড়ো বড়ো গাছ' কবিতার ৬ষ্ঠ পংক্তি হ'ল :

কিংবা নক্ষত্র যে আভা আনে রাতের পর রাতে

এইটাই দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে হয়েছে :

কিংবা নক্ষত্রের যে আভা আনে রাতের পর রাতে

কিন্তু *কবিতা*-য় প্রকাশিত এই 'বড়ো বড়ো গাছ' কবিতার ৭ম পংক্তির পর থেকে শেষ অবধি পরিবর্তন হয়েছে অনেক। এখানে আগে *কবিতা* পত্রিকার পাঠ, পরে দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ের পাঠ পর পর উদ্ধৃত করছি :

কবিতা পত্রিকার পাঠ :

মানুষকে দাঁড় করাতে চাচ্ছে আজো মানুষের প্রয়াস।
অনেক দিন দেখেছি; উঁচু উঁচু গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে সব,
আরও অনেক দিন দেখেছি: উঁচু উঁচু গাছ কাকের ভীড়ে
নীল জাফরান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সব;
তবুও তারপর দেখেছি: রাত্রির সমুদ্রের পারে নিস্তব্ধ লুক্কায়িত
দ্বীপ যেন এক একটা গাছ—
হৃদয়কে বাদুড়ের মতো আকাশের দিকে ভেসে যেতে ব'লে—
মানুষকে দাঁড় করাতে চাচ্ছে।

দেবীপ্রসাদবাবুর বই-এর পাঠ :

কারা যেন অগ্রসরের কবিতা লিখছে কোথায়
কমিউনিজ্‌মের স্তম্ভ তৈরি করছে
মানুষকে দাঁড় করাতে চাচ্ছে আজও মানুষের প্রয়াস।
অনেক দিন দেখেছি: উঁচু উঁচু গাছ দাঁড়িয়ে রয়েছে সব
আরো অনেক দিন দেখেছি: উঁচু উঁচু গাছ কাকের ভীড়ে
নীল জাফরান হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সব
তবুও তারপর দেখেছি: রাত্রির সমুদ্রের পারে
নিস্তব্ধ লুক্কায়িত দ্বীপ যেন এক-একটা গাছ—
হৃদয়কে বাদুড়ের মতো আকাশের দিকে ভেসে যেতে বলে—
কিন্তু তোমার এ বিস্ময় থাকুক
গাছ নয়— মানুষকে দাঁড় করাও।

৩৯. জীবনানন্দের *বেলা অবেলা কালবেলা* বইয়ে 'অবরোধ' নামে একটি কবিতা আছে। দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বইয়ের 'কবিতা নাম ও প্রকাশসূচী' অধ্যায়ে ঐ কবিতা কবে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল প্রসঙ্গে লিখেছেন— *চতুরঙ্গ*, আশ্বিন ১৩৪৮।

বেলা অবেলা কালবেলা বইয়ের ঐ কবিতা কবে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল এ সম্বন্ধে সৈয়দ সাহেবও তাঁর বইয়ের 'পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা' অধ্যায়ে বলেছেন— *চতুরঙ্গ*, আশ্বিন ১৩৪৮।

এঁদের এই লেখা অনুযায়ী কেউ ঐ সংখ্যা *চতুরঙ্গ* খুলে দেখলে দেখতে পাবেন, *চতুরঙ্গ*-এর ঐ কবিতা আর *বেলা অবেলা কালবেলা* বইএর কবিতায় কত তফাৎ !

'অবরোধ' কবিতা ঐ সংখ্যা *চতুরঙ্গ*-য় প্রকাশিত হয়েছিল সত্য, কিন্তু জীবনানন্দ এই কবিতা *বেলা অবেলা কালবেলা* বইয়ে দেবার সময় এর প্রচুর পরিবর্তন করেছিলেন। অথচ দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এবং সৈয়দ সাহেবেরও বইয়ে এই পরিবর্তনের কোনো উল্লেখ নেই।

চতুরঙ্গ-য় এই কবিতার একটা পংক্তি ছিল :

কোথাকার মহিলা সে? কবেকার? শ্লাভ, বালটিক, বালি, চীন?

এই পংক্তিই বইয়ে হয়েছে :

কোথাকার মহিলা সে? কবেকার? ভারতী নর্ডিক গ্রীক
মুস্লিম, মার্কিন?

এখানে *চতুরঙ্গ*-য় প্রকাশিত ঐ কবিতার শুধু শেষাংশটাই দেখাচ্ছি যে বইয়ে কি রকম পরিবর্তিত হয়েছিল—

চতুরঙ্গ-য় এইরূপ ছিল :

পৃথিবীতে দুন্দুভি বেজে ওঠে— বেজে ওঠে;
গানের টিচার নেই— কোনো স্কুল নেই।
একদিন বিকেলবেলার আলো সান্ত্বনা উপুড় ক'রে সকলকে ঘুম দিতে গিয়ে
আমাকে মনস্থ ক'রে ডেকে নিয়ে গেল তবু— অন্য এক ব্যবহারে
মাইলটাক দূরে পুরোপুরি।
এই সব হয়েছিল সুদূর বিদেশে তবু— আর সে সন্থরী মৃত গাছ;
অনেক আগের কথা এই সব— দূর প্রবাসের।
সময় বৃত্তের মত গোল ভেবে চুরুটের আস্ফোটে জানুহীন, মলিন সমাজ
সেই দিকে অগ্রসর হয় রোজ— একদিন সেই দেশ পাবে।
সেই নারী মৃত তবু ভুলে গিয়ে তারা সব টম্‌টম্ বাজাবে।

এই অংশ বইয়ে হয়েছে :

পৃথিবীতে দুন্দুভি বেজে ওঠে— বেজে ওঠে; সুর তান লয়
গান আছে পৃথিবীতে জানি, তবু গানের হৃদয় নেই।
একদিন রাত্রি এসে সকলের ঘুমের ভিতরে
আমাকে একাকী জেনে ডেকে নিল— অন্য-এক ব্যবহারে
মাইলটাক দূরে পুরোপুরি।
সবি আছে— খুব কাছে; গোলক ধাঁধাঁর পথে ঘুরি
তবুও অনন্ত মাইল তারপর— কোথাও কিছুই নেই ব'লে।
অনেক আগের কথা এই সব— এই
সময় বৃত্তের মতো গোল ভেবে চুরুটের আস্ফোটে জানুহীন.
মলিন সমাজ
সেই দিকে অগ্রসর হয় রোজ— একদিন সেই দেশ পাবে।
সেই নারী নেই আর ভুলে তারা শতাব্দীর অন্ধকার ব্যসনে ফুরাবে।

৪০. সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত জীবনানন্দের বনলতা সেন গ্রন্থের 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতাটি কবে কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর বইয়ে 'কবিতা নাম ও প্রকাশসূচী' অধ্যায়ে লিখেছেন— কবিতা, চৈত্র ১৩৪৩।

এ সম্বন্ধে সৈয়দ সাহেব তাঁর বইয়ের 'পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা' অধ্যায়ে লিখেছেন— কবিতা, আশ্বিন ১৩৪৩। এখানে সৈয়দ সাহেব যে লিখেছেন— আশ্বিন ১৩৪৩, এটাই ঠিক।

ঐ ১৩৪৩ এর আশ্বিনে 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতার পাঠ, আর *বনলতা সেন* গ্রন্থের এই কবিতার পাঠ কিন্তু এক নয়। কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত এই কবিতা নিয়ে জীবনানন্দ প্রথমে তাঁর *মহাপৃথিবী* গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

পরে সিগনেট প্রেস যখন তাঁর *বনলতা সেন* গ্রন্থ প্রকাশ করেন, তখন তিনি *মহাপৃথিবী*-র ঐ কবিতা নিয়ে পরিবর্তিত আকারে এই *বনলতা সেন* গ্রন্থে দিয়েছিলেন।

আগে 'অবরোধ' কবিতার সময় যেমন দেখলাম, জীবনানন্দ পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা বইয়ে দেবার সময় পরিবর্তন করেছেন, তেমনি এই কবিতার ক্ষেত্রেও দেখছি— এক বইয়ের কবিতা অন্য বইয়ে দেবার সময় আবার পরিবর্তন করেছেন।

মহাপৃথিবী গ্রন্থের 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতাটি— যা ১৩৪৩ এর আশ্বিনের কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, তা ছিল এই :

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে পিরামিড— কাফনের ঘ্রাণ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না— খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত

বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরিয়— দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের— ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ;
'মনে আছে?' শুধালো সে— শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন।'

জীবনানন্দ এই কবিতাই তাঁর *বনলতা সেন* (সিগনেট প্রেস সংস্করণ) গ্রন্থে দেবার সময় সংশোধন বা পরিবর্তন ক'রে করেন এইরূপ :

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো ;
চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না— দেবদারু ছায়া ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : দ্বারকার— দাঁড়ায়ে রয়েছে নত, ম্লান।
শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের— ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ;
'মনে আছে?' শুধাল সে— শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন?'

'ভারবি' থেকে প্রকাশিত 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের 'মহাপৃথিবী'র কবিতা অংশে এই 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতার শেষ পংক্তির শেষাংশ, 'শুধালাম আমি শুধু, বনলতা সেন?' হয়েছে, 'শুধালাম আমি শুধু, বনলতা সেন।'

অর্থাৎ শেষের জিজ্ঞাসা চিহ্ন '?' হয়েছে দাঁড়ি '।'।

৪১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *জীবনানন্দের কাব্যসংগ্রহ* গ্রন্থে 'সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে' এবং 'এখানে সারা দিন' নামে জীবনানন্দের দুটি কবিতা পর পর প্রকাশ করেছেন। বইয়ে এই কবিতা দুটি প্রকাশ করার আগের পাতায় তিনি কবিতা দুটির কবির হস্তাক্ষরের প্রতিলিপিও মুদ্রিত করেছেন।

এই কবিতা দুটি আলোচ্য *কৃত্তিবাস*-এ পত্রিকায় এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়েও আছে।

'সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে' ১১ লাইনের একটি ছোট কবিতা। এই কবিতার ৯ম ও ১০ম পংক্তি হ'ল :

মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য জন্ম লয় শুকনো পাতার মত ঝরে নাক' তাহা।

এই ১০ম পংক্তির 'যে সৌন্দর্য' *কৃত্তিবাস*-এ এবং সৈয়দ সাহেবের বইয়ে হয়েছে— সে সৌন্দর্য। দেবীপ্রসাদবাবু পাণ্ডুলিপি অনুযায়ী ঠিকই লিখেছেন। দেবীপ্রসাদবাবু তাঁর বইয়ে এই কবিতা ঠিক লিখলেও, তিনি তাঁর বইয়ে কবির হস্তাক্ষর মুদ্রিত করে যে লিখেছেন— *ময়ূখ* জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১, জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যায় কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত কবিতা— 'এর *ময়ূখ* জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১— এটা ভুল। ১৩৬১ না হয়ে হবে ১৩৬২।

৪২. *কৃত্তিবাস*-এ পত্রিকায় 'পৃথিবী আজ' এবং 'রাত্রি, মন, মানবপৃথিবী' নামে

পর পর দুটি কবিতা ছাপা হয়েছে। দুটি কবিতারই শেষে কবিতা প্রাপ্তির উৎস হিসাবে লেখা হয়েছে— *সত্যযুগ*, শারদীয় ১৩৫৭।

অনেক জায়গা ঘুরে ঘুরে এক জায়গায় ঐ সংখ্যা *সত্যযুগ* পেয়ে খুলে দেখলাম, ঐ সংখ্যা *সত্যযুগ* পত্রিকায় জীবনানন্দের কেবল 'পৃথিবী আজ' কবিতাটিই প্রকাশিত হয়েছে।

যাই হোক, *সত্যযুগ*-এ প্রকাশিত 'পৃথিবী আজ' কবিতাটির সঙ্গে *কৃত্তিবাস*-এ প্রকাশিত কবিতাটি মিলিয়ে দেখলাম— একরূপ ঠিকই আছে। কবিতাটি ৪ লাইন ক'রে ৮ স্তবকের। এই কবিতার শেষ স্তবকের প্রথম দু পংক্তি হ'ল :

পিরামিড ও এ্যাটম আগুন অধীর প্রাণনার
উৎসারিত রাষ্ট্র সমাজ শক্তি রচনায়

এই স্তবকের ২য় পংক্তির 'শক্তি' কেবল *কৃত্তিবাস*-এ হয়েছে— শক্তির।

দেবীপ্রসাদবাবু তাঁর বইয়ে 'পৃথিবী আজ' এবং 'রাত্রি মন মানবপৃথিবী' কবিতা দুটি পরপর প্রকাশ করেছেন। তিনিও তাঁর বই-এর শেষে 'কবিতা-নাম ও প্রকাশ সূচী' অধ্যায়ে এই দুটি কবিতারই প্রাপ্তির উৎস হিসাবে লিখেছেন— *সত্যযুগ*, শারদীয় ১৩৫৭।

মনে হয়, দেবীপ্রসাদবাবু *কৃত্তিবাস*-এ থেকেই এই দুটি কবিতাই এবং কবিতা দুটির প্রাপ্তির সূত্র সবই নিয়ে নিজের বইয়ে দিয়েছেন। তাই তাঁর বইয়েও 'পৃথিবী আজ' কবিতার শেষ স্তবকের দ্বিতীয় পংক্তির 'শক্তি' এই শব্দের জায়গায় হয়েছে— শক্তির।

সৈয়দ সাহেবের বইয়েও এই কবিতা আছে এবং তিনিও 'শক্তি' না লিখে 'শক্তির' লিখেছেন। আর তাঁর বইয়ে এও বলেছেন— ঐ দুটি কবিতাই দৈনিক *সত্যযুগ* পত্রিকার ১৩৫৭ সালের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল।

এই কবিতা দুটি অশোকানন্দ দাশের *আলো পৃথিবী* বইয়েও আছে। তিনিও তাঁর বইয়ে 'পৃথিবী আজ' কবিতায় ঐ 'শক্তি' না লিখে, লিখেছেন— শক্তির।

৪৩. ১৩৬০ সালের শারদীয় *একক* পত্রিকায় জীবনানন্দের 'নব হরিতের গান' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। কবিতাটি ৪ লাইনের ক'রে ৪ স্তবকের। এর প্রথম স্তবকের ২য় ও ৩য় পংক্তি হল :

ব্যসন বাতাস রক্ত কোলাহল
শান্ত ক'রে পথে মাঠ প্রাঙ্গণ ও ঘরে

সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এই কবিতার 'ব্যসন' বানান ভুলে হয়েছে 'ব্যাসন'। আর ২য় পংক্তির ক'রে হয়েছে— করে।

এই কবিতার ৩য় স্তবকের ২য় ও ৩য় পংক্তির :

... ক্লান্তি গ'ড়ে
ইতিহাসের অনেক পর্ব ফুরিয়ে গেল ...

সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এই অংশের গ'ড়ে হয়েছে-- গড়ে
এই কবিতার ৩য় স্তবকের ১ম পংক্তি হ'ল :

দান করেছে চীন বেবিলন কুরুবর্ষ গ্রীস,

কৃত্তিবাস-এ এই পংক্তির গ্রীস হয়েছে— গ্রীসে
৩য় স্তবকের শেষ পংক্তি ও ৪র্থ স্তবকের ১ম পংক্তি হ'ল :

এখনো সে মরুভূমির ভোরে
দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধ একখানা মেঘ চায়;

কৃত্তিবাস-এ ভোরে-র পর পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়ি '।' দেওয়া হয়েছে।
এই কবিতার শেষ পংক্তি হ'ল :

ভস্ম হয়ে জাগছে হরিৎ— নব হরিৎ গাছে

কৃত্তিবাস-এ 'জাগছে' হয়েছে— জাগহে

৪৪. ১৩৮৫ সালের আশ্বিন সংখ্যা *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় সুব্রত রুদ্র জীবনানন্দের *রবীন্দ্রনাথ* নামে একটি কবিতা প্রকাশ করেন। সুব্রতবাবু কবিতাটি প্রকাশ করে এই কবিতা প্রাপ্তির উৎস হিসাবে কবিতাটির শেষে লিখেছেন— *পূর্বাশা* ১৩৪৮ রবীন্দ্র-সংখ্যা।

কৃত্তিবাসে এই কবিতাটি পড়ে কেন জানি না আমার মনে হ'ল— *কৃত্তিবাস*-এ এই কবিতার পাঠে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু ভুল আছে। এই ভেবে *কৃত্তিবাস*-এর এই কবিতাটি মিলিয়ে দেখবার জন্য ১৩৪৮ সালের ঐ রবীন্দ্র-সংখ্যা *পূর্বাশা* পত্রিকাটি খোঁজ করতে থাকি। কিন্তু কলকাতার কোনো গ্রন্থাগারে বা আমার পরিচিত কারো কাছেও ঐ সংখ্যা *পূর্বাশা* পেলাম না।

এই খোঁজ করার সময় একদিন জানতে পারি, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্র ভবনের বিশিষ্ট কর্মী, রবীন্দ্র ভাবন থেকে প্রকাশিত *রবীন্দ্রবীক্ষা* পত্রিকার সম্পাদক অনাথনাথ দাসের সংগ্রহে ঐ সংখ্যা *পূর্বাশা* পত্রিকাটি আছে।

বিশ্বভারতীর শ্রীনিকেতনে বার্ষিক উৎসব বা মাঘ উৎসবের পরে ঐ উৎসবেরই অঙ্গ হিসাবের এক সাহিত্য সভায় বক্তৃতা দিতে গিয়েছিলাম। গিয়েছিলাম বিশ্বভারতীর উপাচার্য দিলীপকুমার সিংহের আমন্ত্রণে এবং শ্রীনিকেতন কর্মীসংঘের সাধারণ সম্পাদক মিহিরকুমার ঘোষের বিশেষ আগ্রহে। সেদিন উপাচার্যের বাড়িতে অতিথি হিসাবে থেকে পরদিন সকালে অনাথবাবুর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করি।

কৃত্তিবাসে প্রকাশিত *রবীন্দ্রনাথ* কবিতার জেরক্স কপি আমার সঙ্গেই ছিল। অনাথবাবু *পূর্বাশা* রবীন্দ্র-সংখ্যা দিলে *পূর্বাশা*-র কবিতার সঙ্গে *কৃত্তিবাস*-এর কবিতা

মিলিয়ে দেখলাম, *কৃত্তিবাস*-এর কবিতার পাঠে ছোট বড় অনেক ভুল আছে। যেমন—

১. পূর্বাশায় মূল কবিতাটি দশ লাইনের ক'রে পরিষ্কার ছ'টি স্তবকের। *কৃত্তিবাস*-এ মূল কবিতার তৃতীয় ও চতুর্থ স্তবককে একটি স্তবক করা হয়েছে।

২. *পূর্বাশা*-র কবিতায় প্রথম স্তবকে নবম ও দশম পংক্তি হ'ল :

পঙ্কিল ইঙ্গিত এক ভেসে ওঠে নেপথ্যের অন্ধকারে : আধো ভূত,
আধেক মানব
আধেক শরীর— তবু— অধিক গভীরতার ভাবে এক শব।

কৃত্তিবাস-এ ৯ম পংক্তির আধো ভুত-এর পর ',' নেই। আর ১০ম পংক্তির তবুর পরে '— ' নেই।

৩. মূল কবিতার ২য় স্তবকের ৩য় পংক্তি হ'ল :

ফুরাতেছে— দাঁড়াতেছে।— তুমি তাকে স্থির প্রেমিকের মত অবয়ব দিতে

কৃত্তিবাস-এ দাঁড়াতেছের পর '।' দাঁড়ি নেই।

৪. মূল কবিতায় ৪র্থ স্তবকের ৬ষ্ঠ পংক্তি হ'ল :

নিজে প্রমাণিত হয়ে অনুভব করেছিলে শোচনার সীমা—

কৃত্তিবাস-এ সীমার পর '— ' নেই।

৫. *পূর্বাশা*-য় আলোচ্য কবিতার ৪র্থ স্তবকের শেষ পংক্তি :

ভেবে তাব শুক্ল অস্থি হ'ল অফুরন্ত সূর্যময়

কৃত্তিবাস-এ এই পংক্তি হয়েছে— ভেবে তারা শুক্ল অস্থি হ'ল অফুরন্ত সূর্য়্যময়

৬. *পূর্বাশা*-য় ৫ম স্তবকের ৬ষ্ঠ পংক্তি হ'ল :

নীরক্ত মানুষদের উদ্বোধিত করে সব অপরূপ পাখি ;

কৃত্তিবাস-এ এই পংক্তির 'মানুষদের' হয়েছে— 'মানুষের'

৭. আর এই স্তবকের শেষ পংক্তি পূর্বাশায় আছে :

ব্রহ্মাণ্ডের গোল কারুকার্যে কাজ রূপালি, সোনালি মোজায়িক।

কৃত্তিবাস-এ এই পংক্তির 'কারুকার্যে' হয়েছে— 'কারুকার্য'

৮. শেষ স্তবকের ৩য় পংক্তি *পূর্বাশা*-য় হ'ল :

যে কোনো বস্তুর থেকে পেতেছ সম্মিত সম্মান ;

এই পংক্তি *কৃত্তিবাস*-এ হয়েছে— 'যে কোনো বস্তুর থেকে পেতেছে সম্মিত সম্মান ;'

অশোকানন্দবাবুর, দেবীপ্রসাদবাবুর এবং সৈয়দ সাহেবেরও বইয়ে এই কবিতাটি আছে।

অশোকানন্দবাবু *কৃত্তিবাস* অনুসরণ করে ঐ ভুলগুলো সবই করেছেন। তার উপর আবার তাঁর বইয়ে 'টিকিটের প্রেষে', হয়েছে— 'টিকিটের প্রেমে'।

দেবীপ্রসাদবাবুও *কৃত্তিবাস*-এর *রবীন্দ্রনাথ* কবিতাকে সঠিক ভেবে নিজের বইয়ে দিতে গিয়ে ঐ ভুলগুলো করেছেন। তবে *কৃত্তিবাস*-এর 'ভেবে তারা শুক্ল অস্থি' যে ভুল, এটা ধরতে পেরে করেছেন— ভেবে তার শুক্ল অস্থি। কিন্তু ৫ম স্তবকের ২য় পংক্তির 'টিকিটের প্রেষে'কে করেছেন— 'টিকিটের প্রেসে'।

সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এই 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতা আছে। তিনি *পূর্বাশা*-য় মূল কবিতাটি দেখেছিলেন বলে মনে হয়। তাই *কৃত্তিবাস*-এর ভুলগুলো তাঁর বইয়ে একরূপ নেই-ই। তবে এখানে আলোচিত *কৃত্তিবাস*-এর ২ ও ৪ সংখ্যক '— ' ড্যাসের ভুল দুটি তাঁর বইয়ে এসেছে। এ তেমন কিছু ভুল নয়। কিন্তু তিনি মূল কবিতার ৪র্থ স্তবকের শেষ পংক্তির 'তার শুক্ল অস্থি'কে করেছেন— 'তারা শুক্ল অস্থি।'

৪৫. ১৩৫০ সালের শারদীয় *একক* পত্রিকায় প্রকাশিত জীবনানন্দের 'শতাব্দী শেষ' কবিতাটি ৪ লাইন ক'রে ৫টি স্তবকের। এর ৪র্থ স্তবকটি হ'ল :

পড়ে থাকে তারপর মলিন টেবিলে ;
মানুষ নিজেকে নিজে চিনে
চলে যায় জীবনের চেয়ে আরো বড়ো
বাজেটের কমিটি মিটিঙে—

এই কবিতা দেবীপ্রসাদবাবুর, অশোকানন্দবাবুর, সৈয়দ সাহেবেরও বইয়ে এবং আলোচ্য *কৃত্তিবাস* পত্রিকায় আছে। দেবীপ্রসাদবাবুর বইয়ে এ কবিতা ঠিক আছে। *কৃত্তিবাস*-এ ও সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এই কবিতার প্রথম প্রকাশ-কাল বলা হয়েছে— *একক*, শাবদীয় ১৩৫১। অশোকানন্দবাবুর বইয়ে, সৈয়দ সাহেবের বইয়ে এবং *কৃত্তিবাস*-এ এই কবিতার ৪র্থ স্তবকের ১ম পংক্তির 'টেবিলে' হয়েছে— 'টেবিল', আর কবিতার ২য় ও ৩য় পংক্তি নেই, বাদ গেছে।

প্রচলিত জীবনানন্দের কবিতা সংকলন গ্রন্থগুলিতে কবিতায় এই নানা ধরনের এত ভুল দেখে মনে হয়, ঐ বইগুলিতে হয়ত আরও কিছু ছোট বড় ভুল থাকলেও থাকতে পারে। না থাকলেই অবশ্য আনন্দের কথা। তবুও অন্তত কিছু কবিতা একবার মূলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারলে ভাল হ'ত। কিন্তু দুষ্প্রাপ্য পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি খুঁজে বার ক'রে, সে সবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা এ এক ভীষণ পরিশ্রমের কাজ। এ পরিশ্রম কি কেউ করবেন?